প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোন বিষয়ে সাম্মানিক স্তরে (Honours) শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধীতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন, যখনই কোন শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নবম পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : রাষ্ট্রবিজ্ঞান (সহায়ক পাঠ) ঃ দ্বিতীয় পত্র ঃ স্নাতকস্তর
Political Science (Subsidiary) : Second Paper [SPS - II] :
Bachelor Degree Programme [BDP]
[ইওরোপ ও আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি]
(Government and Politics in Europe & America)

পাঠ্যক্রম

	রচনা	সম্পাদনা
	পর্যায় : 01	
একক : 01-04 :	**অধ্যাপিকা কুমকুম চট্টোপাধ্যায়**	**অধ্যাপক রাধারমণ চক্রবর্তী** **অধ্যাপক স্বাধীন রঞ্জন দে**
	পর্যায় : 02	
একক : 05-08 :	**অধ্যাপিকা দীপিকা মজুমদার**	**অধ্যাপক অশোক মুখোপাধ্যায়** **অধ্যাপক স্বাধীন রঞ্জন দে**
	পর্যায় : 03	
একক : 09-12 :	**অধ্যাপক পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়**	**অধ্যাপক অমিয় চৌধুরী** **অধ্যাপক স্বাধীন রঞ্জন দে**
	পর্যায় : 04	
একক : 13-16 :	**অধ্যাপক শমীক মুখোপাধ্যায়**	**অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য** **অধ্যাপক স্বাধীন রঞ্জন দে**

পরিমার্জন, বিন্যাস ও সম্পাদনা
ড. দেবনারায়ণ মোদক
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ ও অধিকর্তা, স্কুল অব হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস,
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি দেওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

BLANK

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঃ সহায়ক পাঠ ঃ দ্বিতীয় পত্র **(SPS - II)**

ইওরোপ ও আমেরিকার শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি

(Government and Politics in Europe & America)

[২০১২ জুলাই এবং তৎপরবর্তী শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য**]**

পর্যায় : 01

একক 01 ❑ ব্রিটিশ সংবিধানের বিবর্তন ও প্রধান নীতিসমূহ **7–23**

একক 02 ❑ শাসনবিভাগ **24–47**

একক 03 ❑ পার্লামেন্ট **48–69**

একক 04 ❑ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী **70–78**

পর্যায় : 02

একক 05 ❑ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহের উদ্ভব (সংশোধনসহ) **81–96**

একক 06 ❑ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস **97–116**

একক 07 ❑ আমেরিকার সুপ্রিমকোর্ট **117–127**

একক 08 ❑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী **128–142**

পর্যায় : 03

একক 09 ❑ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ক্রমবিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য **145–159**

একক 10 ❑ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা এবং সংসদ **160–187**

একক 11 ❑ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিচারব্যবস্থা ও সাংবিধানিক সভা **188–196**

একক 12 ❑ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **197–204**

পর্যায় : 04

একক 13 ❑ বিবর্তন ও মূলনীতি **207–221**

একক 14 ❑ শাসনবিভাগ ও সংসদ **222–231**

একক 15 ❑ জার্মান বিচারব্যবস্থা ও সাংবিধানিক ন্যায়ালয় **232–236**

একক 16 ❑ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী **237–243**

একক ০১ ❑ ব্রিটিশ সংবিধানের বিবর্তন ও প্রধান নীতিসমূহ

গঠন

০১.১ উদ্দেশ্য

০১.২ প্রস্তাবনা

০১.৩ ব্রিটিশ সংবিধান

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

আইনের অনুশাসন

০১.৪ সারাংশ

০১.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

০১.৬ উত্তরমালা

০১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

০১.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটেনের যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে কিভাবে তা বর্তমান রূপ নিয়েছে।
- সম্পূর্ণভাবে লিখিত না হলেও সেই দেশের শাসনতন্ত্র কিভাবে কার্যকর হয়েছে।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের এক প্রতিশ্রুতি আইনের অনুশাসনের অর্থ কি এবং
- সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে এখনও ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির প্রভাব কেন সক্রিয়।

০১.২ ❑ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ সংবিধান হল বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। এই সংবিধান কোন সাংবিধানিক পরিষদ দ্বারা ঘোষিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই এককে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব এবং কেন ব্রিটিশ সংবিধান আজও স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

০১.৩ ❑ ব্রিটিশ সংবিধান

রাষ্ট্র মানুষের তৈরি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের আয়তন বড়, সদস্যসংখ্যা অনেক এবং সমস্যাও প্রচুর। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি সরকার গঠিত হয়। সরকারই রাষ্ট্রের পরিচালন সমিতি। সরকারের মূল কাজ তিন ধরনের ঃ আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ এবং আইনের ব্যাখ্যা। একটি সরকারের অস্তিত্ব, তার কার্যাবলী ও তার ক্ষমতা বন্টন যে নীতিনিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাই হল সংবিধান। বস্তু পরিচালনার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় এই সমস্ত নিয়মকানুনের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলা হয়।

কোনও দেশের সংবিধান অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস ও জনসংখ্যার প্রকৃতির ওপরে। তবে যেহেতু সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য হল নাগরিক অধিকার রক্ষা করা এবং সরকারের ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া, সেহেতু সেই পরিপ্রেক্ষিতটিই সংবিধান গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে। শাসনতন্ত্র হ'ল দেশ শাসনের জন্য সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুন। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের লিখিত মৌলিক আইনকানুন—যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সংবিধান চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা বিশেষ সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়।

কিন্তু এই অর্থে ব্রিটেনে কোনও সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। কারণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়নি।

মুনরো এবং এয়ার্স্ট (Munro And Ayerst) উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ সংবিধান কোনও একটি উৎস থেকে উদ্ভূত হয়নি। কোন গণপরিষদ অথবা সাংবিধানিক সম্মেলনের মাধ্যমে তা গৃহীত হয়নি। ব্রিটিশ সংবিধানের নিরবচ্ছিন্নতা প্রায় অদৃশ্য বিকাশের ফল। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রাণীত আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

অনুশীলনী—১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান একটি গণপরিষদের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল।

(গ) রাষ্ট্র মানুষের তৈরি একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

২। সংবিধান দুটি অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। সেগুলি কী কী? (পাঁচ বা ছয়টি বাক্যে উত্তর দেবেন)

ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হল সনদ (Charter), পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Statute), প্রথাগত আইন (Common Law), সাংবিধানিক রীতিনীতি (Conventions of the Constitution), বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত (Judicial Interpretations and Decisions), আইন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত (Important works on constitutional law and commentaries of the specialists)।

(ক) **সনদ ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ইংল্যান্ডের রাজন্যবর্গ বিভিন্ন রকম সনদকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঐতিহাসিক দলিলরূপে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ১২১৫ সালের মহাসনদ, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল প্রভৃতি। এই সনদগুলিকে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

(খ) **পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ঃ** ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং সেই সঙ্গে রাজার ক্ষমতা সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে, জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত এইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্রিটিশ সংবিধানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। এইসব বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৭৯, ১৮১৬ এবং ১৮৬২ সালে প্রণীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'হেবিয়াস কর্পাস' আইন, ১৯১১ ও ১৯৪১ সালের 'পার্লামেন্ট আইন' এবং ১৯৭২ সালে প্রণীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন।

(গ) **বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত ঃ** বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আদালত প্রথাগত আইন ও পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ব্যাখ্যা করে। আদালতের অনেক রায় সাংবিধানিক দিক দিয়ে গুরুত্ব অর্জন করেছে। আদালতের রায় ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) **প্রথাগত আইন ঃ** দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্র-কর্তৃক এবং বিশেষভাবে আদালত কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করলেই তা আইনের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। তবে এই প্রথাগত আইনসমূহ যেমন আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয় না, তেমনি অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমেও এগুলি ঘোষিত হয় না। তবু এই প্রথাগত আইন ব্রিটেনে ব্যক্তি স্বাধীনতার রক্ষক ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পুরান আমলের Common Law Court গুলিতে এই প্রথাগত আইন দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর আমলে এগুলিতে সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়।

(ঙ) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** সাংবিধানিক রীতিনীতি বলতে আরমা সেই সমস্ত নিয়মকানুনকে বুঝি সেগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হ'লেও তারা আইনের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাসনকার্যে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকেই এগুলি মান্য করতে হয়। বস্তুত গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের প্রধান ভিত্তি হ'ল সাংবিধানিক রীতিনীতি। রাজা বা রানির ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের সঙ্গে সংসদের সম্পর্ক, দলীয় পরিষদের ঊর্দ্ধে স্পিকারের অবস্থান ইত্যাদি সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকালের বিবর্তনের মাধ্যমে ওই সব রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। ওই সব রীতিনীতির অনুধাবন ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না।

(চ) **বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ঃ** প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও লেখকদের রচনাবলীও গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম উৎস। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল অ্যানসনের Law and Customs of the Constitution, মে-র Parliamentary Practice, জেনিংস-এর Law and the Constitution ইত্যাদি।

অনুশীলনী----২

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে সাংবিধানিক রীতিনীতি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস মোটামুটি ছয়টি।

(গ) ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন একটি পার্লামেন্ট প্রণীত আইন।

২। বিধিবদ্ধ আইন বলতে কী বোঝায়? (তিনটি/চারটি বাক্যে উত্তর দিন)।

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক সংবিধানেরই কয়েকটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। ওই বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সংবিধানটির মৌলিকতা, ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। ব্রিটিশ সংবিধানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাই।

(১) **অলিখিত সংবিধান ঃ** ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। সনদ, বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, প্রথাগত আইন, সাংবিধানিক রীতিনীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই সংবিধান কোনও গণপরিষদ, কোনও সাংবিধানিক সম্মেলন অথবা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয়নি। কোনও একটিমাত্র স্থায়ী এবং বিধিবদ্ধ দলিলরূপে এই সংবিধানকে চিহ্নিত করা যায় না।

(২) **ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা। এই সংবিধান একটি গতিশীল সংবিধান। অতএব নিরন্তর পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই সংবিধান কখনও পুরনো প্রশাসনিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলেনি। ইংরেজ জাতি প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল। ফলে তারা ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। যেমন তারা রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করেনি। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার ক্ষমতা হ্রাস করেছে।

(৩) **সুপরিবর্তনশীল ঃ** সুপরিবর্তনীয়তা ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। সংসদে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই ব্রিটিশ সংবিধানকে পরিববর্তিত করা যায়।

(৪) **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ঃ** নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানি অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও এবং রাজা বা রানির নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও তিনি দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদ। রাজা বা রানি রাজত্ব করেন, দেশ শাসন করেন না।

(৫) **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ঃ** ব্রিটেন হল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একটিমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। এখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থা থাকলেও তারা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ন্যস্ত ক্ষমতাই ভোগ করতে পারে।

(৬) **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অনুপস্থিতি ঃ** গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নেই। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আবার লর্ডসভা পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হ'লেও এই কক্ষের বিচারবিভাগীয় ক্ষমতাও আছে।

(৭) **পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা ঃ** পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বলতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বোঝায়। আইনগত সার্বভৌমিকতার অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোন আইন সংশোধন করতে পারে, যে কোন আইন বাতিল করতে পারে। ব্রিটেনের কোন আদালতই পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। তবে পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা অবাধ নয়।

(৮) **আইনের অনুশাসন ঃ** ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হ'ল আইনের প্রাধান্য, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। আইনের অনুশাসনের জন্যই ব্রিটেনের নাগরিকগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারেন বলে মনে করা হয়।

(৯) **সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাতৃভূমি বলা হয়। ১২৯৫ সালে রাজা প্রথম এডওয়ার্ড Model Parliament আহ্বান করেন। প্রায় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বলা যায় সংসদীয় শাসনের সূত্রপাত। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ব্রিটেনে বর্তমান যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি, পার্লামেন্টের কাছে মন্ত্রীপরিষদের দায়িত্বশীলতা, শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রকরণ নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

(১০) **ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব ঃ** ব্রিটেনে তত্ত্বগতভাবে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লেও দ্বিদলব্যবস্থা ও সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসনের ফলে কার্যত এখানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বর্তমানে ক্যাবিনেটের এই একনায়কত্ব প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্বেরই অন্য নাম।

(১১) **প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য ঃ** বিগত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত দ্রুত বেড়ে গিয়েছে যে তাঁকেই সরকারের একক পরিচালক হিসেবে গণ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি ও জটিলতা এর একটি কারণ। সেই সংগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ক্রমেই বেশি পরিমাণে মান্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

(১২) **দুর্বল বিচারব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনে বিচারবিভাগের ক্ষমতা খুব সীমিত। এখানে বিচারবিভাগ পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু ওই আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না।

(১৩) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় সংবিধানিক রীতিনীতিগুলির মূল্য অপরিসীম। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন এবং এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

(১৪) **দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব ঃ** ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। কার্যত অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকলেও দুটি মাত্র দল—রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। দুটি দলের মতাদর্শ পৃথক বলে এই ব্যবস্থাকে 'সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা' বলা হয়। শাসনের অধিকার চক্রবৎ দুই দলের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে।

(১৫) **নাগরিক অধিকার ঃ** অন্যান্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত ব্রিটেনেও নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আইনের চোখে সমানাধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ভোটদান ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার ইত্যাদি। তবে সমালোচকদের মতে এখানে শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকায় অন্যান্য অধিকারগুলি অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়েছে।

ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় ঘটেছে। অভিনব এই শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতীক হিসাবে আছেন রানি। আরা ব্রিটিশ শাসনববস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রতীক হয় প্রিভি কাউন্সিল এবং লর্ড সভা। আর ব্রিটেনের জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন কমন্স সভা হ'ল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতীক।

অনুশীলনী----৩

১। **সঠিক উত্তরে ☑ দিন ঃ**

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান (লিখিত/অলিখিত)।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান (সুপরিবর্তনীয়/দুষ্পরিবর্তনীয়)।

(গ) ব্রিটেন একটি (এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র/যুক্তরাষ্ট্র)।

(ঘ) ব্রিটেনে প্রচলিত রাজতন্ত্র (নিয়মতান্ত্রিক/চরম)।

(ঙ) ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (আছে/নেই)।

(চ) ব্রিটেনে (দ্বিদলীয়/বহুদলীয়) ব্যবস্থা প্রচলিত।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি হ'ল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই নিয়মকানুন যেগুলি আইনের অংশ না হ'লেও শাসনব্যবস্থায় অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এই রীতিনীতিগুলির পিছনে আইন বা আদালতের কোন সমর্থনমূলক আদেশ না থাকলেও শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই এই রীতিনীতিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলেন।

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। যেমন

(ক) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

(খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে ব্যক্তিকে কোন শাস্তি পেতে হয় না।

(ঘ) অথচ প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক রীতিনীতির বিরোধী কোনো সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ সহজে কার্যকর হতে পারে না।

এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে লর্ড অ্যানসন 'সংবিধানের প্রথা' নামে উল্লেখ করেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাদের 'সংবিধানের অলিখিত বিধান' নামে অভিহিত করেছেন। ডাইসি ওই নিয়মগুলিকে 'সাংবিধানিক রীতিনীতি' নামে বর্ণনা করেছেন। স্যার আইভর জেনিংস বলেন যে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের শুষ্ক দেহকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত করে তোলে। ওয়েড এবং ফিলিপিস্ বলেন সাংবিধানিক রীতিনীতি হ'ল প্রথা এবং প্রয়োজনীয়তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নিয়মাবলীর সমষ্টি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎস হল মানুষের সুস্পষ্ট মতৈক্য। অন্যভাবে বলা যায়, এই রীতিনীতিগুলি সে দেশের বিবর্তনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির (political culture) প্রতিফলন।

আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি

আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বর্তমান।

(১) আইন নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা দ্বারা প্রণীত হয়, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কোনও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত হয় না।

(২) আইন আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(৩) আইন লিখিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

(৪) আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে, আইনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক; সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। অথচ এর বিরুদ্ধাচারণ অতি বিরল ঘটনা।

(৬) আইন লিখিতভাবে পেশ করা যায়। সাংবিধানিক রীতিনীতি লিখিতভাবে পেশ করা যায় না।

(৭) ডাইসির মতে, সাংবিধানিক রীতিনীতি সকল সময় একইভাবে প্রয়োগ হয় না। স্থানকালভেদে এর তারতম্য হতে পারে। কিন্তু আইন সর্বত্র একইভাবে প্রয়োগ করা হয়।

(৮) প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। কিন্তু সুবিধা অনুযায়ী হঠাৎ সাংবিধানিক রীতিনীতি গড়ে তোলা যায় না।

(৯) নির্ধারিত মঞ্চে জনমত যাচাই, দলীয় স্তরে আলাপ আলোচনা সংসদে বিচার বিবেচনার পর আইন তৈরি করা হয়। পক্ষান্তরে সাংবিধানিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নিয়ত ব্যবহারের মাধ্যমে।

(১০) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সাংবিধানিক রীতিনীতি কোনও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে গড়ে ওঠে না।

সাংবিধানিক রীতিনীতির শ্রেণি বিভাজন

গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) **রাজশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই ধরনের রীতিনীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হবেন; পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজা বা রানি স্বাক্ষর করতে বাধ্য।

(২) **ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই শ্রেণির শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রীসভা কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকবে; প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভার সদস্যদের পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সদস্য হতে হবে; পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

(৩) **পার্লামেন্ট সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ** এই শ্রেণির সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বছরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে; কমন্সসভার অধ্যক্ষ বা স্পিকার দল নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। একমাত্র পার্লামেন্টই সরকারের আয়ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে।

(৪) **কমনওয়েলথ সম্পর্কিত রীতিনিতি ঃ** কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্কও

সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন কোনও ডোমিনিয়নের অনুরোধ ক্রমেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই ডোমিনিয়নের জন্য আইন পণয়ন করবে, অন্যথায় নয়। যেমন, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান পদে ব্রিটিশ রাজা বা রানির এখন বিকল্প ব্যবস্থা চালু হয়েছে ঐসব দেশেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

সংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করার কারণ

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি ভঙ্গ করলে শাস্তির কোন ভয় নেই। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যও নয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করা হয় কেন?

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যের কারণ হিসেবে ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল মানসিকতা ও ঐতিহ্যপ্রিয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত ও প্রথাগত হওয়ার ব্রিটেনে একটি সুপরিবর্তনীয় শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই সুপরিবর্তনীয়তার প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন আছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই রীতিনীতিগুলি শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে। রীতিনীতি লঙ্ঘিত হ'লে শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। যেমন বৎসরে অন্তত একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন না হলে সরকারের আয়ব্যায় অনুমোদনই লাভ করবে না।

অগ্ (০৯৯)-এর মতে সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করার প্রধান কারণ হ'ল জনমতের চাপ। এই রীতিনীতিগুলির প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের অভ্যস্ত আনুগত্য সরকারকে রীতিনীতি মানতে বাধ্য করে।

সাংবিধানিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে আর একটি শক্তিশালী যুক্তি হল এই যে রীতিনীতি লঙ্ঘিত হলে লঙ্ঘিত নীতিকে আইনে রূপান্তরের দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠবে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে সাংবিধানিক রীতিনীতির বাস্তব উপযোগিতার কারণেও এগুলিকে মান্য করা হয়। এই রীতিনীতিগুলি মান্য করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে গণসার্বভৌমিকতার ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব

বর্তমানে জটিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সব রাষ্ট্রই একটি লিখিত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তা ছাড়া লিখিত সংবিধান ব্যতীত দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এখন পর্যন্ত মূলত রীতিনীতি নির্ভর। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে ব্রিটেনে এই সাংবিধানিক রীতিনীতির অপরিহার্যতার পশ্চাতে এমন অনেক কারণ আছে যা তাদের ভূমিকাকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

(১) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের কাঠামোকে গতিশীল করে সম্পূর্ণতা দান করে।

(২) এই রীতিনীতিগুলি সংবিধানকে যুগোপযোগী করে তোলে।

(৩) গ্রেট ব্রিটেনের বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে সংবিধানের কার্যপদ্ধতি যেন সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও রীতিনীতির উদ্দেশ্যে।

(৪) রীতিনীতিগুলি সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) সাংবিধানিক রীতিনীতি সংবিধানের নমনীয়তা বজায় রাখে ও তার সীমাবদ্ধতা দূর করে।

(৬) সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে পুরনো আইন নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

(৭) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এই রীতিনীতিগুলি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৮) আইন ও বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যেকার ফাঁকটুকু পূরণ করে এই রীতিনীতিগুলি।

(৯) জনগণের ইচ্ছা ও সরকারি কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি।

অনুশীলনী ---- ৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলির পিছনে আদালতের সমর্থন আছে।

(খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত।

(ঘ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

২। আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

৩। সাংবিধানিক রীতিনীতি কয় প্রকার ও কী কী?

৪। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কেন মান্য করে চলা হয়?

আইনের অনুশাসন

গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খ্রিঃ) পর থেকেই আইনের অনুশাসনের ধারণা ধীরে ধীরে ইংল্যান্ডে প্রসারলাভ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদ শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং চিন্তার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। এইসময় আইনের অনুশাসনের ধারণা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের বক্তব্যের মাধমে জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বলাভ করে।

সহজ সরল ভাষায় আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায় আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য, আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, নির্দিষ্ট আইনভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগপ্রদান, প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার প্রভৃতি। আইনের অনুশাসনের মূল কথা হ'ল সকলেই আইনের অধীন। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Introduction of the Law of the Constitution ('শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা')-এ আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেন। ডাইসির বাখ্যা অনুসারে আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটি তিনটি নীতির

ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি হল ঃ

প্রথমত, আইনের অনুশাসন সব রকম স্বৈরী ক্ষমতার বিরোধী। সরকারের কোন স্বৈরী ক্ষমতা থাকতে পারে না। এর অর্থ হ'ল আদালতের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না অথবা তাকে জীবন ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর মাধ্যমে আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। ব্রিটেনে আইনের সর্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বলা যায় ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিই আইনের ঊর্ধ্বে নয়। সকলেই আইনের চোখে সমান। ক্ষমতা, অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের অধীন। ডাইসি উল্লেখ করেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পুলিশ কর্মচারী ও সরকারি কর আদায়কারীগণ অন্যান্য নাগরিকের মতই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমভাবে দায়িত্বশীল।

ডাইসি আইনের অনুশাসন নীতির বিন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রাশসনিক আইনের ধারণাকে গ্রহণ করেন নি। ফ্রান্সে প্রশাসনিক কর্মচারীদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক আদালত ছিল। ডাইসির মতে, এই নীতির প্রয়োগ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে নাগরিকদের অধিকার সাধারণ আইন দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে। অনান্য দেশে যেভাবে সংবিধানের বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয়, গ্রেট ব্রিটেনে সেইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার উৎস নয়। পক্ষান্তরে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তই নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত করে। বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়। বিচারবিভাগ প্রধানত দেশের প্রথাগত আইন ও পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে।

ইংল্যান্ডে আইনের অনুশাসনতত্ত্বের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের মূলে আছে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠোমোর দ্রুত পরিবর্তন। সেই সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্র তাদের অধিকারের রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তৎকালীন পুঁজিবাদী কাঠামোয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সংরক্ষণের জন্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের কাঠামো গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক ছিল। ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব ওই অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলার একটি প্রয়াস। আইনের অনুশাসন, আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার এবং আইনের দ্বারা সকলের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নীতি কার্যকর করতে চেয়েছে। তবে বাস্তবে এই সমানাধিকারের অর্থ হ'ল সম্পদশালীদের সমানধিকার। কারণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে নিঃস্ব মানুষের জন্য আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। N.P. মূল্যায়ন ঃ ডাইসির আইনের অনুশাসনতত্ত্ব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর এই ধারণা ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। স্যার আইভর জেনিংসের মতে ডাইসির তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর একনিষ্ঠ উদ্যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাঁর এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে নানাদিক দিয়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

(১) ডাইসির ব্যাখ্যায় সকলপ্রকার স্ববিবেচনামূলক (discretionary) ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়, সেহেতু সরকারের হাতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা দরকার হয়ে পড়ে। এমনকী ডাইসির সময়েও অনেক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা (prerogatives) আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেনিংস-এর মতে সরকারি কর্তৃপক্ষ ব্যাপক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ভোগ করে। তিনি উল্লেখ করেছেন ইংল্যান্ডে প্রকৃত স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত।

(২) ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তত্ত্বগতভাবে এই নীতিটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি কতটা প্রযোজ্য সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুত ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিজের দেশেই সেই নীতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয়নি। আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম সমাজে কোনভাবেই আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অনেক সমালোচকের মতে, ডাইসি যে আইনগত সমতার বিষয় উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশের বিত্তশালী অংশের স্বাধীনতা ও সমতা। দেশের সকল অংশের সমতা নয়।

(৩) ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের তৃতীয় নীতিটিতে বলা হয় যে সাংবিধানিক আইনের দ্বারা নয়, আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইংল্যান্ডের নাগরিক অধিকারের বেশির ভাগই আদালতের সিদ্ধান্তের ফল নয়। উদাহরণস্বরূপ মহাসনদ, অধিকারের বিল, অধিকারের আবেদন, হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

(৪) অনেকসময় বিনা বিচারে ও আদালতের রায় ছাড়াই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজনে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আটক করতে পারে। ডাইসির নিজের দেশেই এই ধরনের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণীত হয়েছে। যেমন, ১৯১৪ সালের The Defence of the Realm Act, ১৯৩৯ সালের The Emergency Powers Act ইত্যাদি। এরই অনুসরণে ভারতের সংবিধানের ২২নং ধারা অনুযায়ী নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা আছে।

তবে উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে আইনের অনুশাসন আইনগত সমানাধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে আইনের অনুশাসন কেবলমাত্র আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার এখানে স্থান পাইনি। ডাইসি এই তত্ত্বের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদ প্রবর্তিত আইনগত সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনও পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষেই অর্থনৈতিক

সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ডাইসির দেশ গ্রেট ব্রিটেনেও তা সম্ভব হয়নি। আইনের অনুশাসন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিক এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পদদলিত হয়েছে। তাই মার্কস্‌বাদীরা বলেন যে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় আইন কখনও শ্রেণিস্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে পারে না।

অনুশীলনী—৫

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)**

(ক) আইনের অনুশাসনের প্রধান প্রবক্তা ডাইসি।

(খ) ব্রিটেনে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে নাগরিক অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়।

(গ) আইনের অনুশাসন আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করেছে।

২। ডাইসি কথিত 'আইনের অনুশাসন' যে তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলির উল্লেখ করুন।

০১.৪ ❑ সারাংশ

সংবিধানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে অদ্যবধি সম্ভব হয়নি। তাও এককথায় বল যায় যে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি মৌলিক নীতিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে।

ব্রিটিশ সংবিধান বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়নি। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। এখানে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা চালু থাকার দরুন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উপস্থিত। পার্লামেন্ট তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম। কিন্তু বাস্তবে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ তাদের কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন। এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইনের

প্রাধান্য, আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারেন বলে মনে করা হয়।

০১.৫ ❑ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎসগুলি কী কী?

২। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে কয়েকটি ঐতিহাসিক সনদের উল্লেখ করুন।

৩। ব্রিটেনের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয় কেন?

৪। ব্রিটিশ সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয় কেন?

৫। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস হিসেবে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

৬। ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অর্থ কী? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি কী কী?

৭। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কি স্বীকৃত?

০১.৬ ❑ উত্তরমালা

১। (ক) — ☑, (খ)— ☒, (গ)— ☒.

২। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে—ব্যাপক অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে বোঝায় দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত সকলপ্রকার নিয়মকানুনকে। লিখিত নিয়মকানুন বলতে বোঝায় আইন এবং অলিখিত নিয়মকানুন বলতে বোঝায় প্রথা, প্রচলিত রীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের লিখিত মৌলিক আইন-কানুন যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সংবিধান চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা বিশেষ সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়।

অনুশীলনী ----২

১। (ক)— ☒, (খ)— ☑ , (গ)— ☒ .

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও রাজার ক্ষমতা সংকোচন ও জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত এইসব আইনকেই

বিধিবদ্ধ আইন হিসাবে চিহ্নিত করা যায় এইসব বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৭৯, ১৮১৬ ও ১৮৬২ সালে প্রাণীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'হেবিয়াস কর্পাস' আইন, ১৭০১ সালে প্রণীত ' সেট্‌ল্‌মেন্ট আইন', ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালে প্রণীত 'পার্লামেন্ট আইন' প্রভৃতি।

অনুশীলনী—৩

(ক) লিখিত

(খ) সুপরিবর্তনীয়

(গ) এককেন্দ্রিক

(ঘ) নিয়মতান্ত্রিক

(ঙ) নেই

(চ) দ্বিদলীয়

অনুশীলনী—৪

১। (ক)— ☒, (খ)— ☑, (গ)— ☒, (ঘ)— ☑.

২। আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন—

(ক) আইন বলবৎযোগ্য, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতি বলবৎযোগ্য নয়।

(খ) আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে, আইনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(গ) আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক।

৩। সাংবিধানিক রীতিনীতি চারপ্রকার—(ক) রাজশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত, (খ) ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত, (গ) পার্লামেন্ট সম্পর্কিত এবং (ঘ) কমনওয়েলথ সম্পর্কিত।

৪। ১৩, ১৪, ১৫ পাতা অনুসরণ করুন।

অনুশীলনী—৫

১। (ক)— ☑, (খ)— ☑, (গ)— ☒.

২। পাঠ্যাংশের ১৩, ১৪, ১৫ পাতা-র আলোচনা দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

১। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হল—(ক) সনদ, (খ) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, (গ) বিচারবিভাগীয় প্রণীত আইন, (গ) বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, (ঘ) প্রথাগত আইন, (ঙ) সাংবিধানিক রীতিনীতি, (চ) আইন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

২। ঐতিহাসিক সনদ বা চুক্তিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(ক) ১২৫১ সালের 'মহাসনদ', (খ) ১৬২৮ সালের 'অধিকারের আবেদনপত্র', (গ) ১৬৮৯ সালের 'অধিকারের বিল' এবং (ঘ) ১৭০১ সালের 'সেট্‌ল্‌মেন্ট' প্রভৃতি।

৩। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান কোন আইনসভা, গণপরিষদ অথবা সাংবিধানিক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত হয়নি। রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলী, প্রধান প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংকলিত করে লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয়নি। এই সংবিধান কোন নির্দিষ্ট সময়ে রচিত হয়নি। সেইজন্য এই সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়।

৪। ব্রিটিশ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই এই সংবিধান পরিবর্তন করা যায়। তবে সমালোচকদের মতে তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটিশ সংবিধান যতটা নমনীয় বাস্তবে ততটা নমনীয় নয়। কেননা কোন দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পরিবর্তনীয় তা নির্ভর করে সমাজের প্রাধান্যকারী শ্রেণির স্বার্থ সেই সংবিধান রক্ষা করতে পারছে কি না তার ওপর।

৫। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস হিসেবে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হল—(১) অ্যানসনের ''Law and Customs of the Constitution, যে রচিত ''Parliamentary Practice'' এবং জেনিংস-এর ''Law and the Constitution.

৬। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা'-য় আইনের অনুশাসন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্য, আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

৭। গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নেই। যা আছে তা হল কাঠামোগত স্বতন্ত্রীকরণ। গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শাসনবিভাগের আইনগত প্রধান হলেন রানি। তিনি আবার পার্লামেন্টেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একমাত্র বিচারবিভাগের ক্ষেত্রেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রযোজ্য।

পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির জন্য মূল্যায়ন অংশটি অনুসরণ করুন।

০১.৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J.Harvey and L. Bather, MacMillan*—The British Constitution, St. Martin's Press, 1970.

২। *Sir Ivor Jennings*—Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959.

৩। *ডঃ অনাদি কুমার মহাপাত্র*—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

৪। *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ*—তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। *সুদর্শন ভট্টাচার্য*—(প্রশ্নোত্তরে) তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ইণ্ডিয়ান প্রোসেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ০২ ❑ শাসনবিভাগ

গঠন

০২.১ উদ্দেশ্য

০২.২ প্রস্তাবনা

০২.৩ রাজা এবং রাজশক্তি

রাজশক্তির ক্রমবিবর্তন

রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস

রাজশক্তির ক্ষমতা

রাজশক্তির ক্ষমতার মূল্যায়ন

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণ

০২.৪ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট

প্রধানমন্ত্রী পদের উৎস

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব

ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীপরিষদ

পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী

০২.৫ সারাংশ

০২.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

০২.৭ উত্তরমালা

০২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

০২.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটিশ গণতন্ত্রে আজও রাজশক্তি কিভাবে টিকে আছে।
- ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা।
- ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

০২.২ ❑ প্রস্তাবনা

গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা বর্তমান। এই ব্যবস্থায় একজন নাম সর্বস্ব অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক থাকেন যিনি নামে শাসক কিন্তু প্রকৃত কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি হলেন রাজা বা রানি।

ব্রিটেনে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ। প্রধানমন্ত্রী হলেন ব্রিটেনের প্রশাসনিক কাঠামোয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লেখক গ্রেট ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রীর শাসিত শাসনব্যবস্থারূপে অভিহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে তাঁর ক্যাবিনেট। এই ক্যাবিনেটই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির মস্তিষ্ক বিশেষ। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র প্রশাসন আবর্তিত হয় এবং আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের সংযোগ রক্ষিত হয়।

০২.৩ ❑ রাজা ও রাজশক্তি

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা ও রাজশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

শক্তির ক্রমবিবর্তন

ব্রিটিশ রাজতন্ত্র বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান যা আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দীর্ঘ কয়েক শতকের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজশক্তি আজ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে রাজশক্তির মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। এই রাজশক্তির বিকাশের মাধ্যমেই ওই দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজা এগবার্টের সময় থেকেই রাজশক্তির সূচনা।

একাদশ শতকে রাজা উইলিয়মের সময়ে ইংল্যান্ডে সামন্ততন্ত্রের অধ্যায় শুরু হয়। তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে সামন্ত ও যাজকশ্রেণির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ডে টিউডর আমলে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ, নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্থায়িত্ব ও সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করার ফলে টিউডর স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন বজায় ছিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডের সামাজিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির দ্রুত প্রসার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিতে দুর্বল করে দিতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির সামাজিক উত্থানের জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির ভিত্তি ও সামন্তদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। চরম রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রধান রক্ষক। এই চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানাবার জন্য ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল যেখানে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির নেতৃত্বেই রাজতন্ত্রের অবাধ কর্তৃত্ব ও সামন্তদের দাপটের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। তারই ফলশ্রুতি গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮ সালে। এই বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। পার্লামেন্ট মূল ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং রাজতন্ত্র ক্রমে আলঙ্কারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে এই সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রও জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিল। বর্তমান শতকেও রাজতন্ত্রের ভূমিকা অব্যাহত আছে। এর কারণ রাজশক্তি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস

ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্ষমতা বলতে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে রাজা বা রানির ক্ষমতাকে বোঝায়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানরূপে রাজশক্তির ক্ষমতাকে বোঝায়। বর্তমানে রাজশক্তি বলতে প্রাতিষ্ঠানিক রাজাকেই বোঝায়। গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ব্যক্তিগত রাজার নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রাজার নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে রাজা ব্রিটেনের প্রশাসনিক প্রধান যদিও বাস্তবে তিনি নামসর্বস্ব শাসক অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

আমরা জানি যে ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত সংবিধান এবং মুখ্যত তা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্বভাবতই ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতা কোন সংবিধানে বর্ণিত হয়নি। রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস হ'ল ঃ (১) রাজকীয় বিশেষাধিকার (Royal Prerogatives) এবং (২) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Statute)।

(১) **রাজকীয় বিশেষাধিকার ঃ** একসময় রাজা ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী কিন্তু গৌরবময় বিপ্লবের পর রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং পার্লামেন্টকেও তার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তান্তরিত করতে হয় পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল এক ক্যাবিনেটের ওপর। এর পরেও তাঁর পূর্বতন স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতার মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে তাকেই রাজকীয় বিশেষাধিকার বলা হয়। বস্তুত বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজকীয় বিশেষাধিকার বলতে সার্বভৌম রাজশক্তির সেই সকল ক্ষমতাকে বোঝানো হয় যা তিনি বিধিবদ্ধ আইনের পরিবর্তে আইনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। বর্তমানে রাজকীয় বিশেষাধিকারকে অবশিষ্ট (Residue) ক্ষমতারূপে বিবেচনা করার কারণ হ'ল পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে এই ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে। পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে কোনও কোনও বিশেষাধিকারকে অধিগ্রহণ করেছে। আবার কোনও কোনও বিশেষাধিকার দীর্ঘকাল প্রয়োগ না করার ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে আইনগতভাবে বিশেষাধিকার রাজার হাতে ন্যস্ত। তবে এটি একটি নিছক ধারণামাত্র। রাজশক্তি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তাছাড়া এই ক্ষমতার প্রয়োগ আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত। আদালত এই ক্ষমতার প্রয়োগে কাউকে বাধ্য করতে পারে না এবং এই ক্ষমতা লঙ্ঘিত হ'লে কোনও ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন না।

কয়েকটি রাজকীয় বিশেষাধিকার ঃ

(১) রাজা/রানি সকল ন্যায়নীতির উৎস। (The King/Queen is the fountain of Justic.)

(২) রাজা/রানি সকল রাষ্ট্রীয় সম্মানের উৎস। (The King/Queen is the fountain of state Honour).

(৩) রাজা/রানি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। (The King/Queen is the Head of the Armed Force).

(৪) রাজার মৃত্যু নেই। (The king never die.)। এক রাজা বা এক রানির মৃত্যু হ'লেও সিংহাসন শূন্য থাকে না। রাজতন্ত্র অব্যাহত থাকে।

(৫) পার্লামেন্ট বিষয়ক রাজকীয় বিশেষাধিকার (Prerogatives relating to Parliament). রাজা/রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান, সমাপ্তি ঘোষণা এবং মুলতুবি রাখার ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজা/রানির সম্মতি ব্যাতীত পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও বিল আইনে পরিণত হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, বিশেষাধিকার বলতে রাজশক্তির মধ্যযুগীয় ক্ষমতার সেই অবশিষ্ট অংশকে বোঝায়, যা প্রথাগত আইন এবং পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে সংশোধন ও প্রত্যাহার করা হয়নি।

ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার দ্বিতীয় উৎস হল বিধিবদ্ধ বা পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বিধিবদ্ধভাবে রাজাকে কতকগুলি ক্ষমতা দিয়েছে।

অনুশীলনী ---- ১

১। ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস কী?

২। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষাধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির দুটি উদাহরণ দিন।

৩। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষাধিকার বলতে কী বোঝায়?

রাজশক্তির ক্ষমতা

ক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী রাজশক্তির ক্ষমতাকে শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত, বিচারসংক্রান্ত এবং অন্যান্য ক্ষমতা—এইভাবে ভাগ করা যায়।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা—তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনে শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা রাজা বা রানির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'লেন রাজা বা রানি। শাসন সংক্রান্ত সব ক্ষমতাই রাজা বা রানির নামে প্রয়োগ করা হয়। শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) যাতে আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তা দেখা এবং তাকে সুনিশ্চিত করা।

(খ) প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করা এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা; শাসনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিচারকদের নিয়োগ করা; স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করা।

(গ) এইসব কর্মচারীদের অপসারণ করা।

(ঘ) স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে সামরিক বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া।

(ঙ) রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত। বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্রও তিনি গ্রহণ করেন।

(চ) আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন করা।

(ছ) যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তি স্থাপন করা।

(জ) ডমিনিয়ান ও উপনিবেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করা। রাজা ডমিনিয়ানসমূহের ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের গভর্নর জেনারেল নিয়োগ করেন।

আইনংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ ব্রিটেনে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রিটেনে পার্লামেন্ট বলতে রাজাসহ পার্লামেন্টকে বোঝায়। কারণ ব্রিটেনের রাজা বা রানি এবং লর্ডসভা ও কমন্সসভাকে নিয়েই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত।

ব্রিটেনে পার্লামেন্ট গঠনে রাজার ভূমিকা নেই। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানির আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাবলে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজনে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন।

(খ) পার্লামেন্টের পাশ হওয়া বিল রাজা বা রানির সম্মতিলাভ করলে আইনে পরিণত হয়।

(গ) ব্রিটেনের রাজা পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী এই ভাষণ রচনা করেন।

(ঘ) রাজশক্তির কিছু আদেশ জারির ক্ষমতাও আছে। এই আদেশ জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এই আদেশকে সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) বলা হয়।

(ঙ) রাজা বা রানি অনেক সময় পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। তবে রাজা বা রানি তাঁদের আইনসংক্রান্ত সব ক্ষমতাই মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করে থাকেন। বস্তুত আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ক্ষমতার অনুরূপ।

(চ) রাজা বা রানির পূর্বসম্মতি নিয়ে কমন্সসভার অর্থ বিল ও বার্ষিক বাজেট পেশ করা হয়।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাজা বা রানিকে ব্রিটেনের সকল ন্যায়বিচারের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানি তাঁর বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তাঁর বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) রাজা বা রানি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন।

(খ) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে তিনি বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন।

(গ) রাজা বা রানির নামে সকল প্রকার বিচার পরিচালিত হয় এবং রাজার নামে অপরাধীদের দন্ড দেওয়া হয়।

(ঘ) রাজা বা রানি বিচারালয়ে দন্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ড হ্রাস বা মুকুব করতে পারেন।

(ঙ) কমনওয়েলথ ভুক্ত কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং উপনিবেশগুলির বিচারালয় থেকে আসা আপিল বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিচারকার্য সম্পাদন করেন।

অন্যান্য ক্ষমতা ঃ

(ক) ব্রিটেনের রাজা বা রানি ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চার্চের প্রধান। এই দায়িত্ব থেকেই তিনি প্রধান যাজক ও অন্যান্য যাজকদের নিযুক্ত করেন। চার্চের বিভিন্ন বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতিসাপেক্ষ। তবে চার্চ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারবিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজা বা রানির সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের কোনও সম্পর্ক নেই।

(খ) ব্রিটেনের রাজা বা রানির হাতে সম্মানজনক উপাধি বন্টনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই জন্য রাজা বা রানিকে সকল সম্মানের উৎস বলা হয়। ব্রিটেনে নববর্ষ, রাজ্যভিষেক অথবা রাজা/রানির জন্মদিন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানসূচক উপাধি ও পদবি বন্টন করা হয়।

ব্রিটেনের রাজা বা রানি ইংল্যান্ডের এবং স্কটল্যান্ডের চার্চের প্রধান চার্চের বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতি সাপেক্ষ।

ব্রিটেনের রাজা বা রানি কমনওয়েলথ-এর প্রধান। তাঁর মাধ্যমেই ব্রিটেনের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সংযোগ রক্ষিত হয়েছে।

অনুশীলনী ---- ২

১। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?

২। ব্রিটেনে রাজা কোন্ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন?

৩। সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) কাকে বলে?

৪। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যে কোনও একটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার উল্লেখ করুন।

রাজশক্তির ক্ষমতার মূল্যায়ন

ব্রিটেনের রাজশক্তির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম মতের সমর্থকরা রাজা বা রানিকে ব্রিটেনের প্রকৃত শাসক বলে চিহ্নিত করে তাঁর বিপুল ক্ষমতার উল্লেখ করেন। ওয়ালটার বেহজট-এর মতে এখনও রানির পরামর্শদান সতর্ক করার এবং উৎসাহদানের ক্ষমতা আছে। তিনি প্রয়োজনবোধে তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীকে স্বমতে আনয়নে বাধ্য করতে পারেন। মন্ত্রীসভা কর্তৃক রাষ্ট্রস্বার্থবিরোধী কোনও নীতি গৃহীত হ'লে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। গঠনমূলক কাজেও রাজা বা রানি মন্ত্রীসভাকে উৎসাহিত করতে পারেন। বার্কারও রাজশক্তিকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার 'ক্রিয়াশীল' অংশরূপে চিহ্নিত করতে চান। রাজশক্তির গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে গ্ল্যাডস্টোন উল্লেখ করেছেন যে ইংল্যান্ডে রাজা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সামাজিক কাঠামোর শীর্ষে অবস্থিত। তিনি আইন-প্রণেতা, চার্চের প্রধান, ন্যায়বিচার এবং সকল সম্মানের একমাত্র উৎস। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করেন। তিন সার্বভৌম পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন ও কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয় মতের সমর্থকরা উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে এই অভিমত পোষণ করেন যে তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজা বা রানি পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি

রাজত্ব করলেও শাসন করেন না। বস্তুত রাজা বা রানি ক্ষমতাহীন আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। এককথায় কোনও ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই রাজা বা রানির ব্যক্তিগত ভূমিকার কোন মূল্য নেই।

কিন্তু সঠিক অবস্থা যথার্থ পর্যালোচনা করলে রাজা বা রানির পদমর্যাদা সম্পর্কে উপরোক্ত দুটি অভিমতের কোনও একটিকে এককভাবে সমর্থন করা যায় না। দু'ধরনের বক্তব্যের মধ্যেই কিছুটা সত্যতা নিহিত আছে। কারণ বর্তমানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী তথ্য মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে এখনকার দিনে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা যায় না। যেমন, কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। কিন্তু কমন্সসভায় নির্বাচনে কোনও দল যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় সেক্ষেত্রে রাজা বা রানি নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারেন।

অতএব আমরা বলতে পারি যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মত চলার ক্ষেত্রে রাজা বা রানির বাধ্যবাধকতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করে রাজা বা রানির দক্ষতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধি বিবেচনার ওপর।

স্যার আইভর জেনিংস রাজার চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, (১) রাজা বা রানির প্রভাব সংবিধানের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। (২) তাঁর প্রভাব কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। (৩) তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈকিত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং (৪) রাজনৈতিক এলাকার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণ

(১) **সাংবিধানিক সুবিধা ঃ** রাজা বা রানি বর্তমানে সাংবিধানিক ভূমিকাই পালন করেন। তাই রাজশক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সৃষ্টি হয় না। আইভর জেনিংস-এর মতে রাজা বা রানিই শাসনতন্ত্রকে ধরে রেখেছেন।

(২) **রাজপদের ব্যবহারিক মূল্যঃ** ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজপদের ব্যবহারিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় নীতি ও দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা হিসেবে রাজা বা রানির পরামর্শের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

(৩) **রাজা বা রানি নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল ঃ** যুদ্ধ, জাতীয় সংকট অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা মানুষ

রাজা বা রানিকেই নিরাপত্তার প্রতীক বলে মনে করেন। জনগণের এই মানসিকতাই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বাঁচিয়ে রেখেছে।

(৪) **দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে অবস্থান ঃ** রাজা বা রানি কোনও বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর নেতা নন, তিনি আপামর জনসাধারণের রাজা। জনগণের এই অনুভূতিই ইংল্যান্ডের রাজা বা রানিকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করেছে।

(৫) **সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষা করে রাজশক্তি এবং সেই জাতিকে বৈপ্লবিক অস্থিরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

(৬) **সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপস্থিতি। ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজা বা রানি এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানির বিকল্প কোনও পদ এখনও সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি।

(৭) **রাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ ঃ** ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি বরং গণতন্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছে। এই গণতন্ত্রীকরণের জন্যই ব্রিটেনে রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

(৮) **রাজশক্তি ব্যয়বহুল নয় ঃ** অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মার্কিন অথবা ফরাসি রাষ্ট্রপতির জন্য সরকারি কোষাগার থেকে প্রত্যেক বছর যে ব্যয় নির্বাহ হয়, ব্রিটেনে রাজা বা রানির তুলনায় সেই ব্যয় অনেক বেশি। কিন্তু রাজশক্তির সপক্ষে প্রদত্ত এই আর্থিক যুক্তি অনেকসময় গ্রাহ্য হয় না, যে কারণে বর্তমানে চেষ্টা চলছে রাজকীয় ব্যয়ের বহর একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার।

(৯) **ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা ঃ** ব্রিটেনের জনসাধারণের চিন্তাধারা ও রক্ষণশীলতাও রাজশক্তি বজায় রাখার জন্য দায়ী। ঐতিহ্যের প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি এখনও মানুষের আকর্ষণ রয়েছে।

(১০) **অপরিহার্যতা ঃ** ওয়াল্টার বেজহটের মতে রাজা বা রানির অস্তিত্ব ছাড়া ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থা শুধু ব্যর্থই হত না, বিলুপ্তও হ'ত।

(১১) **ধারাবাহিকতা রক্ষা ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনে রাজশক্তি নিরাচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনুপ্রেরণা দেয়। কার্যরত অবস্থায় কোনও প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু বা কোনও প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অন্য কোনও মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজা বা রানির হাতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকে।

(১২) **কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ঃ** রাজা বা রানি ছাড়া কমনওয়েলথের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হতো কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(১৩) **অভিজ্ঞতার যুক্তি ঃ** আজীবন রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলেই রাজা বা রানির পক্ষে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব। এই সুযোগ কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নেই।

উপসংহার ঃ বর্তমানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজা বা রানির ভূমিকার সমালোচনা করে সমালোচকগণ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন।

(১) রাজা বা রানি কখনও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হ'তে পারেন না।

(২) রাজপদ যেহেতু বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু সেটি একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

(৩) রাজতন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

(৪) রাজা বা রানি সমাজের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

(৫) মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজা বা রানি সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যুগেও সেই রাজা বা রানি পুঁজিপতি শ্রেণির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। সেই জন্যই ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণি রাজা বা রানিকে তাদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী বলে তো মনে করেই না বরং রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থেই তাকে ব্যবহার করতে চায়। তাই বলা যায় যে ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সহায়ক বলেই রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

০২.৪ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দু হ'ল ক্যাবিনেট। প্রধানমন্ত্রী হ'লেন সেই ক্যাবিনেটে তোরণের কেন্দ্রপ্রস্তর। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারি কাজকর্ম আবর্তিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী পদের উৎস

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদের সূচনা শতাব্দীর শেষে ও ঊনিবংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হলেও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীই হ'লেন ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তিতে সর্বপ্রথম 'প্রধানমন্ত্রী' এই নামটি উল্লিখিত হয়। আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোনও কোনও সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ আইন-এ প্রধানমন্ত্রী পদের কোনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত ছিল না। ১৯৩৭ সালে 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে প্রথম আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর মর্যাদাও বেড়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। যখন কোনও একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যাই দেখা দেয় না। কিন্তু কোনও দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেই সমস্যা দেখা দেয়। তখন প্রচলিত

রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হ'লে স্ববিবেচনা প্রয়োগের কোনও সুযোগ ও সম্ভবনা থাকে না।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুখ্যত সাংবিধানিক রীতিনীতি ও প্রথাগত আইনই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস। বিভিন্ন সময়ে পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের দ্বারাও তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইনগত দিক থেকে না হ'লেও কার্যগত দিক থেকে ব্রিটেনের রাষ্ট্র প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তিনিই হলেন সিদ্ধান্তগ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মূল্য উৎস। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্ত বিষয়ের চুড়ান্ত দায়িত্ব তিনিই বহন করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** নির্বাচনের পর কমন্সসভার যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং এই দলীয় সংখ্যগরিষ্ঠতার ওপরই তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব নির্ভরশীল। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যাতে তাঁর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে সেদিকে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নতুবা কমন্সসভার আস্থা হারালে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। কমন্সসভার ভিতরে ও বাইরে দলীয় সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রধান দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলের মতামত ও সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতে হয়।

(২) **মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় ক্যাবিনেট তোরণের কেন্দ্র প্রস্তর। তিনি হ'লেন মন্ত্রীপরিষদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করার পর রাজা বা রানি মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানি মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। মন্ত্রীসভার গঠন থেকে শুরু করে পুনর্গঠন বা সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুই নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের ওপর। মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেটের ঐক্য ও সংহতি মূলত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই রক্ষিত হয়। সুতরাং মন্ত্রীপরিষদের নেতা হিসেবে তিনি কতটা যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটকে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করেন তার ওপরেই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্য।

(৩) **কমন্সসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন কমন্সসভার নেতা। কমন্সসভার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী থাকেন বটে, কিন্তু কমন্সসভার কাজকর্ম তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রীসভার নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক সিদ্ধান্ত কমন্সসভার অভ্যন্তরে উপস্থাপিত করেন এবং তার সমর্থনে ব্যাখ্যা

পেশ করেন। কমন্সসভার অভ্যন্তরে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে কোনও মন্ত্রী অসুবিধায় পড়লে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উত্তর দিতে সাহায্য করেন এবং তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেন। কমন্সসভায় বিরোধী দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং কমন্সসভার নেতা হিসেবে তিনি কতটা দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন মূলত তার ওপরই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বের সাফল্য।

(৪) **প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানির ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানি রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এবং বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানি পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রানি কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এককভাবে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। ক্যাবিনেটের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তিনি কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রানিকে পরামর্শ দেন। বস্তুত মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রানিকে পরামর্শ দেন।

(৫) **প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রনীতির রূপকার ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্যরূপকার। পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য প্রবক্তারূপে তিনি পরিচিত। আন্তর্জাতিক ঘটনবলী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকেই সরকারি বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ কূটনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বলাভ করে। যুদ্ধ ও শান্তি প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৬) **প্রধানমন্ত্রী রানি ও ক্যাবিনেটের যোগসূত্র ঃ** প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ও রানির মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেন। সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত তিনি রানির কাছে পেশ করেন। সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রানির মতামত ক্যাবিনেটে পেশ করেন। রানি কোনও বিষয় ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য পাঠাতে ইচ্ছুক হলে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই তিনি তা ক্যাবিনেটকে জ্ঞাত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই দায়িত্বভার পূর্বের মত এখন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। রানি মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ও নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন না।

(৭) **আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ঃ** প্রধানমন্ত্রীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হওয়া। কমনওয়েলথ সম্মেলনে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব মূলত প্রধানমন্ত্রীই গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা

প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহিত ও কার্যকর হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেই লর্ড মোর্লি (Lord Morley) তাঁকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রস্তরখন্ড' (Keystone of the Cabinet arch) নামে অভিহিত

করেছেন। আবার তাঁকে 'সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' (First among equals) বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে তাঁর এই ভূমিকা অবশ্যই কয়েকটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এইসব উপাদানগুলি হলঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা, দল ও সহকর্মীদের ওপর প্রভাব, তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইত্যাদি। আইনের দিক থেকে সকল প্রধানমন্ত্রী একই ক্ষমতা ভোগ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে কোনও কোনও প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পেরেছেন।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে সরকারি দলের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই নন, তিনি রাজা, রানি এবং ক্যাবিনেটের যোগসূত্র। তিনি মন্ত্রীপরিষদের নেতা নন, তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রীসভার উত্থানপতন ঘটে।

আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বহুমুখী ও ব্যাপক ক্ষমতা তাঁকে একনায়কের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। যেহেতু তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন, যেহেতু তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং নিজের দলকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারেন, সেহেতু তাঁকে একনায়ক বলাই যুক্তিযুক্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কোন বিকল্প নেই। আসলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে এত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন যে তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রক বলা যায়।

তবে সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সব কিছুর উর্ধ্বে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণমুক্ত একজন সব অর্থে স্বেচ্ছাধীন শাসক নন। কারণ প্রধানমন্ত্রীকেও কতকগুলি বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একনায়ক হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রধানমন্ত্রীর পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক জীবন, জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিগত আর্কষণ তাঁর প্রভাব প্রসারিত করে। জনপ্রিয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সহজেই সরকারি সিদ্ধান্ত জনমতের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়। তাঁর প্রভাব ও গুরুত্ব রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকী আন্তর্জাতিক পরিবেশের ওপরেও নির্ভরশীল।

আসলে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকুশলতা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। তিনি যদি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি ব্যপক ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। আবার তিনি যদি কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত অনুকুল পরিস্থিতিতেও তাঁর পক্ষে ক্ষমতা উপভোগ করা সম্ভব নয়। তাই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথ-এর বক্তব্যকে সামনে রেখে একথা বলা যায় সে পদাধিকারী যেভাবে ব্যবহার করতে চান প্রধানমন্ত্রীর পদ ঠিক সেইভাবেই তাঁর সামনে দেখা দেবে।

অনুশীলনী—৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার _____ _____ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন।

২। লর্ড মোর্লি প্রধানমন্ত্রীকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত _____, বলে বর্ণনা করেছেন।

৩। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হলেন মন্ত্রীপরিষদ ও রানির মধ্যে প্রধান _____।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব

স্যার আইভর জেনিংস ক্যাবিনেটকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রবিন্দুরূপে অভিহিত করেছেন। নির্দেশদানের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হল ক্যাবিনেট। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। মধ্যযুগের মহাপরিষদ (Magnum Councilium) ছিল আধুনিক ক্যাবিনেটের প্রাথমিক রূপ। এই পরিষদের সদস্যরা ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা। কর ধার্যসহ অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দান করাই ছিল এই পরিষদের সদস্যদের প্রধান কর্তব্য। রাজকার্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সুষ্ঠভাবে কার্য পরিচালনার জন্য রাজা কিউরিয়া রেজিস (Curia Regis) বা ক্ষুদ্র পরিষদ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। নিয়মিতভাবে এই সংস্থার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। রাজার প্রধান কর্মচারীদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত হ'ত। কালক্রমে ক্ষুদ্র পরিষদ প্রিভি কাউন্সিলে পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতকে প্রিভি কাউন্সিল সুষ্ঠু আকার ধারণ করে। প্রিভি কাউন্সিল শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার মূল উৎস ছিল। এই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়াতে এই সংস্থা নীতি নির্ধারণ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত না। সেই জন্যই রাজা প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস্ ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় চার্লস্ যে পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করতেন তাঁদের আদ্যাক্ষর যুক্ত করে ক্যাবাল (Cabal) শব্দের উদ্ভব ঘটে। এই পাঁচজন সদস্য হলেন—ক্লি-ফোর্ড (Cliford), আরলিংটন (Arlington), বাকিংহাম (Buckingham), অ্যাসলী (Ashely), লডারডেল (Lauderdale) । ক্যাবাল-এর কার্য পরিচালনা পদ্ধতি কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই ক্যাবাল রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। এই ক্যাবাল থেকেই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি।

আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জের শাসনকালে। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত থাকার নীতি বর্জন করেন। রাজা দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জও ওই একই পদ্ধতি অনুসরণ

করেছিলেন। ক্যাবিনেটের সকল সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রী রাজার কাছে পেশ করতেন। এই মন্ত্রীই পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হন। এভাবে একদিকে যেমন রাজার প্রভাব হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমন ক্যবিনেটে একজন প্রাধান্য সৃষ্টিকারী মন্ত্রীরও উদ্ভব ঘটে। অষ্টাদশ শতকে প্রশাসন পরিচালনার প্রয়োজনে ক্যাবিনেটই রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শতকের শেষভাগে কমন্সসভা ক্যাবিনেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় রাজা তৃতীয় জর্জ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার ফলে প্রধানমন্ত্রী পিট সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ক্যাবিনেট ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিভিন্ন সাংবিধানিক রীতিনীতির উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন ক্যাবিনেট গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। আবার ক্যাবিনেট এর সফল সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রীগণ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকেন।

ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীপরিষদ

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই দুই শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্রেট ব্রিটেনের কমন্সসভার সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাই ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা গঠন করে। ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা সকলেই পার্লামেন্টের সদস্য এবং ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত ঃ গঠনগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেটের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়। ব্রিটেনের সব মন্ত্রীকে নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের সদস্যই মন্ত্রীসভার সদস্য। কিন্তু মন্ত্রীসভার সব সদস্য ক্যাবিনেটের সদস্য নন।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। কিন্তু মন্ত্রীসভার সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন।

তৃতীয়ত ঃ ক্যাবিনেটই রাজা বা রানিকে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু মন্ত্রীসভা এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

চতুর্থত ঃ সাধারণত সপ্তাহে একদিন ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন সপ্তাহে দু'বারও ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। কিন্তু মন্ত্রীসভার বৈঠকের ব্যাপারে এই ধরনের কোনও নিয়ম নেই। মন্ত্রীসভার বৈঠক অনিয়মিতভাবেই আহুত হয়।

পঞ্চমত ঃ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট যৌথভাবে একটি টিম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মন্ত্রীসভার সদস্যগণ সাধারণত নিজের নিজের বিভাগীয় দায়িত্বে কাজ করেন, টিম হিসেবে নয়।

ষষ্ঠত ঃ ক্যাবিনেটের কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মন্ত্রীসভা হল একটি আইনগত সংস্থা।

পরিশেষে বলা যায় যে ক্যাবিনেটের সদস্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেই হয়; ক্যাবিনেট বহির্ভূত মন্ত্রীদের সর্বপ্রকার তথ্যের ভার বহন করতে হয় না।

ব্রিটেনকে ক্যবিনেট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয় বলে মন্ত্রীসভার সঙ্গে ক্যাবিনেটের পার্থক্য নিরূপণ করার অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী —৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ক্যাবাল শব্দটি থেকে ক্যাবিনেট শব্দটির জন্ম।

(খ) মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য আছে।

(গ) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন।

(ঘ) ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের আইনগত ভিত্তি আছে।

পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের পরিবর্তে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্যাবিনেটের সম্পর্ক নির্ণয় অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্বগত ধারণা অনুযায়ী ব্রিটেনের আইনসভাই আইনপ্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা আজ আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় তার খসড়া প্রস্তাব করে ক্যাবিনেট এবং তা উত্থাপনও করেন কোনও না কোনও মন্ত্রী। ক্যাবিনেটের সদস্যরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেহেতু পার্লামেন্ট, বিশেষত কমন্সসভায় সাধারণ সদস্যরা ক্যাবিনেটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার মত সাহস দেখান না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। উচ্চকক্ষ লর্ডসভা ও নিম্নকক্ষ কমন্সসভা। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে সরকারি আয়ব্যয়ের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানে কমন্সসভার ভূমিকা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বাৎসরিক বাজেট কমন্সসভার তরফ থেকে শুধু পেশই করা হয়। কমন্সসভার সদস্যদের

বিশেষীকৃত কোনও জ্ঞান না থাকার দরুন কোনও আলোচনা ছাড়াই বাজেট কমন্সসভায় অনুমোদিত হয়। আর অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে এই সুযোগে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়েছে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করাই পার্লামেন্ট বা আইনসভার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানকালে জটিল সমাজব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আইনসভার বেশির ভাগ সাধারণ সদস্যেরই তা থাকে না। তদুপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বর্তমানে জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার ফলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিপুল আইন প্রণয়ন প্রয়োজন তা প্রণয়ন করার সময় ও সুযোগ কোনওটাই পার্লামেন্টের বিশেষত আইনসভার হয় না। এই অবস্থায় পার্লামেন্ট আইনের মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করে সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে অর্পণ করে। একেই বলা হয় অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন। এই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা ততই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে কমন্সসভার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিরোধিতার সম্মুখীন হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমন্সসভা গঠনের জন্য রাজা বা রানিকে পরামর্শ দিতে পারেন।

তবে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না।

(খ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ক্যাবিনেটকে সংযত থাকতে বাধ্য করে।

(গ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে প্রশ্নোত্তর পর্ব মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন, বাজেট বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমেও পার্লামেন্ট অর্থাৎ কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) ক্যাবিনেট সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী পার্লামেন্ট প্রণীত কোনও আইনের দ্বারা নির্ধারিত হয়। ১৯৩৭ সালের 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল।

(২) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটই মুখ্য শাসক। ক্যাবিনেটই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থা। সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় সমবেতভাবে ক্যাবিনেটকেই গ্রহণ করতে হয়।

(৩) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থায় আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, এই ব্যবস্থা দলীয় শাসনব্যবস্থা। কমন্সসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে। দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দলের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করার জন্য রানিকে পরামর্শ দেন। প্রত্যেক মন্ত্রী দলীয় নীতি ও শৃংখলার দ্বারা আবদ্ধ। দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাবিনেট সরকারি নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৪) প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। গত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারি নীতি প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সরকার ও সরকারি দলের সাফল্য ও প্রভাব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল।

(৫) আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানকার সংসদীয় ব্যবস্থায় যেহেতু ক্যাবিনেটের সমস্যরা পার্লামেন্টেরও সদস্য, সেহেতু এখানে এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। ফলে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের পেছনে পার্লামেন্টের সক্রিয় সমর্থন থাকে। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত।

(৬) গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যৌথ দায়িত্বশীলতা। পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এই দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের—ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রীরা যেমন একদিকে কোনও একটি প্রশাসনিক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রীরা যৌথভাবে সমগ্র ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কারণেই কোন মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের কাজকর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জাবাবদিহি করতে হয়, তেমনি অন্যদিকে ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

(৮) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের আস্থা হারালে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতেই হয়।

ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একমত নন, তবু এককথায়

বলা যায় যে অতীতের প্রিভি কাউন্সিল থেকে বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব। তবে আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জ-এর সময় থেকে।

ক. ক্যাবিনেটের গঠন

গ্রেট ব্রিটেন কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে এবং ওই দলের নেতা বা নেত্রীকে রানি মন্ত্রীসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। এই মন্ত্রীসভা থেকে কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। মন্ত্রীসভা পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। ক্যাবিনেটেরও স্থায়িত্ব তাই পাঁচ বছর। তবে তার মধ্যে কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই সঙ্গে ক্যাবিনেটও বাতিল হয়ে যায়।

কতজন সদস্য নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হবে সে সম্পর্কে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যাও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত কারা হবে প্রধানমন্ত্রীই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাধারণভাবে ১৪ থেকে ২৪ জন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। ১৯২২ সালে গ্রেট ব্রিটেন যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪। এটিই ছিল ব্রিটেনের ক্ষুদ্রতম ক্যাবিনেট। আবার ১৯৬৪ সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসনের নেতৃত্ব যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪। ১৯৮৪ সালে মার্গারেট থ্যাচারের ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা ছিল ২১।

ক্যাবিনেটের সদস্য হতে গেলে সেই ব্যক্তিতে প্রথমত পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তির রাজনৈতিক যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত সেই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হওয়া প্রয়োজন। চতুর্থত পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমত প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল যাতে প্রতিনিধিত্ব পায় সেদিকেও প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্যাবিনেট সাধারণত ট্রেজারির প্রথম লর্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ক্যাবিনেটের মধ্যে আবার ইনার ক্যাবিনেট, কিচেন ক্যাবিনেট এবং শ্যাডো ক্যাবিনেটও থাকে। প্রথম দুটি হল প্রধানমন্ত্রীর অতি বিশ্বস্ত এবং দলের একেবারে প্রথমসারির নেতাদের একান্ত ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীর অন্য নাম। শ্যাডো ক্যাবিনেট বা ছায়া মন্ত্রীপর্ষদ হল বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি বিকল্প গোষ্ঠী। যার সদস্যরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সরকারের এক একটি বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং যদি কখনো মন্ত্রীসভার পতন হয় তখন ওই ছায়া মন্ত্রীপর্ষদই যেন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তৈরি থাকে।

খ. ক্যাবিনেটের কার্যাবলী

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট হল শক্তিশালী কার্যনির্বাহী সংস্থা। ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি—

(১) নীতি নির্ধারণ ঃ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট একটি নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। জাতি ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর ক্যাবিনেট নীতি নির্ধারণ করে। ওই নীতির ভিত্তিতেই পরে অন্যান্য বিভাগের নীতি নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব হল ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিকে বাস্তবায়িত করা। ক্যাবিনেট কেবল বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্যই নীতি নির্ধারণ করে না। সম্ভাব্য সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

(২) আইন প্রণয়ন ঃ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পার্লামেন্টে বিল উত্থাপিত হয়। সে সব বিষয়ে পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সেইসব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বিলের খসড়া তৈরি করে পার্লামেন্টের কাছে তা পেশ করেন। বর্তমানে কেবল বিল উত্থাপন করেই ক্যাবিনেট ক্ষান্ত থাকে না; পার্লামেন্টে বিলটি অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার দায়িত্বও ক্যাবিনেটকে গ্রহণ করতে হয়।

(৩) **অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন ও ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ঃ** আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হলেও নানা করণে এই সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের হাতে হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রণীত আইনের প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করতে, তাকে বিশদ চেহারা দেওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানা উপধারা প্রণয়ন এই অর্পিত আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্য।

(৪) **পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ** পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা থেকে শুরু করে অধিবেশন স্থগিত রাখা বা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেটই রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা। পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেটই রাজা বা রানির প্রধান পরামর্শদাতা। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কোন্ কোন্ বিল উত্থাপন করা হবে, কোন কোন প্রস্তাবের ওপর কে কে বক্তব্য রাখবেন, সরকার পক্ষের মূল বক্তা কে কে হবেন, বিরোধী পক্ষ বলার জন্য কতক্ষণ সময় পাবে, তার সব কিছুই ক্যাবিনেট কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

(৫) **শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ঃ** ক্যবিনেটের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হল শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন। শাসনবিভাগের ক্ষমতা আইনগতভাবে রানির হাতে ন্যস্ত। তবে বাস্তবে রানি ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী এই ক্ষমতা ভোগ করেন। ক্যাবিনেট প্রশাসনিক কর্তৃত্বের শীর্ষদেশে অবস্থিত। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের দ্বারা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৬) **বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন ঃ** প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার। এই সঙ্গতিসাধনের কাজটি করে ক্যাবিনেট বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালিত না হলে সরকারের সাফল্য ক্ষুন্ন হয়।

(৭) **পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ঃ** বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতি নিধারণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব শাসনবিভাগকেই সম্পাদন করতে হয়। গ্রেট ব্রিটেনে এই দায়িত্ব বহন করে ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকেন। কিন্তু বাস্তবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষমতা এখন ক্যাবিনেটের হাত থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যেমন—আর্জেন্টিনার ফকল্যান্ডে দ্বীপ দখল করার সিদ্ধান্ত এককভাবে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার গ্রহণ করেছিলেন।

(৮) **সংযোগসাধনমূলক কার্যাবলী ঃ** সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল জনসাধারণকে সরকারী নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখা। এই কারণে সরকার তথ্যদপ্তর, বেতার, দূরদর্শন, পুস্তিকা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ, সাংবাদিক সম্মেলন এবং পার্লামেন্ট বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেশ করে। এই তথ্যের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই কারণেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটও জনসংযোগমূলক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

(৯) **বাজেট প্রণয়ন ঃ** অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাব ক্যাবিনেটে পেশ করেন। ক্যাবিনেটে আলোচনার পরই বাজেট চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় বাজেট পেশ করেন। প্রত্যেক মন্ত্রীর দায়িত্ব হল কমন্সসভায় বাজেটকে সমর্থন করা। কমন্সসভায় বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতে হয়। তাই পার্লামেন্ট বাজেট পেশের আগে ক্যাবিনেটের সভায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়।

(১০) **নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** ক্যাবিনেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। যেমন অর্থদপ্তরের সচিব, ক্যাবিনেটের পরিকল্পনা বিষয়ক অফিসার বা রাজপরিবারের কোনও ব্যক্তিকে গভর্নর জেনারেলের পদে নিয়োগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। বিচারপতি রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ইত্যাদি পদে নিয়োগের মূল দায়িত্ব ক্যাবিনেটের। রানির নামে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই নিয়োগ কার্যকর হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে ক্যাবিনেটের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিহত প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর একক ইচ্ছাই ক্যাবিনেটের ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মার্গারেট থ্যাচারের নাম উল্লেখ করা যায়। এই কারণে বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞই গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

০২.৫ সারাংশ

গ্রেট ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক আছেন। তিনি হলেন রাজা বা রানি। তিনি নামে শাসক। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত অছে প্রধানন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের হাতে। ব্রিটেনের এই রাজশক্তি বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজা বা রানির কিছু রাজকীয় বিশেষাধিকার আছে। রাজশক্তির ক্ষমতার আর একটি উৎস হল পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি যে রাজতন্ত্র এখন একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এক হাজার বছরের এই প্রতিষ্ঠানটি এখন অবক্ষয়ের দিকে।

ব্রিটেনে প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত আছে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদের হাতে। মন্ত্রীপরিষদ সব মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রীসভারই একটি অংশ। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়েই ক্যাবিনেট গঠিত হয়। কোন্ দপ্তর এবং কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা পর্যায়ে উন্নীত করা হবে, তা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদীয় সচিবদের নিয়ে মন্ত্রীসভা বা মন্ত্রীপরিষদ গঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। তবে বাস্তবে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন সর্বোচ্চ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। তাই অনেক বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁকে একনায়ক বলা যায় কিনা সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে পদাধিকারী বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে এবং পিছনে শাসকদলের দৃঢ় ও সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা থাকলে ব্রিটিশ প্রধনমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন।

০২.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। আধুনিক অর্থে ব্রিটেন ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব কবে থেকে?

২। কমন্সসভা কিভাবে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে?

৩। সংক্ষেপে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী কী কী?

৪। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব বলতে কী বোঝায়?

৫। ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব বলতে কী বোঝায়?

০২.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার দুটি উৎস হল (ক) রাজকীয় বিশেষাধিকার এবং (খ) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন।

২। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিশেষধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজা বা রানি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবেন; (খ) পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজা বা রানি স্বাক্ষর করতে বাধ্য।

৩। কোন নির্দিষ্ট সময়ে নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে কাজ করার আইনগত ক্ষমতার যে অবশিষ্টাংশ এখনও রাজা বা রানির হাতে আছে তাকেই রাজশক্তির বিশেষাধিকার বলে।

অনুশীলনী—২

১। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন রাজা বা রানি।

২। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজা বা রানি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

৩। উপনিবেশগুলি সম্পর্কে ব্রিটেনের রাজা বা রানি বা রাজশক্তি প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে যেসব আদেশ বা নির্দেশ ঘোষণা করেন, সেগুলিকে স-পরিষদ রাজাজ্ঞা বলে।

৪। রাজা বা রানির একটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা হল তিনি বিচারলয়ে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দন্ড হ্রাস বা মুকুব করতে পারেন তবে এই ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করতে পারেন মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী।

অনুশীলনী—৩

১। নিরঙ্কুশ, সংখ্যাগরিষ্ঠ

২। প্রস্তরখন্ড

৩। যোগসূত্র।

সর্বশেষ অনুশীলনী ঃ

১। আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথায় সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জের সময়। রাজা প্রথম জর্জ যেহেতু ক্যাবিনেট সভায় উপস্থিত থাকতেন না সেহেতু তাঁর সময় থেকেই ক্যাবিনেট গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হতে থাকে এবং প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

২। সাধারণত যে সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সেগুলি হলো—(ক) প্রশ্নজিজ্ঞাসা, (খ) নিন্দাসূচক প্রস্তাব, (গ) মুলতুবি প্রস্তাব, (ঘ) ব্যয়বরাদ্দ হ্রাসের প্রস্তাব, (ঙ) অনাস্থা প্রস্তাব।

৩। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী হল ঃ (ক) নীতি নির্ধারণ, (খ) আইন প্রণয়ন, (গ) পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন, (ঘ) শাসনবিভাগে নিয়ন্ত্রণ, (ঙ) বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয়, (চ) বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি।

৪। ব্রিটেনে মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের—ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা। প্রত্যেক মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের কাজকর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হয় তেমন অন্যদিকে ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

৫। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পার্লামেন্টের ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পয়েছে। ক্যাবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকেই 'ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব' বলে চিহ্নিত করা হয়।

০২.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J. Harvey and L. Bather, MacMillan*—The British Constitution. St. Martin's Press, 1970

২। *Sir Ivor Jennings*—Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959.

৩। ডঃ অনাদি কুমার মহাপাত্র—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮

৪। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ—তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। সুদর্শন ভট্টাচার্য—(প্রশ্নোত্তরে) তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ০৩ ❑ পার্লামেন্ট

গঠন

০৩.১ উদ্দেশ্য

০৩.২ প্রস্তাবনা

০৩.৩ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট-ক্রমবিকাশ

লর্ডসভা

কমন্সসভা

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

০৩.৪ সারাংশ

০৩.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

০৩.৬ উত্তরমালা

০৩.৭ গ্রন্থপঞ্জী

০৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কীভাবে গঠিত হয়েছিল।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ লর্ডসভা ও কমন্সসভার গঠন ও কার্যাবলী।
- নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় বিরোধী দলের ভূমিকা।
- পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও কমিটি ব্যবস্থা।

০৩.২ প্রস্তাবনা

ব্রিটেন পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। এখানে তত্ত্বগতভাবে পার্লমেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটেনে অলিখিত সংবিধান এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রাধান্য সেহেতু পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও ভূমিকাও অনেকটাই

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পার্লামেন্টের একটি অগণতান্ত্রিক উপাদান হল লর্ডসভা। বস্তুত পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়।

এই এককে লর্ডসভা ও কমন্সসভা দুটি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কমন্সসভাই যেহেতু মূল ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু কমন্সসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে তবে সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তত্ত্বগতভাবে কমন্সসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তা ক্যাবিনেটের একনায়কত্বে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব আবার এসে পৌঁছেছে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে।

০৩.৩ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট—ক্রমবিকাশ

পার্লামেন্ট গ্রেট বিটেনের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা। রাজা বা রানি, লর্ডসভা এবং কমন্সসভা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে সাধারণত রাজাসহ-পার্লামেন্ট নামে অভিহিত করা হয়।

বর্তমান পার্লামেন্ট কয়েক শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্য উইলিয়াম নিজের মোনোনীত সামন্ত, নাইট উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং যাজকদের নিয়ে একটি 'মহাপরিষদ' গঠন করেন। এই মহাপরিষদই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিবর্তনে প্রাথমিক স্তর। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে সামন্তশ্রেণি, যাজক এবং নাইট ও বার্জেসগণ পৃথকভাবে মিলিত হতেন। এর ফলে পার্লামেন্ট তিনটি কক্ষে পরিণত হতে আরম্ভ করে। পরে সামন্তশ্রেণি ও যাজকদের একটি কক্ষে এবং নাইট, বার্জেস ও নাগরিকদের আর একটি কক্ষে মিলিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম কক্ষটি লর্ডসভা ও দ্বিতীয় কক্ষ কমন্সসভা নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকেই ব্রিটেন দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সূত্রপাত।

লর্ডসভা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হল লর্ডসভা। শুধুমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই নয়, লর্ডসভা হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনসভাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম দ্বিতীয় কক্ষ। বিশ্বের প্রাচীনতম এই উচ্চকক্ষ ব্রিটেনের অন্যান্য সরকারি সংস্থার মত দীর্ঘদিনের ক্রমবিকাশের ফল। লর্ডসভার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই আর্বিভাবের সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি এই কক্ষ কখনও জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়নি।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভা বর্তমান বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিতীয় কক্ষ। বর্তমানে লর্ডসভা নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

(১) রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত সদস্যগণ।

(২) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত লর্ডগণ।

(৩) স্কটল্যান্ডের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লর্ড উপাধিধারী লর্ডসভার সদস্যগণ।

(৪) আয়ারল্যান্ডের লর্ডগণ (বর্তমানে লর্ডসভায় আয়ারল্যান্ডের লর্ড নেই।)

(৫) দেশের প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের মধ্যে থেকে নয়জন বেতনভুক্ত আপিল লর্ড এই সভার সদস্য।

(৬) লর্ডসভার সদস্যদের মধ্যে ২৬ জন ধর্মীয় লর্ড আছেন।

(৭) শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে নিযুক্ত আজীবন লর্ডগণ লর্ডসভার সদস্য। উল্লেখযোগ্য ব্রিটেন বসবাসকারী ভারতীয় অধ্যাপক মেঘনাদ দেশাই ও প্রখ্যাত শিল্পপতি স্বরাজ পল লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়ে এই সভার সদস্য হয়েছেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদপ্রাপ্ত লর্ডদের পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় ঃ ডিউক (Duke), মার্কোয়েস (Marquess), আর্ল (Earl), ভাইকাউন্ট (Viscount) এবং ব্যারেন (Barons)। অধিকার স্বীকৃত ছিল না। পরে মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের লর্ডসভার অধিবেশনে যোগদানের অধিকার আছে। তবে তার বয়স কমপক্ষে একুশ বছর হতে হবে।

কার্যাবলী

গ্রেট ব্রিটেনের লর্ডসভা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম দ্বিতীয় কক্ষ হলেও বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে লর্ডসভার ক্ষমতা ও গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে লর্ডসভা এখনও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। লর্ডসভার এই সমস্ত কাজকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন—

(১) **আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** লর্ডসভা আইনসভার উচ্চকক্ষ। সেই হিসেবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করাই লর্ডসভার প্রথম কাজ। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৯১১ সালের আগে আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভা যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করলেও পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৯ সালে প্রণীত আইনের ফলে লর্ডসভার ক্ষমতা আরও কমে যায়। বর্তমানে সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা এক বছর বিলম্ব ঘটাতে পারে এবং অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিলটিকে এক মাস আটকে রাখতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—(ক) অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কিত বিলগুলি লর্ডসভায় উত্থাপিত ও আলোচিত হওয়ার পর তা কমন্সসভায় যায়। (খ) লর্ডসভা আইনের সংশোধনী কাজের দায়িত্ব পালন করে। (গ) অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা যে ভূমিকা পালন করে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। (ঘ) কমন্সসভার তুলনায় লর্ডসভার আলোচ্যসূচীর পরিমাণ সীমিত থাকায় লর্ডসভার পক্ষে অনেক বেশি সময় নিয়ে কোনও বিষয় আলোচনা করা সম্ভব।

(২) **শাসন সংক্রান্ত কাজ ঃ** লর্ডসভার মত একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও কিছু শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন বিভিন্ন বিলের ওপর আলোচনা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারি নীতির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে লর্ডসভা শাসনবিভাগকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। বিচারপতিদের পদচ্যুত করার ব্যাপারেও লর্ডসভা

গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। তবে একথা ঠিক যে বর্তমানে সরকারের ওপর লর্ডসভার কোনও ক্ষমতা নেই, কেননা শাসনবিভাগ তার কাজের জন্য লর্ডসভার কাছে নয়, কমন্সসভার কাছেই দায়িত্বশীল থাকে।

(৩) **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** লর্ডসভার বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কক্ষ হল ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। বিশ্বের অন্য কোনও দেশের উচ্চ কক্ষকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও লর্ডসভার আরও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। লর্ডসভা কোনও ব্যক্তির গুরুতর অপরাধের বিচার করতে পারে যদি কমন্সসভা এই মর্মে কোনও অভিযোগ করে। আবার লর্ডসভা লর্ড উপাধিসংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করে। বিচারপতিদের অপসারণ করার ব্যপারেও লর্ডসভা কমন্সসভার সঙ্গে সমান ক্ষমতাভোগ করে।

(৪) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ** ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হিসেবে লর্ডসভা আরও কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন ঃ

(ক) কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ডসভা কমন্সসভাকে সাহায্য করতে পারে।

(খ) লর্ডসভার অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও জ্ঞানীগুনী ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যের দ্বারা সুচিন্তিত জনমত গঠনে সাহায্য করেন।

লর্ডসভার উপযোগিতা

লর্ডসভার ভূমিকা ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞরা এই কক্ষটির উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। কেউ কেউ লর্ডসভার পক্ষে যুক্তি দেন, আবার কেউ কেউ লর্ডসভার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

লর্ডসভার পক্ষে যুক্তি ঃ

(১) জনগণের কাছে রাজনৈতিক অর্থে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না বলে লর্ডসভা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

(২) কমন্সসভা অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলে লর্ডসভা তার দোষত্রুটি সংশোধন করতে পারে।

(৩) লর্ডসভা প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রণীত ও ঘোষিত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ও নির্দেশসমূহ (Statutory Rules and Orders) পর্যলোচনা করে। এর ফলে কমন্সসভার দায়িত্বের বোঝা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়।

(৪) সাধারণভাবে বেশির ভাগ বেসরকারি বিল লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়। লর্ডসভার বিভিন্ন কমিটি এই। সব বিল বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করে। লর্ডসভার অস্তিত্ব না থাকলে এইসব দায়িত্ব কমন্সসভাকেই গ্রহণ করতে হত।

(৫) লর্ডসভার একটা প্রশাসনিক ভূমিকাও আছে। মন্ত্রীসভার সদস্যরা কেবলমাত্র কমন্সসভা থেকেই নিযুক্ত হন না, লর্ডসভা থেকেও বিভিন্ন স্তরে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

(৬) লর্ডসভার অনেক সদস্য অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতার ফলে সরকারি নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে সরকার নিজ নীতি ও সিদ্ধান্তের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারে।

(৭) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা লর্ডসভার অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ।

(৮) গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হল লর্ডসভা। এক্ষেত্রেও লর্ডসভা তার নিজের উপযোগিতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লর্ডসভার বিপক্ষেও অনেক যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

লর্ডসভার বিপক্ষে যুক্তি ঃ

(১) প্রথমত বলা হয় লর্ডসভার গঠন অগণতান্ত্রিক। লর্ডসভা মূলত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি কক্ষ। গণতন্ত্রের সঙ্গে উত্তরাধিকারের নীতির কোনও সামঞ্জস্য নেই। লর্ডসভার সদস্যদের পারদর্শিতা কোনওভাবেই প্রতিনিধিত্বের সমার্থক নয়।

(২) লর্ডসভা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। সেই কারণে কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত যে কোনও প্রগতিশীল পদক্ষেপে লর্ডসভা বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

(৩) লর্ডসভার সদস্যদের ব্যাপক সংখ্যায় অনুপস্থিতি ও ঔদাসীন্য এই কক্ষকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

(৪) লর্ডসভা যেহেতু বিত্তশালীদের দুর্গ সেহেতু এই কক্ষ এমন সমস্ত কাজ করে যা জতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৫) কমন্সসভার আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণীত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে লর্ডসভারও তেমন দরকার নেই।

(৬) আপীল আদালত হিসেবেও লর্ডসভার অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। কারণ সংস্কার আইনের মাধ্যমে নতুন আদালত গঠন করে সেই আদালতের হাতে সর্বোচ্চ আপীল আদালতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়।

লর্ডসভার সংস্কার

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে লর্ডসভার কোনও গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং যদি থাকে তাহলে এর সংস্কার দরকার কি না এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক দীর্ঘকালের। বামপন্থী দলগুলি এই সভার বিলোপের পক্ষপাতী। মধ্যপন্থীরা সংস্কারের দ্বারা একে কার্যকরী দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে সংগঠিত করতে আগ্রহী। রক্ষণশীল দল একে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী।

বাস্তব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই লর্ডসভার সংস্কারসাধনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উঠতে থাকে। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৮৬৯ সালে লর্ড রাসেল-এর প্রস্তাব, ১৮৭৪ সালে লর্ড রোস্‌বেরির প্রস্তাব এবং ১৮৮৮ সালে লর্ড সলবেরির প্রস্তাব। কিন্তু এইসব প্রস্তাবের কোনওটাই গৃহীত হয় নি। এই সব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যাত হয়।

এরপর ১৯০৭ সালে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯০৭ সালের আগে লর্ডসভার সংস্কারসাধনের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এই কমিটি লর্ডসভার গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করে এইসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই লর্ডসভা ও কমন্সসভার মধ্যে তীব্র বিরোধ শুরু হয়। এর ফলে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব চাপা পড়ে যায়।

১৯০৯ সালে লর্ডসভার সংস্কারের বিষয়ে ল্যান্সডাউন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯১৭ সালে লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এই ব্রাইস কমিটি একই সঙ্গে নির্বাচন ও মনোনয়নের ভিত্তিতে লর্ডসভা গঠনের সুপারিশ করে। এই কমিটি লর্ডসভার সদস্যদের কার্যকাল ১২ বছর ধার্য করে। প্রতি ৪ বছর অন্তর এর এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণের সুপারিশ করে এবং লর্ডসভার কাজকে কমন্সসভার প্রেরিত বিল পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেও এই কমিটির সুপারিশ রক্ষণশীল বা উদারনৈতিক কোনও দল কর্তৃকই সমর্থিত হয়নি।

এরপর ১৯২২ সালে লয়েড জর্জ 'ব্রাইস কমিটির' সুপারিশের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও সরকারে পতনের ফলে এই প্রস্তাব রূপ পায়নি। একইভাবে ১৯২৫ সালে লর্ড ব্রিকেন্‌হেড-এর প্রস্তাব, ১৯২৮ সালে লর্ড ক্লারেন্‌ডন-এর প্রস্তাব, ১৯৩২ সালে রক্ষণশীল দল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব, ১৯৩৩ সালে লর্ড সলস্‌বেরি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব, ১৯৩৪ সালে শ্রমিক দল কর্তৃক লর্ডসভার বিলুপ্তির প্রস্তাব প্রস্তাবই থেকে গেছে। মতৈক্যের অভাবে এইসব প্রস্তাবের কোনওটাই কার্যকর হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক দল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর প্রধানমন্ত্রী এট্‌লি নিযুক্ত হন, প্রধানমন্ত্রী এটলির সভাপতিত্বে এইসময় একটি সর্বদলীয় সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে লর্ডসভার সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে লর্ডসভার পুনর্গঠন ও ক্ষমতা হ্রাসের কথা ঘোষণা করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে সরকার পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করে। কিন্তু কমন্সসভায় শ্রমিক দলের বামপন্থী গোষ্ঠী ও রক্ষণশীল দলের দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতার জন্য এই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। ১৯৬৯ সালে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে লর্ডসভা তুলে দেওয়ার যে দাবি জানানো হয়েছিল, ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের আধিপত্যের ফলে সেই সময় সেই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য শ্রমিক দল তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং লর্ডসভার বিলুপ্তির পরিবর্তে সংস্কারসাধনের কর্মসূচী এই দলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়।

১৯৮২ সাল নাগাদ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে লর্ডসভার সংস্কারের একটি কর্মসূচী উত্থাপন করা হয়। ১৯৯১ সালে ইনস্টিটিউট অব্ পাবলিক পলিসি রিসার্চ এর তরফ থেকে নির্বাচিত দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়। ওই একই সালে ইনিবেন যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়।

এখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে লর্ডসভার সংস্কারের এইসব প্রস্তাব কার্যকর না হওয়ার কারণ কী? এর মূল কারণ হল ঃ

(১) গ্রেট ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের আধিপত্য লর্ডসভার গঠন ও ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(২) যাঁরা লর্ডসভার সংস্কারের পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে ঐক্যমত্যের অভাব ও দ্বিতীয় কক্ষ বা অগণতান্ত্রিক কক্ষ হিসেবে লর্ডসভার স্থায়িত্ব একটি অন্যতম কারণ।

(৩) লর্ডসভার বিলুপ্তির পর কিভাবে এই দ্বিতীয় কক্ষের গঠন ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করা হবে সে সম্পর্কে মতৈক্যের অভাবও লর্ডসভার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

অনুশীলনী —১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) লর্ডসভা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিতীয় কক্ষ।

(খ) লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত।

(গ) লর্ডসভার গঠন গণতান্ত্রিক।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ (৩/৪টি বাক্যে উত্তর লিখুন)

(ক) ব্রিটেনের লর্ডসভা কী কী ক্ষমতা ভোগ করে?

(খ) ব্রিটেনের লর্ডসভার বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি দিন।

(গ) লর্ডসভার অস্তিত্বের সপক্ষে তিনটি যুক্তি দিন।

(ঘ) অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার ক্ষমতা কিরূপ?

(ঙ) ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত কোন্‌টি?

কমন্সসভা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম কমন্সসভা। এই কমন্সসভা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কক্ষ। গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমন্সসভার উদ্ভব ও বিকাশ খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাজার ক্ষমতার খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাজার ক্ষমতার পরিবর্তে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। ব্রিটেনের ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ সালে সংস্কার আইনগুলির (Reform Act) ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গৃহীত হয়। আগে সম্পত্তিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে কমন্সসভার সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৫৮ সালে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার স্বীকৃত ১৯১৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের মাধ্যমে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২৮ সালে। ব্রিটেন একাধিক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা বাতিল হয় ১৯৪৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের মাধ্যমে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৯৬৯ সালের সংশোধন অনুসারে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রেই সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি প্রযোজ্য।

কমন্সসভার গঠন

কমন্সসভা হল জনপ্রতিনিধি সভা। ১৯৬৯ সালের সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে এখন ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজা কমন্সসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। ব্রিটেনে বসবাসকারী কমনওয়েলথ ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের নাগরিকগণ প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিদেশি, উন্মাদ, দেউলিয়া এবং চুরি ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নেই। প্রত্যেক ভোটদাতা একটি ভোট দিতে পারেন।

কমন্সসভার সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৩৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৫০ করা হয়েছে, এই পরিবর্তন ১৯৮৩ সালের নির্বাচন থেকে কার্যকর হয়েছে। কমন্সসভার সদস্যপদ প্রার্থী'কে (১) অন্তত ২১ বছর বয়স্ক হতে হবে; (২) জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সিদ্ধ ব্রিটিশ প্রজা হতে হবে; (৩) যে কোনও ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সাধারণ আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। ১৯৫৭ সালের কমন্সসভা অযোগ্যতা আইন অনুসারে উন্মাদ, দেউলিয়া, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের ফলে দন্ডিত ব্যক্তি, ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের চার্চের যাজক, রোমান ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিত, সরকারি কর্মচারী, সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের পিয়ারগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। ১৯৬৩ সালের পিয়ারেজ আইন অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ডসভার সদস্য কোনও ব্যক্তি লর্ড উপাধি পরিত্যাগ করে কমন্সসভার সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ১৭০৫ সালের রাজকর্মচারী আইন অনুসারে অধীনে অর্থকরী পদে নিযুক্ত ব্যক্তি কমন্সসভার সদস্য হতে পারেন না বা থাকতে পারেন না।

কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা অনুসারে সমগ্র দেশকে ভৌগোলিক নির্বাচনী এলাকার বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচন এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

১৯১১ সালে পার্লামেন্ট আইন প্রণীত হওযার পর থেকে কমন্সসভার স্বাভাবিক কার্যকাল হল পাঁচ বছর। তবে যুদ্ধ বা কোনও জরুরি অবস্থায় এই কার্যকাল বৃদ্ধি করা যায়। আবার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কমন্সসভাকে ভেঙে দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানিকে পরামর্শ দিতে পারেন। দলে ভাঙন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসের দরুণ সরকারের স্থিতিশীলতায় আশঙ্কিত হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভেঙে দিয়ে জনমত যাচাই-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। ১৯৭৯ সালে শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী জেমস কালাঘান এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে বর্তমানে কমন্সসভার অধিবেশন বছরে অন্তত একবার ডাকতেই হয়। তবে জরুরি অবস্থায় বা কোনও বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাজা বা রানি।

কমন্সসভার সদস্যদের নানা ধরনের আর্থিক সুযোগ সুবিধাদানের ব্যবস্থা আছে। ১৯৭২ সালের মন্ত্রী ও অন্যান্য পদাধিকারীদের বেতন সম্পর্কিত আইন অনুসারে কমন্সসভার সদস্যদের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হয়। সভার প্রত্যেক সদস্য করযোগ্য বাৎসরিক বেতন হিসেবে ৪৫০০ পাউন্ড পান। এছাড়াও প্রত্যেক সদস্য বছরে করমুক্ত ১০৫০ পাউন্ড যাতায়াত, টেলিফোন, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান জনিত ভাতা এবং অবসরকালীন ভাতার সুবিধা ভোগ করেন।

কমন্সসভায় একজন সভাপতি থাকেন। তাঁকে স্পিকার বলা হয়। স্পিকার বলা হয়। স্পিকার বাদে কমন্সসভার অন্যান্য কর্মচারীরা হলেন একজন ক্লার্ক ও তাঁর দু'জন সহকারী, সার্জেন্ট-অ্যার্ট-আর্মস ও তাঁর সহকারীগণ, চ্যাপলেন, স্পিকারের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা এবং লয়েজ এন্ড মিনস্ কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি। স্পিকার চ্যাপলেনকে নিযুক্ত করেন। সভার শুরুতে চ্যাপলেন বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করেন। কমন্সসভার সদস্যরাই কমিটিগুলির সভাপতি ও সহ-সভপতিদের নির্বাচিত করেন। সভাপতিরা কমিটির কাজকর্ম পরিচালনা করেন। ক্লার্ক এবং সাজেন্ট-অ্যাট-আর্মস ও তাঁদের সহকারীরা রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানি এই নিয়োগকার্য সম্পাদন করেন। সার্জেন্ট-অ্যাট-আমর্স-এর দায়িত্ব হল সভায় শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণের ব্যাপারে স্পিকারকে সাহায্য করা। ক্লার্ক ও তাঁর দু'জন সহকারী কমন্সসভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন।

কমন্সসভার কার্যাবলী

কমন্সসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে মোটামুটি নয় ভাগে করা যায় ঃ

(১) **আইন প্রণয়ন ঃ** আইন প্রণয়নই হল কমন্সসভার প্রধান কাজ। কমন্সসভা ব্রিটেন ও তার উপনিবেশগুলির জন্য দরকারি যে কোনও আইন রচনা করতে পারে। তাছাড়া প্রচলিত যে কোনও আইনকে পরিবর্তন বা বাতিল

করতে পারে। আইনত ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হল একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এখানে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়। বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ সব বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। কেবল অবিতর্কিত বিলগুলিই লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়। কমন্সসভা হ'ল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। তাই গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। অর্থবিল প্রথম কমন্সসভায় পেশ করতে হয়। তা ছাড়া কমন্সসভায় বেসরকারি বিল নিয়েও আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইনের পর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভায় তুলনায় কমন্সসভা অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। লর্ডসভা কমন্সসভা কর্তৃক প্রণীত সাধারণ বিলকে এক বছরের মত বাধা দিতে পারে মাত্র। তারপর লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই রাজা বা রানির স্বাক্ষর সমেত বিলটি আইনে পরিণত হয়।

কিন্তু বাস্তবে ব্রিটেনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মূল কর্তৃত্ব কমন্সসভা থেকে ক্যাবিনেটের হাতে চলে এসেছে।

(২) সরকারি আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ কমন্সসভার আর একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হল সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষে রানির পূর্বানুমতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় পরবর্তী আর্থিক বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসেবে সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাব বাজেট প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই বাজেটের মাধ্যমেই সরকারের আর্থিক নীতি প্রতিফলিত হয়। কমন্সসভার অনুমতি ছাড়া সরকার কোনও কর ধার্য, করের হার পরিবর্তন, করবিলোপ এবং বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেনের সঞ্চিত তহবিল থেকে কোনও অর্থ ব্যয়ের প্রযোজন হলেও সরকারকে কমন্সসভায় অনুমতি নিতে হয়। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee), বর্তমানে যার নাম ব্যয়কমিটি (The Expenditure Committee), সরকারি হিসাব কমিটি (Public Accounts Committee), নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General)-এর প্রতিবেদন আলোচনার মাধ্যমেও কমন্সসভা সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বাজেট লর্ডসভা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কেবল একমাস বিলম্বিত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থসংক্রান্ত বিষয়েও ক্যাবিটেনের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা বর্তমান, কমন্সসভার ভূমিকা আনুষ্ঠানিক মাত্র।

(৩) সরকার গঠন ঃ প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর কমন্সসভার প্রাথমিক কর্তব্য হল সরকার গঠনে সাহায্য করা। কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানি প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রচলিত সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভার সদস্য হবেন। লর্ডসভায় কোনও দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর মন্ত্রীসভার গঠন নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা গঠনের ক্ষেত্রে কমন্সসভার ভূমিকাই প্রধান।

(৪) সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ঃ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় মৌলিক নীতি অনুসারে ব্রিটেনের মন্ত্রীসভা কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল। মন্ত্রীগণ তাঁদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকেন।

কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যতদিন মন্ত্রীসভাকে সমর্থন করেন মন্ত্রীসভা ততদিন ক্ষমতাসীন থাকেন। কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া কমন্সসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান এবং মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, ছাঁটাই প্রস্তাব, দৃষ্টি আর্কষণী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণী করতে পারে।

অনেকের মতে বর্তমানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কার্যত ক্যাবিনেটই কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সাম্প্রতিককালে সরকার ও কমন্সসভার মধ্যে ক্ষমতার নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কমন্সসভার সদস্যরা কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

(৫) অর্থবিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ অর্থবিল প্রথমে কমন্সসভায় উত্থাপিত হয়। রানির পূর্বসম্মতি নিয়ে সাধারণতঃ অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় অর্থবিল উত্থাপন করেন। কমন্সসভা কর্তৃক অর্থবিল গৃহীত হবার পর ওই বিল লর্ডসভার অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। লর্ডসভা কোনও অর্থবিল প্রত্যাখান করতে পারে না। কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বিল অনুমোদন করতে পারে বা কোনও সংশোধন সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু ওই সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা কমন্সসভার বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। কমন্সসভা কর্তৃক প্রেরিত বিল লর্ডসভা এক মাসের জন্য বিলম্বিত করতে পারে। তাছাড়া কোনও বিল অর্থবিল কি না এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ দেখা দিলে কমন্সসভার স্পিকারের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কোনও অর্থবিল যখন রানির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় তখন কমন্সসভার স্পিকারকে সার্টিফিকেট দিতে হয় যে, ওই বিল অর্থবিল।

(৬) সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা ঃ কমন্সসভা আইন এবং সংবিধান সংশোধনেও অংশগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে লর্ডসভা এবং কমন্সসভার ক্ষমতা সমান। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান অত্যন্ত নমনীয়। এখানে সাধরাণ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন এবং সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সুতরাং যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন প্রণীত ও সংশোধিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমন্সসভা সাংবিধানিক আইন সংশোধন এবং সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সুতরাং যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন প্রণীত ও সংশোধিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমন্সসভা সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে পারে। কমন্সসভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে যেভাবে কোনও সাধারণ বিল অনুমোদিত হয়, সেই একইভাবে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়।

(৭) জনমত গঠন ঃ জনমত গঠনের ব্যাপারে কমন্সসভার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কমন্সসভা সরকারি নীতি ও মন্ত্রীসভার কাজকর্মের ওপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সভা জনগণকে সরকারের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত রাখে এবং সতর্ক করে দেয়। কমন্সসভার বিতর্কের মাধ্যমে জনগণ শাসন ব্যাপারে সরকারি ও সরকার বিরোধী মতামত ও যুক্তিতর্ক জানতে পারে এবং জনমত গঠিত হয়।

(৮) **সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ ঃ** কমন্সসভায় আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়গুলির তথ্য সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগনের কাছে পৌঁছায়। তার ফলে জনসাধারণ সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ ও তথ্য জানবার সুযোগ পায়।

(৯) **জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ ঃ** কমন্সসভার সদস্যরা নির্বাচকমন্ডলীর মনোভাব কমন্সসভায় ও সরকারের কাছে পেশ করেন। আবার অন্যদিকে সরকারের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পেশ করেন। কমন্সসভার সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ রক্ষা করেন। এইভাবে কমন্সসভার সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ রক্ষা করেন। এইভাবে কমন্সসভা সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভা পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রভাবশালী বিতর্কমঞ্চ এবং একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা সভা। কমন্সসভা সরকারের বিভিন্ন আমলাদের কাজকর্মের সমালোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে। বস্তুত ব্রিটিশ কমন্সসভা ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। তবে বর্তমানে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে কমন্সসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

অনুশীলনী—২

শূনস্থান পূরণ করুন ঃ

১। ব্রিটিশ কমন্সসভার কার্যকালের মেয়াদ_____বছর।

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের_____কক্ষে অর্থবিল প্রথম উত্থাপিত হয়।

৩। কোনও বিল অর্থবিল কি না সে সম্পর্কে _____এর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত।

৪। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির বর্তমান নাম_____কমিটি।

স্পিকার (অধ্যক্ষ)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভার সভাপতিকে স্পিকার বলা হয়। কমন্সসভার সভাপতি হিসেবে স্পিকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্পিকারের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পদমর্যাদার বিন্যাস করা হয়েছে। পূর্বে কমন্সসভার স্পিকার রাজা বা রানি কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং রাজা বা রানির ইচ্ছায় কমন্সসভার কার্য পরিচালনা করতেন। এছাড়াও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারেও স্পীকারের কোনওরকম বাধা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেকদিন পর্যন্ত স্পিকারকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু পরবর্তী সময় থেকেই স্পিকারের পদটির সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি নিরপেক্ষতা বিষয়টি যুক্ত হয়েছে।

কমন্সসভার নির্বাচনের পর কমন্সসভার প্রথম অধিবেশনে সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে সভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজনকে স্পিকার বা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেন। অতীতে কয়েকবার স্পীকারের পদে নির্বাচন হলেও বর্তমানে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই স্পিকার নির্বাচন করা হয়। এছাড়াও প্রাক্তন স্পিকার পুনরায় স্পিকার পদে নির্বাচিত হতে চাইলে তাঁকে কেন্দ্রে অন্য কোনও প্রার্থী দেওয়া হয় না। কমন্সসভার নির্বাচনে যে কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেই কেন্দ্রে অন্য কোনও প্রার্থী দেওয়া হয় না। কমন্সসভার কার্যকাল ৫ বছর হওয়ার জন্য স্পিকারও ৫ বছর তাঁর পদে বহাল থাকেন। অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন, আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

স্পিকার হলেন কমন্সসভার সভাপতি। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে স্পিকারকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলীর উৎসসমূহ হল সভার স্থায়ী নিয়মাবলী, প্রচলিত প্রথা এবং কতকগুলি লিখিত আইন।

স্পিকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হল নিম্নরূপ ঃ

(১) কমন্সসভার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ঃ স্পিকারের অন্যতম প্রধান কাজ হল কমন্সসভার আলোচনা ও বিতর্ক চলাকালীন কোন সদস্য অশালীন মন্তব্য করলে বা আপত্তিকর আলোচনা করলে স্পীকার সেই সদস্যকে কমন্সসভা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি কমন্সসভার অধিবেশন সাময়িকভাবে মূলতুবি রাখতে পারেন।

(২) কমন্সসভার কাজ পরিচালনা করা ঃ কমন্সসভার কার্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব স্পিকারের ওপর ন্যস্ত থাকে। কোনও বিষয়ের আলোচনায় বা বিতর্কে কোন্ কোন্ সদস্য অংশগ্রহণ করবেন, কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে, কোনও সংশোধনী প্রস্তাব বৈধ কি না প্রভৃতি বিষয়ে স্পিকারকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে তিনি নিজে বিতর্কে বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। তিনি কোনও প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন না। তবে যদি কোনও প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(৩) অর্থবিল সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ ঃ ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইনে অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া হলেও কোনও বিল অর্থবিল কিনা সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিলে স্পিকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(৪) কমন্সসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষা ঃ কমন্সসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে স্পিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই অধিকার যাতে সদস্যরা ভোগ করতে পারেন সেই ব্যাপারে স্পিকারের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এবং অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ নির্দিষ্ট কমিটির মাধ্যমে বিবেচনার সুযোগ দিতে হয়।

(৫) কমন্সসভা ও রাজশক্তির মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা ঃ স্পিকার কমন্সসভার সঙ্গে রাজশক্তির যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যমে হিসেবে কাজ করেন। কমন্সসভার কোনও বক্তব্য রাজা বা রানির কাছে পেশ করার থাকলে, আবার রাজা বা রানির কোনও বক্তব্য কমন্সসভার কাছে উপস্থিত করার থাকলে তা স্পিকারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(৬) **কমন্সসভার নিয়মবিধি ব্যাখ্যা করা ঃ** কমন্সসভায় কোনও বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠলে বা কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মকানুন নিয়ে প্রশ্ন উঠলে স্পিকারই এই ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্পিকারের নির্দেশের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের নেই।

(৭) **বিভাগীয় মন্ত্রীদের সমালোচনা করা ঃ** সদস্যরা কোনও মন্ত্রীর কাছে বিভাগীয় তথ্য ও বক্তব্য দাবি করতে পারেন। সেক্ষত্রে স্পিকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সদস্যদের দাবি অনুসারে তথ্য ও বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য করতে পারেন। আবাব মন্ত্রীদের কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট হলে তিনি কোনও মন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সমালোচনা করতে পারেন।

(৮) **অন্যান্য কাজ ঃ** স্পিকার আরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। যেমন—

(ক) কোন্ প্রস্তাব কোন্ কমিটির কাছে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে তা স্পিকার ঠিক করেন।

(খ) কমন্সসভার অধিকার ভঙ্গের জন্য স্পিকার কোনও বহিরাগতকে শাস্তি দিতে পারেন।

(গ) পার্লামেন্টের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্পিকার কমন্সসভার প্রতিনিধিত্ব করেন।

(ঘ) বিরোধী নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে স্পিকার তার মীমাংসা করেন।

(ঙ) সরকারি দলের হাত থেকে বিরোধীদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পিকারের।

পরিশেষে বলা যায় যে স্পিকার পদটি ব্রিটেনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাইসির মতানুসারে স্পিকারের পদটিই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সঠিক স্বরূপ যথাযথভাবে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই স্পিকারের পদটিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তবে চুড়ান্ত বিচারে পদাধিকারীর যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর ওপর স্পিকার পদের মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

অনুশীলনী—৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। _____ _____ স্পিকারের পদটিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২। স্পিকার হলেন কমন্সসভার _____।

লর্ডসভা ও কমন্সসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক

গ্রেট ব্রিটেনের আইনসভা বলতে রাজা বা রানিসহ পার্লমেন্টকে বোঝায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। এর উচ্চকক্ষের নাম লর্ডসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম কমন্সসভা। গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা

করে উভয়কক্ষের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করেছে। একদিকে যেমন লর্ডসভার ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস করা হয়েছে, অন্যদিকে কমন্সসভার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। উভয় কক্ষের গঠন ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করলেই জনপ্রতিনিধিমূলক কক্ষ হিসাবে কমন্সসভার ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির কারণ অনুধাবন করা যাবে।

(১) **গঠনগত পার্থক্য ঃ** কমন্সসভার সদস্যগণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত। ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিক সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। ২১ বছর বয়স্ক নাগরিক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। কমন্সসভা হল তত্ত্বগতভাবে সমাজের ব্যাপক অংশের প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। অন্যদিকে লর্ডসভা প্রধানত উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ধর্মীয় লর্ড এবং ১৯৫৮ সালের পিয়ার আইন অনুযায়ী আজীবন লর্ডসভার সদস্যপদে মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে লর্ডসভা গঠিত। সুতরাং লর্ডসভার গঠনব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপোষক।

(২) **কার্যকালগত পার্থক্য ঃ** লর্ডসভা হল একটি স্থায়ী কক্ষ। এই কক্ষের সদস্যরা আজীবন লর্ডসভার সদস্য থাকতে পারেন। জনসাধারণের কাছে এঁদের কোনও দায়দায়িত্ব নেই। অন্যদিকে কমন্সসভার মেয়াদ পাঁচ বছর। আবার এই পাঁচ বছরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানি কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারে এবং নতুন সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া নির্বচকমন্ডলীর কাছে কমন্সসভার সদস্যদের দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইন প্রণীত হওয়ার পর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভার ক্ষমতা অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছে। বর্তমানে লর্ডসভা সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে এক বছর এবং অর্থবিলের ক্ষেত্রে ১ মাস বিলম্ব ঘটাতে পারে। ফলে এখন ব্রিটিশ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা কমন্সসভাই ভোগ করে।

(৬) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রেট ব্রিটেনে রয়েছে তা মূলত কমন্সসভাই ভোগ করে। সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

(৭) অভিযোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য ঃ অভিযোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রেও গ্রেট ব্রিটেনের দুই কক্ষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত কমন্সসভা যেভাবে শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে জনগণের কোনও অভিযোগের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে, লর্ডসভার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

(৮) বিতর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ গ্রেট ব্রিটেনের কমন্সসভাই হল সংসদের তর্কবিতর্ক ও আলোচনার প্রধান কেন্দ্র। রাজা বা রানির প্রেরিত বাণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক কমন্সসভাতেই অনুষ্ঠিত। অন্যদিকে লর্ডসভায় যেসব বিষয়ে নিয়ে আলোচনা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ হিসেবে কমন্সসভায় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচিত হয় এবং অনেক তথ্য ও সংবাদ প্রকাশিত হয়।

আবার বিরোধী দলও তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সরকারের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু লর্ডসভার ভূমিকা এ ব্যাপারে খুবই সীমাবদ্ধ।

(১০) **বিরোধী দলের ভূমিকার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থায় অন্যতম ভিত্তি হল বিরোধী দলের অস্তিত্ব। বিরোধী দল ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র অচল। তবে গ্রেট ব্রিটেনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব ও উদ্যোগ কমন্সসভার ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়। লর্ডসভার ক্ষেত্রে নয়।

(১১) **বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও উভয় কক্ষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই একটি ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভার থেকে অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। লর্ডসভা গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

অতএব সামগ্রিক বিচারে কমন্সসভা লর্ডসভা অপেক্ষা অনেক বেশি ক্ষমতার অধিকারী হলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে। একটি মাত্র ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভার থেকে বেশি ক্ষমতা ভোগ করে তা হল বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্র। পরিশেষে বলা যায় যে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনে সামন্ত্রতান্ত্রিক রক্ষণশীলতা ও কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ লর্ডসভার ক্ষমতা কমলেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমন্সসভার ক্ষমতা বেড়েছে।

অনুশীলনী—৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) কমন্সসভা একটি স্থায়ী কক্ষ।

(খ) ব্রিটেনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব কমন্সসভার ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

(গ) লর্ডসভার কোনও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা নেই।

(ঘ) আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কমন্সসভাই শক্তিশালী।

(ঙ) সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা এক বছর বিলম্ব ঘটাতে পারে।

রাজা বা রানির বিরোধী দল

গ্রেট ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে যে দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে। এই সরকারকে বলা হয় 'রাজা বা রানির সরকার' (His or Her Majesty's Government)। আর আসন সংখ্যার ভিত্তিতে যে দল সরকারি দলের পরেই দ্বিতীয় স্থান লাভ করে তাকে বিরোধী দল বলা হয়। এই বিরোধী দলকে বলা হয় 'রাজা বা রানির বিরোধী দল' (His or Her Majesty's Opposition)। বিরোধী দলের এই নামকরণের মাধ্যমে তার অসীম গুরুত্বের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ১৯৩৭ সালে 'রাজমন্ত্রী আইন' (Ministers of the Crown Act, 1937)-এ প্রধানমন্ত্রীর বেতনের কথা যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি বিরোধী দলের নেতাকেও বেতন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

বর্তমানে বিরোধী দল দায়িত্বশীল, গঠনমূলক এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ। অধ্যাপক জেনিংস-এর মতানুসারে সমালোচনা করা যদি পার্লামেন্টের মূল কাজ হয়, তা হলে বিরোধী দল পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কার্যাবলীকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বিরোধী দল অপরিহার্য।

শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কমন্সসভায় স্পিকার বিরোধী দলের সদস্যদের আসন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেন। স্পিকারের ডানদিকে বসেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এবং বাঁদিকে বসেন বিরোধী দলের সদস্যরা। ডানদিকে একেবারে প্রথম সারিতে থাকেন শাসক দলের মন্ত্রীরা অর্থাৎ 'রাজা বা রানির সরকার', বাঁদিকে একেবারে প্রথম সারিতে থাকেন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ 'রাজা বা রানির বিকল্প সরকার যা এর আগের অধ্যায়ে 'ছায়া মন্ত্রীপরিষদ' নামে উল্লিখিত হয়েছে।

বিরোধী দলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ব্রিটেনে বিরোধী দলের কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) সরকারের সমালোচনা করাই বিরোধী দলের প্রধান কাজ। এই সমালোচনা থেকে জনগণ সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সবদিক থেকে অবহিত হতে পারে। বিরোধী দলের সমালোচনার জন্য সরকার দায়িত্বশীল থাকতে বাধ্য হয়। স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

(২) পার্লামেন্টের কাজকর্মে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করে। পার্লামেন্টের কার্যসূচী বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে আলোচনাক্রমে ঠিক করা হয়। বিরোধী দলের সদস্যগণ সভায় আইন পাশ, বাজেট পাশ, আলোচনা ও বির্তক প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়ে বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

(৩) সরকারি নীতি, কার্যকলাপ প্রভিতির সমালোচনা করে বিরোধী দল সব সময় নিজের পক্ষে জনমতকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। তবে বিরোধী দলের সমালোচনা আনুগত্যপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক হওয়া চাই।

(৪) গ্রেট ব্রিটেনে বিরোধী দল কেবল সরকারের সমালোচনাই করে না, পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে। গ্রেট ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য বিদ্যমান। উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিরোধিতা এবং সমালোচনামূলক সহযোগিতা বিরোধী দলের নীতিতে পরিণত হয়েছে। বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করেন। বিরোধী দলের সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসাবে বিরোধী দলের কোনও প্রভাবশালী সদস্যকে কমন্সসভার সরকারি হিসাব পরীক্ষা কমিটির (Public Accounts Committee) সভাপতি করা হয়। তাছাড়া বিরোধীদলের গঠনমূলক প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে জাতীয় গুরুত্ব সম্বলিত প্রশ্ন যৌথ সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবেশ গড়ে ওঠে। যেমন, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ব্রিটেনের অবস্থান।

(৫) ব্রিটেনে বিরোধী দলকে রানির বিকল্প সরকার বলা হয়। গুরুত্বের দিক থেকে তাই সরকারের পরেই বিরোধী দলের স্থান। বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হলে কে কোন দপ্তরের দায়িত্ব লাভ করবে তা স্থির করে ছায়ামন্ত্রীদের নিয়ে 'ছায়া মন্ত্রীসভা' গঠন করা হয়। তাই বার্কারের মতানুসারে ইংল্যান্ডের শাসনব্যবস্থায়, বিরোধী দল হল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(৬) ব্রিটিশ জনগণের কাছে বিরোধী দল স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বিরোধী দলের ওপর কোনও রকম নিয়ন্ত্রণকে জনগণ তাদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। সরকার জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিরোধী কোনও কাজ করলে বা করতে প্রয়াসী হলে বিরোধী দল তার তীব্র সমালোচনা করে এবং সেই সঙ্গে জনগণকে সজাগ করে দেয়। এই কারণে অনেকে বিরোধী দলকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রতীক ও অভিভাবক হিসেবে অভিহিত করেন।

অনুশীলনী—৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। স্পিকারের ———— দিকে বসেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এবং ———— দিকে বসেন বিরোধী দলের সদস্যরা।

২। বিরোধী দল শুধু সরকারের ———— করে না, পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সরকারের সঙ্গে ———— নীতিও অনুসরণ করে।

৩। ব্রিটেনে বিরোধী দলকে রানির ———— সরকার বলা হয়।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোনও লিখিত সংবিধান থেকে সার্বভৌমত্ব অর্জন করেনি। সেখানে পূর্বতন চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে পার্লামেন্ট সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে।

তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই সার্বভৌমত্ব আইনগত—রাজনৈতিক নয়। আইনগত বিচারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। ব্রিটেনে আইন প্রণয়নকারী একমাত্র সংস্থা হল পার্লামেন্ট। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতেই আইনগত সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত আছে। অধ্যাপক ডাইসির মতানুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ আইনগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। ডাইসির অভিমত অনুসারে, (১) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে; (২) পূর্বে প্রণীত যে কোনও আইনকে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে; (৩) শাসনতন্ত্রও সংশোধন করতে পারে। ব্রিটেনের আদালত পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

তবে বাস্তবে পার্লামেন্টের আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যত সীমাবদ্ধ।

(১) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জনমতের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(২) প্রচলিত প্রথা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় নীতিবোধ, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারাও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাজকর্ম বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) ক্যাবিনেট প্রথা গড়ে ওঠার দরুন এখন পার্লামেন্ট ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে না, ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৪) আন্তর্জাতিক আইনগুলিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।

(৫) ব্রিটিশ আদালত আইনের বৈধতা বিচার করতে না পারলেও আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং পার্লামেন্টের ওপর আংশিকভাবে হলেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

(৬) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহের চাপও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে পার্লামেন্টের আইনগত সার্বভৌমত্ব বর্তমানে বহুলাংশে তত্ত্বসর্বস্ব। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই এখন ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করছে।

০৩.৪ ❑ সারাংশ

পার্লামেন্ট গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা। রাজা বা রানি, লর্ডসভা ও কমন্সসভা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হল লর্ডসভা। এই লর্ডসভা কেবল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিতীয় কক্ষই নয়, সর্ববৃহৎ দ্বিতীয় কক্ষও বটে। এই কক্ষের কোনও সদস্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নন। তাই এই কক্ষটিকে অগণতান্ত্রিক কক্ষ বলে। সেই কারণে এই কক্ষটির ক্ষমতাও কম। অর্থবিল পাশের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কোনও ক্ষমতাই নেই। তবে বিচার ব্যবস্থার দিক থেকে লর্ডসভা ব্রিটেনে সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। কমন্সসভা আইন প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা নেয়। সেজন্য কমন্সসভায় কমিটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। কমন্সসভার বিরোধীদলের দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কমন্সসভার সভাপতিকে স্পিকার বা অধ্যক্ষ বলা হয়। তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়।

পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যরাই কিছু কিছু বিশেষ অধিকার ভোগ করেন। তত্ত্বগতভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম হলেও বর্তমানে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করছে। তাই বলা হয় ব্রিটেনে এখন ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

০৩.৫ ❑ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। কমন্সসভা কীভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে?

২। ব্রিটিশ কমন্সসভা কীভাবে সরকারি আয়-ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে?

৩। কমন্সসভার সভাপতি কে? তিনি কয় বছর তাঁর পদে বহাল থাকেন?

৪। স্পিকারের নির্ণায়ক ভোট কী?

৫। কমন্সসভায় কত ধরনের কমিটি আছে এবং এগুলি কী কী?

৬। গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধী দলের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য কী কী?

৭। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের যে কোনও দুটি কারণ লিখুন।

৮। কমন্সসভার সদস্যদের দুটি বিশেষাধিকারের উল্লেখ করুন।

৯। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়?

০৩.৬ ❑ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১। (ক)—☑ , (খ)—☑ , (গ)—☒ .

২। (ক) ব্রিটেনের লর্ডসভা (১) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (৪) অন্যান্য ক্ষমতা ভোগ করে।

(খ) ব্রিটেনের লর্ডসভার বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি হল—(১) লর্ডসভার গঠন অগণতান্ত্রিক, (২) লর্ডসভার সদস্যদের ব্যাপক অনুপস্থিত ও ঔদাসীন্য এই কক্ষকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

(গ) লর্ডসভার অস্তিত্বের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয় সেগুলি হ'ল—(১) জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না বলে লর্ডসভা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। (২) লর্ডসভা অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। (৩) লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) অর্থবিলের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ১৯১১ সালে প্রণীত আইনের ফলে বর্তমান অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা মাত্র ১ মাস বিলটিকে আটকে রাখতে পারে। একমাসের মধ্যে লর্ডসভা সেই বিলে সম্মতি না দিলে লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই বিলটিকে রাজা বা রানির সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। অতএব অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কোনও ভূমিকাই নেই।

(ঙ) লর্ডসভা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের সর্বোচ্চ আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। তবে আপিল আদালতের ভূমিকা পালন করা ছাড়াও লর্ডসভার আরও কিছু বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

অনুশীলনী—২

১। পাঁচ, (২) নিম্ন, (৩) স্পিকার, (৪) ব্যয়।

অনুশীলনী—৩

১। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, (২) সভাপতি।

অনুশীলনী—৪

১। (ক)— ☒ , (খ)— ☑, (গ)— ☒ , (ঘ) ☑, (ঙ) ☑.

অনুশীলনী—৫

১। ডানদিকে, বাঁদিকে

২। সমালোচনা, সহযোগিতার

৩। বিকল্প

সর্বশেষ অনুশীলনী ঃ

১। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতি অনুসারে ব্রিটেনের মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকেন। কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া কমন্সসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বির্তক অনুষ্ঠান এবং মুলতুবি প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, ছাঁটাই প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রীসভাকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২। সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কমন্সসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রতিবছর অর্থমন্ত্রী আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় উল্লেখ করে যে বাজেট পেশ করেন তা কমন্সসভাতেই পেশ করা হয়। কমন্সসভার অনুমতি সাপেক্ষেই সরকার কর ধার্য, সংগ্রহ এবং বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থের প্রয়োজন হলে সরকারকে কমন্সসভার অনুমোদন নিতে হয়।

৩। কমন্সসভার সভাপতি হলেন কমন্সসভার স্পিকার। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন।

৪। কমন্সসভার ভোটাভুটিতে বা আলোচনায় সাধারণত স্পিকার অংশগ্রহণ করেন না। তবে কোনও বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য তিনি যে ভোট দেন তাই নির্ণায়ক ভোট হিসেবে পরিচিত।

৫। (ক) গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধী দল একটি সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল ক্ষয়তার কেন্দ্র, (খ) কমন্সসভাতেই বিরোধী দলের অস্তিত্ব বর্তমান; (গ) সরকারি দলের পতন হলে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হয়; (ঘ) কমন্সসভার কার্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে।

৬। ব্রিটিশ পার্লমেন্ট তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম। বাস্তবে পার্লামেন্টের সব ক্ষমতা ক্যাবিনেটই ভোগ করে। কারণ—(ক) ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (খ) দলীয় ব্যবস্থাও পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করেছে।

৭। কমন্সসভার সদস্যদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল—(ক) কমন্সসভার অধিবেশন চলাকালীন কোনও কক্ষের সদস্যকেই দেওয়ানি মামলার দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না। (খ) সভার অধিবেশনে বা কোন কমিটিতে কোনও কিছু বলার জন্য কোনও সদস্যকেই আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না।

৮। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলতে পার্লামেন্টের চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাকে বোঝায়। আইনগত দিক থেকে বিচার করে একথা বলা যেতে পারে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। এই সংস্থার হাতেই আইন প্রণয়নের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। এই সংস্থা যে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোনও আইনকে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে। পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ কোনও প্রশ্ন তুলতে পারে না।

০৩.৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J. Harvey and L. Bather*—The British Constitution, Machmillan, St. Martin's Press, 1970।

২। *Sir Ivor Jennings*—Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959।

৩। *ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র*—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

৪। *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ*—তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। *সুদর্শন ভট্টাচার্য*—(প্রশ্নোত্তর) তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ০৪ ❑ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

গঠন

০৪.১ উদ্দেশ্য

০৪.২ প্রস্তাবনা

০৪.৩ রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকার কারণ

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

০৪.৪ সারাংশ

০৪.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

০৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

০৪.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা যা জানতে পারবেন তা হ'ল—

- ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কী ধরনের রাজনৈতিক দল রয়েছে।
- ওই রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার কী ধরনের সম্পর্ক।
- সমাজে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কতদূর প্রভাবান্বিত করে।

০৪.২ ❑ প্রস্তাবনা

ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তাই এখানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে চলেছে। তার পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীও এখানে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বিশ্লেষণও প্রয়োজন।

০৪.৩ ❑ রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রাণ। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও দলীয় ব্যবস্থা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত যে কোনও গণতান্ত্রিক আমরা রাজনৈতিক দলগুলিকে চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে দল যখন সফল হয় সে দলই ক্ষমতা দখল করে। অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক দলকে হাতিয়ার করে জনগণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং নানা কারণেই এই রাজনৈতিক দলগুলিকে সমাজের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার সংযোজক ও অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়।

রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকার কারণ ঃ

ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে দলীয় ব্যবস্থাই ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রায় দু'শো বছর ধরে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল টোরি ও হুইগ দল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে টোরি দল রক্ষণশীল দলে এবং হুইগ দল উদারনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। এই দুটি দলই দীর্ঘদিন ব্রিটেনের রাজনৈতিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক দল ও রক্ষণশীল দল ব্রিটেনের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের পর থেকে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে থাকে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। বরং বলা যায় যে আজকের ব্রিটেনে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে ছোট বড় ২১টি রাজনৈতিক দল রয়েছে যার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি (CPGB) অন্যতম। নির্বাচনের সময়ে এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বেশির ভাগ দলই সেখানে অঞ্চল ভিত্তিক। এখানে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধীকরণের কোনও ব্যবস্থাই নেই। বর্তমানে যেসব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল রয়েছে সেগুলি হ'ল—রক্ষণশীল দল, শ্রমিক দল, সামাজিক গণতন্ত্রী দল (Social Democratic Party), সামাজিক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রী (Social and Liberal Democrates) এবং কমিউনিস্ট দল। এ ছাড়াও কয়েকটি আঞ্চলিক দল রয়েছে। যেমন—স্কটল্যান্ডের স্কটিশ জাতীয় দল (Scottish National Party), ওয়েলসের জাতীয়তাবাদী দল প্লেইড সিমরু (Plaid Cymru) এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের সরকারি আলস্টার ইউনিয়নবাদী দল (Official Ulster Unionist Party), গণতান্ত্রিক ইউনিয়নবাদী দল (Democratic Unionist Party), সামাজিক গণতান্ত্রিক শ্রমিক দল (Social Democratic Labour Party), আলস্টার জনগণের ইউনিয়নবাদী দল (Ulster People's Unionist Party) ও ফেইন (Sinn Fein) দল।

তবে সামগ্রিক বিচারে ব্রিটেনের দলীয়ব্যবস্থা মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। ব্রিটেনে এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে যে সমস্ত কারণ রয়েছে সেগুলি হ'ল—

(১) ব্রিটেন একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এখানে সেই অর্থে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভৌগোলিক তারতম্য তেমন নেই। ফলে এখানে বহুদলীয় ব্যবস্থার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়নি।

(২) ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও দল ব্রিটেনে গড়ে উঠতে পারেনি।

(৩) ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল। এই কারণে তাঁরা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী তৃতীয় কোনও দলকে সমর্থনের পক্ষপাতী নন।

(৪) ব্রিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সরকারের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকার সাধারণত স্বল্পস্থায়ী হয়।

(৫) বর্তমানে নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া নির্বাচনে সাফল্য পাওয়ার জন্য ব্যাপক সাংগঠনিক শক্তি থাকা প্রয়োজন। ব্রিটেনের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের এই অর্থবল ও সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও অন্য কোনও দলের তা নেই—যা তৃতীয় দল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

(৬) কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই সম্মতির ভিত্তিই হ'ল দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মূল নীতি।

(৭) ব্রিটেনে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল নিজেদের সকল শ্রেণির কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। তা বিভিন্ন স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

(৮) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল চরিত্র দ্বিদল ব্যবস্থার বৃদ্ধি করেছে। ইংরেজ জাতি তার রক্ষণশীলতার জন্য একবার কোনও ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হ'লে সহজে তা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে না। দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই ধারণা প্রযোজ্য।

(৯) গ্রেট ব্রিটেনের নির্বাচনী ব্যবস্থা দ্বিদল ব্যবস্থার উদ্ভব ও শক্তি বর্ধনে সহায়ক হয়েছে। পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্র এক সদস্য বিশিষ্ট সকল প্রার্থীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীই নির্বাচিত হন। ফলে বেশির ভাগ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকেই প্রধান দুটি দল রক্ষণশীল অথবা শ্রমিক দল জয়ী হয়। ফলে ছোট ছোট দলের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে।

(১০) অনেক বিশেষজ্ঞের মতে রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সেখানকার বৃহৎ গণমাধ্যম বি. বি. সি. ব্যাপকভাবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সংহতিসাধনে সহায়ক হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক প্রচারকার্যের জন্য বি.বি.সি. যে

সময় ধার্য করে তার বেশির ভাগই শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের জন্য নির্ধারিত থাকে। কিন্তু অন্যান্য দলকে তেমন সুযোগ দেওয়া হয় না।

অনুশীলনী—১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধীকরণের কোনও ব্যবস্থা নেই।

(খ) প্রায় দুশো বছর ধরে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল টোরি ও হুইগ দল।

(গ) ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও দল ব্রিটেন গড়ে উঠতে পারেনি।

ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে সেগুলি হ'ল ঃ

(১) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। কেউ কেউ আবার এই দলীয় ব্যবস্থাকে সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করতে চান। প্রথমে টোরি ও হুইগ তারপর রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক এবং বর্তমান রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলকেই কেবলমাত্র পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

(২) আইনগত স্বীকৃতির অভাব ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই আইনগত স্বীকৃতির অভাব সত্ত্বেও দলীয় ব্যবস্থা ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

(৩) ব্রিটেনের দল ব্যবস্থার প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য তেমন নেই। অতএব দুটি দলের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। এই বিরোধ না থাকার জন্যই কোনও রাজনৈতিক দলই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়।

(৪) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখানকার দলগুলি প্রধানত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের হাতেই চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে। এর ফলে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির আঞ্চলিক সংগঠনগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

(৫) ব্রিটেনে দলীয় শৃঙ্খলার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে দলীয় নিয়ম শৃঙ্খলাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সাম্প্রতিক কালে ব্রিটেনের দলীয় শৃঙ্খলার কঠোরতা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।

(৬) ব্রিটেনের কোনও দলই সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনে বৈপ্লবিক পদ্ধতি অনুসরণে পক্ষপাতী নয়। তাই তারা সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।

(৭) গ্রেট ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। ব্রিটেনের বিরোধীদল সরকারের সমালোচনা করলেও জাতীয় সংকটের সময় বিরোধী দল সবসময়ই

সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন কি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, কমনওয়েলথ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ-এর ক্ষেত্রে সরকারি দল বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে। প্রবল জাতীয় সংকট, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, সে দেশে যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে রক্ষণশীল ও শ্রমিক উভয় দলই একযোগে দেশশাসন ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সামলেছে।

(৮) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে প্রকৃত শ্রেণিভিত্তিক দলীয় ব্যবস্থা বলা যায় না। যেমন, রক্ষণশীল দলটি মূলত সামন্ত শ্রেণি ও সমাজের বিত্তবান অংশের স্বার্থ সংরক্ষণ করলেও এই দলের সমর্থকদের শতকরা ৫৫ জন শ্রমিক শ্রেণির। অন্যদিকে শ্রমিক দল ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ করলেও এই দলের সমর্থকদের একটা বড় অংশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষ।

(৯) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ হ'ল প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ মূলত কর্মসূচীভিত্তিক দলে পরিণত হয়েছে। সাধারণত নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী কর্মসূচী (ইশ্‌তেহার) রচনায় ব্যস্ত থাকে। নির্বাচক মন্ডলীর রায় যে দলের কর্মসূচীর অনুকূলে থাকে, সেই দলই সরকার গঠনের সুযোগলাভ করে।

(১০) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় প্রধান দলগুলি কর্মসূচীতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, কোনও চরম পন্থা নয়। নির্বাচন কেন্দ্রীয় দল বলেই তাদের পক্ষে এই মধ্যপন্থার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব।

(১১) ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দুর্নীতী ধীরে ধীরে প্রাধান্য বিস্তার করছে। দুর্নীতির এই অভিযোগ দলীয় রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করেছে।

(১২) ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

অনুশীলনী—২

১। শূন্যস্থান পূরন করুন ঃ

(ক) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা মূলত _____ ব্যবস্থা।

(খ) শক্তিশালী _____ _____ অস্তিত্ব ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

(গ) ব্রিটেনের দলীয় _____ ওপর প্রভুত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ঘ) ব্রিটেনে _____ দল ও _____ গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

যখন একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ও উদ্বুদ্ধ একদল মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বা যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংবিধান সম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তখন সেই

সংগঠিত জনসমষ্টিকেই রাজনৈতিক দল বলে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা সম্পর্কিত এই বক্তব্য গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ব্রিটেন সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় রীতিনীতি অনুসারে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী স্থির হয়।

(১) সরকারি ক্ষমতা দখল করা হ'ল রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রিটেনের দুটি প্রধান দল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। অপর দলটি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে এবং সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার প্রবণতাকে রোধ করে।

(২) অতএব বলা যায় যে রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলির নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং সেই মনোনীত প্রার্থীর জয়লাভের জন্য প্রচারকার্য চালায়।

(৩) অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনেও প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হ'ল নিজের অনুকূলে জনমত গঠন করা। নির্বাচনে প্রত্যেক দলই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে নিজ নিজ বক্তব্য নির্বাচকমন্ডলীর কাছে পেশ করে এবং তাদের সমর্থন দাবি করে।

(৪) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন বিকল্প পন্থা জনগনের সামনে তুলে ধরে। ফলে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

(৫) বর্তমানে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত গ্রেট ব্রিটেনকেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের নিজের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

(৬) অন্যান্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ব্রিটেনও সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক দল।

(৭) গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় যেহেতু আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে সেহেতু শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে এখানে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। সুতরাং বলা যায় যে রাজনৈতিক দলই ব্রিটেনে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করে।

(৮) রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভিন্নমুখী অজস্র চাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অনুশীলনী—৩

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বর্তমানে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ____ ও ____ দল।

(খ) ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি ____ ও ____বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় ____ বিভাগ ও ____বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায়____ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল।

০৪.৪ সারাংশ

ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান যা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। এই দল দুটি হল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। এই দুটি দলের একটি দল সরকার গঠন করে আর একটি দল বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে।

ব্রিটেন রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কোনও আইনগত স্বীকৃতি নেই। সংবিধানের কোন ধারা অথবা আইনসভা প্রণীত কোনও আইনের মাধ্যমে দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। এখানে দলীয় শৃঙ্খলার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

১। ব্রিটেনের দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২। ব্রিটেনের চারটি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন।

৩। ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থায় স্থায়িত্বের কারণ কী?

৪। ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য আছে কি?

৫। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী উল্লেখ করুন।

অনুশীলনী—১

১। (ক)—☑, (খ)—☑, (গ)—☑।

অনুশীলনী—২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা।

(খ) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

(গ) ব্রিটেনে দলীয় শৃঙ্খলার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ঘ) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

অনুশীলনী—৩

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বর্তমানে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল।

(খ) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষা ও চেতনা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সরকার ও জনগনের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল।

অনুশীলনী—৪

১। একটি অথবা দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ

(ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করেও সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্টে হয়। গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ করা, সরকারি ক্ষমতা হস্তগত করা নয়।

(খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ হল শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, কৃষক সমিতি, বণিক সভা প্রভৃতি।

(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে মূলত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়—অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (Economic Groups) এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জাড়িত নয় এমন সব গোষ্ঠী (Non-economic Groups)।

(ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি নির্বাচকমন্ডলী, রাজনৈতিক দল, আইনসভা ও শাসন বিভাগীয় স্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

০৪.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। ব্রিটেনের দলব্যবস্থায় কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল—(ক) দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, (খ) আইনগত স্বীকৃতির অভাব, (গ) মতাদর্শগত পার্থক্যের অভাব, (ঘ) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব, (ঙ) কঠোরভাবে নিয়মশৃঙ্খলা অনুসারণ করার প্রবণতা, (চ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ইত্যাদি।

২। ব্রিটেনের চারটি রাজনৈতিক দল হল—(ক) রক্ষণশীল দল, (খ) শ্রমিক দল, (গ) উদারনৈতিক দল এবং (ঘ) সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

৩। ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যস্থবার স্থায়িত্বের পেছন যে কারণগুলি আছে, সেগুলি হ'ল—(ক) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা, (খ) আঞ্চলিক দলের সুযোগ না থাকা, (গ) দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শ ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে পার্থক্যের অভাব, (ঘ) কোনও দলই পুরোপুরি শ্রেণিভিত্তিক না হওয়া, (ঙ) নির্বাচন পদ্ধতি, (চ) কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি, (ছ) সংসদীয় গণতন্ত্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা।

৪। ব্রিটেন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত কোনও পার্থক্য নেই। তাই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। এই বিরোধ না থাকার জন্য কোনও রাজনৈতিক দলই সমাজব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। রাজনৈতিক দলগুলি মোটামুটি একই শ্রেণিস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে তারা মোটামুটি একই মত পোষণ করে।

৫। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের কাজ হ'ল—(ক) সরকারি ক্ষমতা দখল করা, (খ) সমস্যা নির্বাচন করা, (গ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, (ঘ) জনমত গঠন করা, (ঙ) সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা, (চ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা করা, (ছ) রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার বিস্তার ঘটানো, (জ) সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করা ইত্যাদি।

৬। ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সেখানকার রাজনৈতিক দলসমূহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সেই কারণে এই গোষ্ঠীগুলি যে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ার রয়েছে, সেই রাজনৈতিক দলের অনুকূলে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির উত্থানপতনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

০৪.৬ গ্রন্থপঞ্জী

১। T. Brennan—Politics and Government in Britain, Cambridge University Press—1972.

২। সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ—তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৩। অধ্যাপক সুদর্শন ভট্টাচার্য—প্রশ্নোত্তরে তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি; (দ্বিতীয় খন্ড) ঃ ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট, ২০০০।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সহায়ক পাঠক্রম

দ্বিতীয় পত্র

(SPS-II)

পর্যায়

০২

একক ০৫ ❑ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহের উদ্ভব (সংশোধনসহ)

গঠন

০৫.১ উদ্দেশ্য

০৫.২ প্রস্তাবনা

০৫.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সংবিধান রচনা ও গ্রহণ

০৫.৪ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

০৫.৫ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

০৫.৬ ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা

০৫.৭ সারাংশ

০৫.৮ প্রশ্নাবলী

০৫.৯ উত্তরমালা

০৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

০৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন সম্বন্ধে আপনাদের অবহিত করা। এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মগ্রহণের পটভূমি;
- মার্কিন সংবিধান রচনা ও গ্রহণের বৃত্তান্ত;
- মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণ;
- মার্কিন সংবিধানের পদ্ধতি ও সংবিধানের সংশোধনসমূহ।

এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হলে আপনি আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

০৫.২ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা আমেরিকার সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমিকার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা ও গ্রহণ, সংবিধানের

সম্প্রসারণ, সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা করব। তাছাড়াও ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনার ভিত্তিতে আমেরিকার সংবিধানকে বোঝার চেষ্টা করব।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ১৭৬৩ থেকে নানারকম কর ও দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। ফলে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। তেরটি উপনিবেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের বলপ্রয়োগ নীতি ও শুষ্ক নীতির বিরুদ্ধে ১৭৭৫ সালে উপনিবেশবাদীদের যুদ্ধ শুরু হয়। ৪ঠা জুলাই,১৭৭৬ সালে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়। ১৭ই নভেম্বর ১৭৭৭ সালে ১৩ টি উপনিবেশ মিলে রাষ্ট্র সমবায় (Confederation) গঠন করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা মেনে নেয় না। শেষে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুদ্ধে ১৭৮৩ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি জয়লাভ করে স্বাধীনতা লাভ করে।

রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে অনৈক্য ও নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির একটি কনভেনশনে নতুন সংবিধান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৭৮৯ সালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানটি ছিল ক্ষুদ্র। তাতে প্রস্তাবনাসহ সাতটি অনুচ্ছেদ ছিল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, প্রথা ও রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রপতিদের শাসনবিভাগীয় ভূমিকার মাধ্যমে সংবিধানটি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে বর্তমান রূপ পেয়েছে।

১৭৮৯-এর আমেরিকার সংবিধান জনগনের সার্বভৌমত্ব, লিখিত শাসনতন্ত্র, দুষ্পরিবর্তনীয়তা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, রাষ্ট্রপতির শাসন, জনগণের মৌলিক অধিকার, বিচারবিভাগের প্রাধান্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি, দ্বৈত নাগরিকতা, রাজ্যগুলির সমতা ও স্বতন্ত্র সংবিধান, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, সীমাবদ্ধ শাসন ও প্রতিনিধিমূলক শাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাও সংবিধানে লিখিত আছে। আমেরিকার সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থাটি জটিল ও কষ্টসাধ্য, তাই আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পপরিবর্তনীয় বলা হয়।

ব্রিটেন ও আমেরিকার দুটি উদারনীতিবাদী ধনতান্ত্রিক দেশ। দুটি দেশেই গণতন্ত্র, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দ্বিদল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে আমেরিকার শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আর ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় ও এককেন্দ্রিক। তাই উভয় দেশের শাসনব্যবস্থায় মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

০৫.৩ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সংবিধান রচনা ও গ্রহণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুশো বছরের কিছু বেশি ইতিহাসে দেশটি বিশ্বে তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মার্কিন শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে কানাডা, দক্ষিণে মেক্সিকো ও মেক্সিকো উপসাগর, পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। সমগ্র দেশ জুড়ে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়, বিস্তৃত উপত্যকা, বড় বড় নদনদী এবং উর্বর সমভূমি। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটি সমৃদ্ধ। জাতিগতভাবে মার্কিনিরা বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন জাতির জীবনধারা ও ঐতিহ্যের মিলনে মার্কিনিদের উদ্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিবাসীদের দেশ বলা হয়। এখানে বহু ভারতীয় উপজাতি, স্ক্যানিনেভিয়ার ভাইকিংস উপজাতি ও স্পেনীয়রা বসবাস করছেন। ইংল্যান্ড,হল্যান্ড ও ইউরোপের পশ্চিমঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে এই অঞ্চলে বহু মানুষ আসেন। বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ও জীবনধারার মধ্যে ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব মার্কিনিদের ওপর সব থেকে বেশি।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যস্থাপনে ইংল্যান্ড প্রথম পদক্ষেপ নেয় ১৫৭৮ সালে। ওই সময় স্যার হামফ্রি হিঙ্গালবার্টকে ইংল্যান্ডের রানি দুরবর্তী ও আদিম অঞ্চলে বসবাস ও ওইসব স্থান দখল করার অনুমতি দেন। দুবছর পর ইংল্যন্ডের রানী সেন্ট লরেন্স নদী ও ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে ইংরেজদের বসতিস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে ওই অঞ্চলের নাম দেন ভার্জিনিয়া। ওই অঞ্চলে বসতিস্থাপনের দায়িত্ব দেন ওয়াল্টার র‍্যালের হাতে। আমেরিকায় বসতিস্থাপনের জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হয়। ইউরোপে চার্চের সঙ্গে যাদের বিরোধ হয়েছিল তারাও উত্তর আমেরিকায় তাদের প্লাইমাউথ ও লন্ডন কোম্পানিকে আমেরিকার বিশেষ কয়েকটি স্থানে বসতিস্থাপনের অধিকার দেন। ১৬২০ সালে কিছু পিলগ্রিম (ধর্মীয় ভেদবাদী), ১৬৩৪সালে একদল ক্যাথলিক এবং ১৬৮২ সালে কোয়েকাররা যথাক্রমে ম্যাসচুসেটস, মেরিল্যান্ড ও পেনসিলভ্যানিয়ায় উপস্থিত হয়। ১৭০০ সালের মধ্যে ম্যাসচুসেটস থেকে ক্যারোলিনা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে ইংরেজদের জনপদ গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ড থেকে আসা অধিবাসীদের মাধ্যমে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, আইন ইত্যাদি আমেরিকার ভূখন্ডে বাহিত হয়ে আসে।

শুরুতে উপনিবেশগুলির শাসনব্যবস্থা ইংল্যান্ডের ব্যবসায়ী ও রাজার প্রিয় ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তারা রাজার ফরমান অনুসারে উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৩ টি উপনিবেশের সবগুলিতেই আইনসভা দ্বারা আইন প্রণীত হত। কানেক্‌টিকাট রোড আইল্যান্ড তাদের গভর্নরকেও নির্বাচিত করত। তবে অন্যগুলিতে রাজাই গভর্নরদের নিয়োগ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংল্যান্ডের রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকত। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে (১৭৬৩) স্পেন ও ফ্রান্স হটে যাবার পর ইংল্যান্ডের স্বার্থের যুপকাষ্ঠে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থকে বলি দেওয়া শুরু হয়। সেখানে নানারকম কর বসিয়ে ইংল্যান্ডের কোষাগার বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। ১৩ টি উপনিবেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তারা জানায় যে উপনিবেশগুলিতে করধার্যের ক্ষমতা শুধু সেখানকার আইনসভাগুলিই ভোগ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নতুন কর বসাতে থাকলে সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৭৭০ সালের বোস্টন শহরে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও আর্থিক নীতি ঔপনিবেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থবিরোধী ছিল। মাতৃভূমি ব্রিটেনের সঙ্গে ১৩টি উপনিবিশের সম্পর্কে তিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন হতে থাকে।

১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়াতে প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটন ও প্যাট্রিক হেনরি, মাস্যাচুসেটসের জর্ন ও সামুয়েল আডামন ইত্যাদি ৫৬ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দেন। এখানে ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক আইন ও রাজস্বসংক্রান্ত নিয়মনীতির নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে শুধুমাত্র প্রাদেশিক আইনসভাগুলিই তাদের নিজেদের সম্বন্ধে আইনপ্রণয়নের অধিকারী।

ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক শুল্কব্যবস্থা ও বলপ্রয়োগ নীতির পরিবর্তন না করায় ১৭৭৫ সালে ফিলাডেলফিয়ায় দ্বিতীয় কংগ্রেস শুরু হয়। এতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, উইলসন, জেফারসন ইত্যাদি নেতারা যোগ দেন। অবশ্য কিছু রক্ষণশীল নেতা যোগ দেননি।

দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের অল্পদিন আগেই উপনিবেশবাসীদের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ শুরু হয়। উপনিবেশগুলির সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষ পদে জর্জ ওয়াশিংটনকে নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস ১৪ মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়নি।

১৭৬৩ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও ১৭৭৫-এর আগে পর্যন্ত সব ঔপনিবেশিকদেরই লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন। গ্রেট ব্রিটেনর সঙ্গে সমঝোতায় আসাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু তাদের ন্যায্য দাবিগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন মেনে না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত উপনিবেশগুলির জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি তোলে। ১৭৭৫ সালে লেক্সিংটন যুদ্ধের পর তারা ব্রিটেনের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করে। রক্ষণশীল নেতারা ঔপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা ও ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরোধী ছিলেন। তাদের সঙ্গে স্বাধীনতাকামীদের সর্বত্র যুদ্ধ চলে।

১৭৭৬ সালের ৭ই জুন দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশগুলির স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ১০ই জুন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনার জন্য কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ২৮শে জুন রিপোর্ট পেশ করে এবং ৪ঠা জুলাই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হয়।

১৭৭৭ সালের ১৭ই নভেম্বর ১৩টি উপনিবেশ চুক্তির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে। ১৭৮১ সালে চুক্তিপত্রটি বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অনুমোদন করে। চুক্তিপত্র অসুসারে রাষ্ট্রসমবায়ের পরিচালনার জন্য মহাদেশীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে।

রাষ্ট্র-সমবায়ের সংবিধান অনুসারে মহাদেশীয় কংগ্রেসের মুখ্য দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্র-সমবায়ের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, সন্ধিচুক্তি সম্পাদন, সেনাবাহিনী গঠন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সুদৃঢ়করণ ইত্যাদি। সংবিধান অনুসারে বিচারকাজ পরিচলনার জন্য একটি সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়।

রাষ্ট্র-সমবায়ের কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা ছিল। করধার্য, ঋণগ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র-সমবায়ের কোনো ক্ষমতা ছিল না। ফলে রাষ্ট্র সমবায় ও মহাদেশীয় কংগ্রেসকে বহু পরিমাণে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির ওপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে সচেতন ছিল। তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্যের অভাবে রাষ্ট্র-সমবায়কে নানা অসুবিধায় পড়তে হত।

রাষ্ট্র-সমবায়ের সংবিধানের এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য হ্যামিলটনের উদ্যোগে ১৭৮৭ সালে কংগ্রেসের কাছে রাষ্ট্র-সমবায়ের চুক্তি সংশোধনের জন্য আবেদন জানানো হয়। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় ওয়াশিংটনের নেতৃত্ব সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির একটি কনভেনশন ডাকা হয়। এই কনভেনশনে নতুন অঙ্গারাজ্যই এই নতুন সংবিধান অনুমোদন করে। ওয়াশিংটন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ৩০ শে এপ্রিল কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথমে ১৩ টি রাজ্য থাকলেও পরে রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে ৫০ হয়। এই সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবনা ও ৭টি অনুচ্ছেদ নিয়ে সংবিধানের শুরু হয়েছিল। পরে কিন্তু সংশোধনের সংযুক্তি ঘটেছে। তাছাড়াও কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি, কংগ্রেস প্রণীত আইন ও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে সংবিধানটি সম্প্রসারিত ও বিকশিত হয়েছে।

০৫.৪ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৭৮৭ সালে গৃহীত ফিলাডেলফিয়া কনভেনশন গৃহীত মার্কিন সংবিধান খুবই সংক্ষিপ্ত—মুদ্রিত দশ পাতার বেশি নয়। এই লিখিত ক্ষুদ্র সংবিধানটি পরবর্তীকালে প্রথা, রীতিনীতি, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, আইনসভা প্রণীত আইন ইত্যাদির দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের এই সাধারণ চরিত্র স্মরণ রেখে আমরা এবার তার বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোচনাও করব।

(১) জনগণের সার্বভৌমত্ব ঃ সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে " আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ অধিকতর সার্থক এক রাজ্যসংঘ গঠন, ন্যায়প্রতিষ্ঠা, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিতকরণ যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন, জনগণের কল্যাণবৃদ্ধি এবং আমাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতা সম্ভব করার উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রের এই সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা করলাম। (We, the people of United States; in order to from a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare and secure the blessings of liberty of ourselves and our posterity, to ordain and establish the constitution for the United States) সংবিধানের প্রস্তাবনা সুস্পষ্টভাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছে। সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল জনসম্মতি, বা গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ।

(২) লিখিত শাসনতন্ত্র ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলা যায়। শাসনতান্ত্রিক বিধি ও আইন এখানে একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিখিতভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। ব্রিটেনের মত আমেরিকার

সংবিধান অলিখিত হয়। পরবর্তীকালে আমরা ভারতবর্ষ, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি দেশেও লিখিত সংবিধান পেয়েছি। আমেরিকায় সংবিধান একদিকে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করেছে, অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগের এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তবে বিগত ২১২ বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক অলিখিত অংশ সাংবিধানিক মর্যাদালাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সংবিধান প্রণেতারা আমেরিকার সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলিই নির্দেশ করেছিলেন। কালের বিবর্তনে সেই মৌলিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অলিখিত অংশ সংবিধানগতভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

(৩) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ঃ আনুষ্ঠানিক সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির দিক থেকে মার্কিন সংবিধান খুবই দুষ্পরিবর্তনীয়। এটি সংশোধন করতে গেলে দুটি পর্যায় দেখা যায়—(১) সংশোধনী প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গারাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত এক সভায় গ্রহণ করতে হবে। (২) ওই প্রস্তাব আবার অঙ্গ রাজ্যগুলিতে ওই উদ্দেশ্যে আহূত সভার অন্তত তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা বা আইনসভাগুলির তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। সংশোধনী প্রস্তাব এভাবে গৃহীত ও সমর্থিত হলে তবেই আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন সম্ভব। সংশোধন পদ্ধতির এই জটিলতার ও দুঃসাধ্যতার জন্য আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয়। আমেরিকার সংবিধান জটিল সংশোধন পদ্ধতির জন্য গত ২১২ বছরে মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হয়েছে।

বাস্তবে দুষ্পবরিবর্তনীয় হলেও কার্যত আমেরিকার সংবিধানের রূপ সুপরিবর্তনীয়। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানকে সময়ের পরিবর্তনের সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রদান করেছে এবং সংবিধানকেও গতিশীল হতে সাহায্য করেছেন। অলিখিত রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা সংবিধান পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মুনরোার মতে, আমেরিকান সংধিান স্থিতিশীল নয়—গতিশীল, নিউটোনিয়ান নয়, ডারউইনিয়ান। অনেক রাষ্ট্রবীজ্ঞানী মনে করেন যে বাস্তবে আমেরিকার সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধানের থেকেই সুপরিবর্তনীয়।

(৪) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতিফলন বলা যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটিকে আমেরিকার সংবিধান রচয়িতারা দেখেন। ঔপনিবেশিক শাসনে শাসকের স্বৈরাচার ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে সংবিধান রচয়িতারা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক মনে করেছিলেন। তাই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্যই আমেরিকার সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শাসন, আইন ও বিচারবিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যাতে না থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এজন্য আমেরিকার সংবিধানে আইন, শাসন ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। মার্কিন সংবিধানের ১,২,৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে যথাক্রমে কংগ্রেস আইনবিভাগীয়, রাষ্ট্রপতি

শাসনবিভাগীয় এবং সুপ্রিম কোর্ট বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি বা তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যরা কেউই কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেসে তাঁরা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারেন না, কংগ্রেসের কাছে তাঁদের কোনও দায়িত্বশীলতাও নেই। বিচারবিভাগও আমেরিকার আইন ও শাসনবিভাগের এক্তিয়ার থেকে মুক্ত ও স্বাধীন।

(৫) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি ঃ ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে যাতে কোনও একটি বিভাগ স্বেচ্ছাচারীভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য মার্কিন সংবিধানে প্রত্যেক বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অপর দুই বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়েই শাসন যন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। আমেরিকার সংবিধান তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিটিকেও গুরুত্বপ্রদান করেছে। কোনও বিভাগই অনন্য ক্ষমতা ভোগ করেন না। কংগ্রেসের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও রাষ্ট্রপতি সেই আইনে 'ভিটো' প্রয়োগ বা অসম্মতি জানাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত। কিন্তু সন্ধিচুক্তি সম্পাদন, গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বা কোনও দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণার ক্ষেত্রে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন প্রয়োজন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের বিচার সংক্রান্ত চরম ক্ষমতা থাকলেও কংগ্রেস তাদের ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতি দ্বারা পদচ্যুত করতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট আবার কংগ্রেস প্রণীত আইন ও রাষ্ট্রপতির কাজকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কোনও মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রিম কোর্ট তা মীমাংসার অধিকারী। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের আবার সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। এইভাবে সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ সরকারের তিনটি শাখা একে অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

(৬) মৌলিক অধিকার ঃ মূল মার্কিন সংবিধানে মৌলিক অধিকার ছিল না। পরে প্রথম দশটি সংশোধনের মাধ্যমে মার্কিন সংবিধান মৌলিক অধিকারকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ইত্যাদি। এই দশটি সংশোধনকে মার্কিন নাগরিকদের 'অধিকারের সনদ' বলা হয়।

(৭) রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ঃ সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনবিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির একক কর্তৃক শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটেনের মত শাসনবিভাগের দায়িত্ব যৌথভাবে ক্যাবিনেটের ওপর ন্যস্ত নয়। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদান করার জন্য একটি ক্যাবিনেট আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শমত কাজ করতে বাধ্য নন। বস্তুত, ক্যাবিনেট সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিজেই ইচ্ছামত নিয়োগ করেন এবং যখন খুশি তাদের পদচ্যুত করতে পারেন। ক্যাবিনেটকে রাষ্ট্রপতির ভৃত্যের মত মনে করা যায়। ক্যাবিনেটের কংগ্রেসের কাছে কোনও দায়িত্বশীলতা নেই, ক্যাবিনেটের কোনও সাংবিধানিক মর্যাদাও নেই।

(৮) **বিচারবিভাগের প্রাধান্য** ঃ বিচারপতি হিউসের-এর (Hughes) মতে, ''We are under the Constitution, and the Constitution is what the judges say it is.'' ("আমরা সংবিধানের অধীন, এবং সংবিধান হল বিচারপতিগণ যে ব্যাখ্যা দেন, তাই।") মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাবলে শাসনবিভাগের কোনও কাজ বা আইনবিভাগ রচিত কোনও আইন সংবিধান বিরোধী মনে করলে সেই কাজ বা আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শুরু থেকেই সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসছে। তাছাড়াও যে কোনও কাজ বা আইনকে বিচার করার সময় সুপ্রিম কোর্ট তার পদ্ধতিগত ও বস্তুগত উভয় দিকের বিচার করে। বস্তুগত বা নৈতিক দিকের বিচারের ফলে সুপ্রিম কোর্ট প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। এজন্য মার্কিন সুপ্রিম কোর্টকে পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী বিচারালয় বলা হয়। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের আইনকে অবৈধ বলার ক্ষমতা আদালতের নেই। তাই সেখানে পার্লামেন্টের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট যে কোনও আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে অবৈধ বলার ক্ষমতাযুক্ত হওয়ায় সেখানে বিচারবিভাগের প্রাধ্যন্য লক্ষণীয়।

(৯) **যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি** ঃ যুক্তরাষ্ট্র বলতে বোঝায় লিখিত সংবিধান দ্বারা কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাবন্টন, সংবিধানের প্রাধান্য ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপস্থিতি। মার্কিন সংবিধানে তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রং-এর (Strong) মতে, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে। সংবিধানের ৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে মার্কিন সংবিধানই দেশের চরম ও প্রধান আইন। সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয়েছে। কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যের মদ্যে বিবাদ বা অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা বা সংবিধান ব্যাখ্যার চরম ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট হল নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

(১০) **দ্বৈত নাগরিকতা** ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা কেন্দ্র বা যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যদিকে রাজ্যের নাগরিক। এই দুই ধরনের নাগরিকতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই।

(১১) **রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র সংবিধান** ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধেই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংবিধান শুধুমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে দিয়েছে। রাজ্যের সরকার কিভাবে চলবে তা রাজ্যের সংবিধান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান আছে।

(১২) **অঙ্গারাজ্যগুলির সমতা** ঃ মার্কিন সংবিধানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব ধরনের অঙ্গারাজ্যগুলির মধ্যে সমতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আয়তন নির্বশেষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটে দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে।

(১৩) **দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা** ঃ মার্কিন আইনসভা ও কংগ্রেস দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষ বা জনপ্রতিনিধি সভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং উচ্চকক্ষ বা সিনেটে সব রাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি রাজ্য থেকে দুজন প্রতিনিধি সিনেট প্রেরিত হয়।

(১৪) **প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ঃ** মার্কিন শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত কংগ্রেস (কেন্দ্রীয় স্তরে) এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভাগুলি (রাজ্যস্তরে)। শাসনবিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি (কেন্দ্রীয় স্তরে) এবং রাজ্যপাল (রাজ্যস্তরে) নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হন।

(১৫) **সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থা ঃ** সরকার যাতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য মার্কিন সংবিধান সরকারি ক্ষমতার ওপর কতকগুলি বাধানিষেধ স্থাপন করেছে। যেমন, সরকার ব্যাক্তির অধিকার হরণ করতে পারবে না। কিছু বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু বিষয়ের ব্যাক্তির অধিকার হরণ করতে পারবে না। কিছু বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু বিষয়ের ওপর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে। আইন, শাসন ও বিচারবিভাগ পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য কক্ষা করে, কেউই অপরের সম্মতি ছাড়া কাজ করতে পারে না। আবার একমত হয়ে তারা কাজ করলেও সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে।

০৫.৫ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

সামাজিক দলিল হিসাবে সংবিধান একটি নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতিবিধানের জন্য রচিত হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ও তার সমস্যাদির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গো সঙ্গো প্রয়োজনের তাগিদে সংবিধানেরও সংশোধন করতে হয়। অন্যান্য দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

সংবিধানের ৫নং ধারায় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। এজন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সংবিধানে সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের দুটি পদ্ধতি এবং প্রস্তাবটি অনুমোদনের দুটি পদ্ধতি কথা বলা হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের দুটি পদ্ধতি হল ঃ

(i) কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে।

অথবা

(ii) দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গারাজ্যের আইনসভাসমূহের অনুরোধক্রমে আহূত একটি কনভেনশন বা সভায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে।

সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের দুটি পদ্ধতি হল ঃ

(i) অঙ্গারাজ্যগুলির আইনসভাগুলির তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা অনুমোদিত হলে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অথবা

(ii) সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে অঙ্গারাজ্যগুলির আহূত কনভেনশনের তিন-চতুর্থাংশ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তবেই তা গৃহীত হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে ঃ

(১) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। সংবিধান সংশোধনের যে কোনও প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা যেমন তাদের আছে, তেমনি তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গারাজ্যের সম্মতি ছাড়া কোনও প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা যেমন তাদের আছে, তেমনি তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গারাজ্যের সম্মতি ছাড়া কোনও সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না। মার্কিন সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একক প্রাধান্যের বদলে তাই কেন্দ্র ও অঙ্গারাজ্যগুলির যৌথ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এক-চতুর্থাংশের বেশি রাজ্য কোনও সংশোধনী প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।

(২) কংগ্রেস কোনও সংশোধনী প্রস্তাব অঙ্গারাজ্যগুলির অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করতে অস্বীকার করলে দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য আইনসভার আবেদন ক্রমে কংগ্রেস একটি সাংবিধানিক কনভেনশন আহ্বান করতে বাধ্য। এই কনভেনশন সংশোধনী প্রস্তাবটিকে অনুমোদনের জন্য অঙ্গারাজ্যগুলির আইনসভাগুলির কাছে প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিলে কংগ্রেস সেই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য।

(৩) সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতির বদলে বিশেষ পদ্ধতির দ্বারা আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাটি সংবিধানটিকে দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতি দান করেছে।

(৪) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাবে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গারাজ্যের সম্মতি আবশ্যিক ঘোষণা করা হলেও কতদিনের মধ্যে রাজ্যগুলিকে মতামত জানাতে হবে যে সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। সুপ্রিম কোর্ট এই সময়সীমা নির্ধারণের দায়িত্ব কংগ্রেসকে দেওয়ার বর্তমান প্রতিটি সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্যেই সময়সীমা স্থির করে দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবে রাজ্যগুলির মতামত জ্ঞাপনের সময়সীমা যদি কংগ্রেস ঠিক করে না দেয়, সেক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সুপ্রিম কোর্ট কোলম্যান বনাম মিলারের মামলায় (১৯৩৯) রায় দিয়েছে যে এরূপ ক্ষেত্রে সংশোধনী প্রস্তাবটি অনির্দিষ্টকাল রাজ্যগুলির কাছে পড়ে থাকবে।

(৫) কোন সংশোধনী প্রস্তাবে রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যের গভর্নরদের সম্মতি প্রয়োজন কিনা সে সম্পর্কে সংবিধান কিছু বলেনি। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে যে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের আগে বা অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি বা গভর্নরদের সম্মতির কোনও প্রয়োজন নেই।

(৬) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় গৃহীত হতে হয়। দুই-তৃতীয়াংশ বলতে মোট সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ বা উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশকে বোঝায়।

সমালোচনা ঃ মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির নিম্নলিখিত সমালোচনাগুলি উল্লেখযোগ্য—

(i) মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল হওয়ায় তা যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে সক্ষম নয়। কংগ্রেসের দুটি কক্ষে দুটি রাজনৈতিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলে যে কোনও সংশোধনী প্রস্তাবে দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তিন-চতুর্থাংশ রাজ্য আইনসভার সম্মতি আদায়ও খুব সহজ নয়। তাই অনেক সমালোচক সংবিধান সংশোধনের আরও সহজ পদ্ধতি প্রবর্তনের কথা বলেন।

(ii) অনুমোদনের জন্য সংশোধনী প্রস্তাবকে জনগণের কাছে পেশ করার বদলে রাজ্য আইন-সভাগুলির কাছে পেশ করাকে অনেকে অগণতান্ত্রিক মনে করেন।

(iii) সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব কংগ্রেস এবং ৩৭ টি বৃহৎ রাজ্যের আইনসভা (অর্থাৎ তিন-চতুর্থাংশ থেকে একটি কম) দ্বারা অনুমোদিত হলেও কোনও একটি সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকর হতে পারে না। অর্থাৎ ৫০ টি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে স্বল্প জনসংখ্যাবিশিষ্ট ছোট ১৩টি রাজ্যের আইনসভা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেকোনও সংশোধনী প্রস্তাবকে বাতিল করে দিতে পারে।

(iv) সংশোধনী প্রস্তাবে রাজ্য আইনসভাগুলির মতামত জ্ঞাপনের কোনও সময়সীমার উল্লেখ সংবিধানে না থাকায় অসুবিধা দেখা দেয়। কংগ্রেস সময়সীমা নির্ধারণ করে কোনও প্রস্তাব না নিলে সংশোধনী প্রস্তাব রাজ্য আইনসভাগুলির কাছে অনির্দিষ্ট কাল পড়ে থাকতে পারে।

মার্কিন সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটি জটিল ও কষ্টসাধ্য হওয়ায় দুশো বছরের বেশি সময়ের মধ্যে এটি মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হয়েছে। তবে বিচারালয়ের রায়, কংগ্রেস প্রণীত আইন, শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি এবং শাসক প্রধানের যোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে আমেরিকার সংবিধান সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে।

০৫.৬ ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা

ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলি উল্লেখযোগ্য ঃ

(i) ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত, কিন্তু আমেরিকার সংবিধান লিখিত।

(ii) ব্রিটেনের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় এই সংবিধানকে পরিবর্তনের জন্য কোনও জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতির মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করতে পারে। সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতি বলতে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্রিটেনের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোনও বিশেষ পদ্ধতি নেই। কিন্তু আমেরিকার সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সাধারণ আইন পাশের পদ্ধতিতে (অর্থাৎ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে) এই সংবিধানের পরিবর্তন সম্ভব নয়। আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন।

(iii) ব্রিটেনে সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা যায় বলে ব্রিটেনের সাংবিধানিক আইনের আলাদা কোনও মর্যাদা নেই। কিন্তু আমেরিকার সংবিধান সংশোধনের বিশেষ পদ্ধতি থাকায় আমেরিকার সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা সাধারণ আইনের ওপরে।

(iv) ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সার্বভৌম। তাই পার্লামেন্টের আইনগত ক্ষমতার ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। পার্লামেন্ট যে কোনোও আইন প্রণয়ন বা বাতিল করতে পারে। আদালতের পার্লামেন্টের আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আছে। সংবিধান বিরোধী বা ন্যায় নীতিবিরোধী যে কোনও আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। অর্থাৎ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের প্রাধান্য আর আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় বিচারবিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়।

(v) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি মানা হয় না। পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যরাই সেখানে মন্ত্রীসভা গঠন করে। রাজা বা রানিও একদিকে শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ অন্যদিকে পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। লর্ড চ্যান্সেলর একাধারে মন্ত্রীপরিষদের সদস্য, লর্ডসভার সভাপতি এবং বিচারালয়ের একজন বিচারপতি। পার্লামেন্ট অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করলে মন্ত্রীদের পদচ্যুত হতে হয়। মন্ত্রসভাও পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু মার্কিন সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আইন, শাসন ও বিচারের ক্ষমতা যথাক্রমে কংগ্রেস, রাষ্ট্রপতি ও সুপ্রিম কোর্টের হাতে। তিনটি বিভাগই একে অন্যের প্রভাব থেকে মুক্ত। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগ নিতে পারেন না, আইনসভার কাছে দায়িত্বশীলও নয়।

(vi) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমেরিকায় শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এখানে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা বন্টন করে দেওয়া হয়েছে, নিজ এলাকায় প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে কাজ করে। কারও অস্তিত্ব অন্যের ওপর নির্ভর করে না।

(vii) ব্রিটেনের রাজা বা রানি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ভোগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ক্যাবিনেট। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসক—উভয় ধরনের ক্ষমতাই ভোগ করেন।

(viii) ব্রিটেনে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ক্যাবিনেট প্রকৃত শাসনক্ষমতা ভোগ করে। প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত শাসক হিসাবে কাজ করার সময় ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের সহযোগিতা পান। কিন্তু প্রকৃত শাসক হিসাবে রাষ্ট্রপতির মত কেউ নেই। রাষ্ট্রপতি একক শাসক। রাষ্ট্রপতি কাজের সুবিধার জন্য ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়োগ করেন। কিন্তু ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের কোন সাংবিধানিক মর্যাদা নেই, তাঁরা রাষ্ট্রপতির ভৃত্যের মত। শাসনবিভাগের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতিকে একাকী বহন করতে হয়।

(ix) ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পার্লামেন্টারি, কিন্তু আমেরিকায় রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন প্রবর্তিত। তবে উভয় দেশেই উদারনৈতিক গণতন্ত্র এবং ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রচলিত। উভয় দেশেই দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা আছে এবং উভয় দেশেই জনগণের মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটেনের সংবিধান প্রথা ও রীতিনীতি নির্ভর হলেও সেখানে প্রথা ও রীতিনীতির পাশাপাশি কিছু লিখিত পার্লামেন্ট রচিত আইনও আছে যেগুলি সাংবিধানিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। আবার আমেরিকার সংবিধান লিখিত হলেও সেখানে কিছু অলিখিত প্রথা ও রীতিনীতি সাংবিধানিক গুরুত্ব লাভ করেছে। যেমন ক্যাবিনেট প্রথা। তাই উভয় সংবিধানের কিছু পার্থক্য থাকলেও কিছু মিলও আছে।

০৫.৭ সারাংশ

আলোচ্য এককে আমেরিকার সংবিধানের রচনা, তার ঐতিহাসিক পটভূমি, সংবিধানের বিকাশের বিভিন্ন দিক, সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও সংশোধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসাবে আমেরিকার ১৩ টি উপনিবেশ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিচালনা করে এবং ১৭৭৬ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৭৭ সালে তারা একত্রিত হয়ে রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসকরা তাদের স্বাধীনতা লাভ করার পর তারা রাষ্ট্রসমবায়ের দুর্বলতা ও অনৈক্য থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য নতুন সংবিধান রচনার জন্য ফিলাডেলফিয়ায় কনভেনশন ডাকে। ১৭৮৯ সালে আমেরিকার নতুন সংবিধান চালু করা হয়।

সংবিধানটি ছিল ক্ষুদ্র আকারের। পরে সংশোধন, বিচারের রায়, রীতিনীতি ও প্রথা, কংগ্রেস প্রণীত আইন ও রাষ্ট্রপতিদের সুযোগ্য নেতৃত্বের দ্বারা সংবিধানটি বিস্তৃত ও বিকশিত হয়।

আমেরিকার সংবিধানটি লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয়। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, জনগণের সার্বভৌমত্ব, যুক্তরাষ্ট্র, রাষ্ট্রপতির শাসন, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ইত্যাদি আমেরিকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্য।

আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন ব্যবস্থা জটিল। সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গারাজ্যগুলির অনুরোধে আহুত কনভেনশনে। সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয় যদি অঙ্গারাজ্যগুলির আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ সেই প্রস্তাব সমর্থন করে বা সংবিধান

সংশোধনের উদ্দেশ্যে অঙ্গারাজ্যগুলি দ্বারা আহুত কনভেনশনের তিন-চতুর্থাংশ সমর্থন করে। আমেরিকার সংবিধানটি দুষ্পরিবর্তনীয় এবং সংবিধান সংশোধনে রাজ্যগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয়েই উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশ। উভয় দেশেই নাগরিক অধিকার স্বীকৃত, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ও দুটি রাজনৈতিক দল উভয় দেশেই দেখা যায়। তবে আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি শাসন আর ব্রিটেনে সাংসদীয় শাসন। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটেন এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা। আমেরিকার সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় আর ব্রিটেনের অলিখিত ও সুপরিবর্তনীয়। তাই উভয় দেশের সংবিধানের মধ্যে পার্থক্যও বিস্তর।

আলোচ্য এককটি আপনাদের আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিসমূহ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করবে।

০৫.৮ প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। আমেরিকার সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমিকা আলোচনা করুন।

২। আমেরিকার সংবিধানের বিকাশের বিভিন্ন উপায়গুলি কী কী?

অথবা, কী কী উপায়ে আমেরিকার সংবিধান পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সঙ্গতি বিধানে সক্ষম হয়েছে?

৩। আমেরিকার সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৪। আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি আলোচনা করুন।

৫। ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের পার্থক্যগুলি দেখান।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক) কবে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়?

(খ) কবে আমেরিকার রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হয়?

(গ) কখন আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীন হয়?

(ঘ) কোন সালে আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান গৃহীত হয়?

(ঙ) আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয় কেন?

(চ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটি কিভাবে আমেরিকার সংবিধানে কার্যকর করা হয়েছে?

(ছ) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি বলতে কী বোঝেন? আমেরিকার সংবিধানে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি কিভাবে কার্যকর করা হয়?

(জ) আমেরিকার বিচারবিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলতে কী বোঝেন।

(ঝ) আমেরিকায় কি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হয়েছে? কিভাবে?

(ঞ) আমেরিকার সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির একটি সমালোচনা লিখুন?

(ট) ব্রিটেন ও আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় কী কী মিল দেখতে পাওয়া যায়?

০৫.৯ উত্তরমালা

১। ০১.২ দেখুন

২। ০১.৩ - এ উত্তর আছে।

৩। ০১.৪

৪। ০১.৫ দেখুন।

৫। ০১.৬

(ক) ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ সালে।

(খ) ১৭ ই নভেম্বর, ১৭৭৭ সালে

(গ) ১৭৮৩ সালে।

(ঘ) ১৭৮৯ সালে।

(ঙ) ০৫.৪-এর ৩নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(চ) ০৫.৪ - এর ৪নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(ছ) ০৫.৪ - এর ৫নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(জ) ০৫.৪ - এর ৮নং বৈশিষ্ট্যটি দেখুন।

(ঝ) হ্যাঁ। বাকি উত্তরের জন্য ০৫.৪ এবং ৯ নং বৈশিষ্ট্য দেখুন।

(ঞ) ০৫.৫ -এর সমালোচনা অংশ ৯১ পাতা থেকে যে কোনও একটি লিখুন।

(ট) ০৫.৬ অনুসরণ করুন।

০৫.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Munro, W.B : The Government of the United States.

২। Ogs, F.A. & Ray, P.O. : Essentials of America Government.

৩। Potter, Allen M : American Government and politics.

৪। Beard C.A. : American Government and Politics.

৫। অনাদিকুমার মহাপাত্র ঃ নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ০৬ ❑ আমেরিকার রাষ্ট্রপ্রতি ও কংগ্রেস

গঠন

০৬.১ উদ্দেশ্য
০৬.২ প্রস্তাবনা
০৬.৩ রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি
০৬.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি
০৬.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ক্রমবিকাশ
০৬.৬ কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
০৬.৭ কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী
কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা
০৬.৮ রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক
০৬.৯ সারাংশ
০৬.১০ প্রশ্নাবলী
০৬.১১ উত্তরমালা
০৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

০৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের স্থান, ক্ষমতা ও ভূমিকা সম্বন্ধে আপনাকে অবহিত করা। এককটি পড়ে আপনি আয়ত্ব করতে পারবেন—

- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি;
- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি;
- আমেরিকার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী, সীমাবদ্ধতা এবং তাঁর ক্ষমতার ক্রমাবিকাশ;
- মার্কিন কংগ্রেসের গঠন;
- মার্কিন কংগ্রেসের ক্ষমতা, কাজ ও সীমাবদ্ধতা;
- মার্কিন কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন পদ্ধতি;

- রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক

এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হলে আপনি আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

০৬.২ প্রস্তাবনা

১৭৮৯ -এ রচিত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনুযায়ী আমেরিকায় শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি আইনবিভাগীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি চার বছরের জন্য নির্বাচিত হল এবং দু-বারের বেশি নির্বাচিত হতে পারেন না। রাষ্ট্রপতিকে ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে পদচ্যুত করা যায়। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। অঙ্গারাজ্যের জনগণ নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের নির্বাচিত করেন এবং নির্বাপক সংস্থার সদস্যরা রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। দলপ্রথার উদ্ভবের ফলে এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাষ্ট্রপতির শাসন, আইন, অর্থ এবং জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতা আছে। রাষ্ট্রপতির ভূমিকাকে আলোচনা করা যায় চারভাবে—দলনেতা, রাষ্ট্রপ্রধান, জনগনের প্রতিনিধি এবং বিশ্ব রাজনীতির নিয়ামক হিসাবে। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অসীম হলেও রাষ্ট্রপতিকে একনায়ক বলা যায় না। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণগুলি হল কংগ্রেস, দলব্যবস্থা, জনমত, বিচারবিভাগ, আমলাতন্ত্র, শাসনতান্ত্রিক ও শাসনবহির্ভূত রীতিনীতি এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাসমূহ।

রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক ক্ষমতার পাশাপাশি সংবিধান বহির্ভূতভাবেও কিছু ক্ষমতা দেখা যায়। বিচারের রায়, কংগ্রেসের সমর্থন, দলব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সংকটে নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, জনমতের সমর্থন, সরকারি দায়দায়িত্বের প্রসার এবং বিভন্ন রাষ্ট্রপতিদের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার প্রসার ঘটিয়েছে।

কংগ্রেস জনপ্রতিনিধিসভা ও সেনেট নিয়ে গঠিত হয়। জনপ্রতিনিধিসভায় জনগণের প্রতিনিধি এবং সেনেটে রাজ্যের প্রতিনিধিরা থাকেন। কংগ্রেসের ক্ষমতা হল ঃ আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, বিচার সংক্রান্ত কাজ, শাসন সংক্রান্ত কাজ, নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধান, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত, যুদ্ধ এবং তথ্য সরবরাহ। নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধানে কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার আলোচনা আছে।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ফলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করে, কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে উভয়ের সম্বন্ধ সহযোগিতা মূলক।

০৬.৩ রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, কার্যকালের মেয়াদ ইত্যাদি

মার্কিন রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে নিম্নলিখিত যোগ্যতার অধিকারী হতে হয়-

(i) অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাভাবিক নাগরিক হতে হবে।

(ii) অন্তত ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।

(iii) অন্তত ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। এই বসবাসগত যোগ্যতাকে কেন্দ্র করে হার্বার্ট হুভারের রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় বিতর্ক ওঠে। হুভারে একাদিক্রমে ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করেননি। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে একাদিক্রমে ১৪ বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার প্রয়োজন নেই।

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ কতদিন হওয়া উচিত সে নিয়ে মতানৈক্য ঘটে। অনেকে ৭ বছর মেয়াদের কথা বলেন এবং পুনর্নির্বাচনের বিরোধিতা করেন। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ ৪ বছর করা হয়। কিন্তু সংবিধানে তাঁর পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে কিছু বলা হয়নি। রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি হতে অস্বীকার করলে তখন থেকে এই শাসনতান্ত্রিক রীতি গড়ে ওঠে যে রাষ্ট্রপতি দুবারের বেশি নির্বাচিত হতে পারবেন না। জেনারেল গ্রান্ট ও থিওডোর রুজভেল্ট এই রীতিটিকে উপেক্ষা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। গ্রান্ট রাষ্ট্রপতি হতে চাইলেও পদে নির্বাচিত হন। তবে ১৯৫১ সালে সংবিধানের ২২ তম সংশোধন দ্বারা সমস্যাটির সমাধান করা হয়েছে। ওই সংশোধন অনুসারে কোনও রাষ্ট্রপতি তৃতীয়বারের জন্য ওই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হওয়ার আগে তাঁর মৃত্যু হলে বা তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বা তাঁকে পদচ্যুত করা হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। তখন উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করেন। দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ, দুর্নীতিমূলক বা বেআইনি কাজের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত কার যেতে পারে। ইমপিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসারে কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিসভায় অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং সেনেট সেই অভিযোগের বিচার করে। এই বিচারের সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতি হিসাবে কাজ করেন। জনপ্রতিনিধিসভার অধিকাংশ সদস্য অভিযোগটি সমর্থন করার পর সেটি সেনেটে বিচারের জন্য যায়। সেনেটের উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ অভিযোগটি সমর্থন করলে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন।

রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ার পর উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি হন। কিন্তু তখন যদি উপরাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটে, বা তিনি পদত্যাগ বা পদচ্যুত হন তাহলে আবার রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হয়। এই শূন্যপদ পূরণের ব্যাপারে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ১৭৯২ সালে মার্কিন কংগ্রেস এই আইন রচনা করে এবং এই আইন অনুসারে তখন প্রতিনিধিসভার অধ্যক্ষ রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করবেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেস নতুন আইন করে। এই আইন অনুসারে উপরাষ্ট্রপতির পর সেক্রেটারি অফ স্টেট, তারপর প্রতিরক্ষা সচিব, তার পর অ্যাটর্নি জেনারেল প্রভৃতি রাষ্ট্রপতির কার্যভার গহণ করবেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কিছু সাংবিধানিক অব্যাহতি ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির কার্যকালে তাঁর বিরুদ্ধে দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা করা যাবে না, আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা যাবে না এবং কংগ্রেসের কোনও কমিটির সামনে তাঁকে হাজির হতে বাধ্য করা যাবে না। ইম্‌পিচমেন্ট ছাড়া অন্যভাবে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না।

০৬.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে তুমুল বাক্‌বিতন্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। অনেকে জনগন কর্তৃক রাষ্ট্রপতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের কথা বলেন। অনেকে আবার কংগ্রেস দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের কথা বলেন। সংবিধান প্রণেতারা দুটি প্রস্তাবের কোনওটিই গ্রহণ করেননি। প্রথম পদ্ধতিটি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতিকে সব সময় জনগনের সন্তুষ্টিবিধানে ব্যস্ত থাকতে হবে আর দ্বিতীয় পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতির কংগ্রেসের হাতের পুতুলে পরিণত হওয়ার এবং ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ক্ষুন্ন হওয়ার আশংকা ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত নির্বাচন সংস্থা দ্বারা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিশেষ পদ্ধতিটি সংবিধানে গৃহীত হয়।

সংবিধানের ২নং ধারায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতিটি আলোচিত হয়েছে। এই নির্বাচন পদ্ধতির দুটি পর্যায় আছে-প্রথম পর্যায় হল নির্বাচক সংস্থা গঠন এবং দ্বিতীয় পর্যায় হল নির্বাচক সংস্থায় সদস্যদের দ্বারা রাষ্ট্রপতির নির্বাচন। প্রথম পর্যায়ে-প্রত্যেক অঙ্গারাজ্যের নাগরিকরা নির্বাচক সংস্থার সদস্যদের নির্বাচন করেন। কংগ্রেসের উভয় কক্ষে অঙ্গারাজ্যের যতজন প্রতিনিধি আছে সেই অঙ্গারাজ্যের নাগরিকরা ততজন সদস্যকে নির্বাচিত করেন। তবে কংগ্রেসের কোনও সদস্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কর্মচারী নির্বাচক সংস্থার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হতে পারেন না। পঞ্চাশটি অঙ্গারাজ্য থেকে নির্বাচিত সব সদস্যদের নিয়ে নির্বাচনী সংস্থা গঠিত হয়। নভেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর প্রথম যে মঙ্গালবার আসে, সেই দিন নির্বাচক সংস্থার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করার জন্য ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়—পরবর্তী ডিসেম্বর মাসের প্রথম বুধবার পর প্রথম সোমবার প্রত্যেক অঙ্গ রাজ্যের নির্বাচক সদস্যরা নিজ নিজ অঙ্গারাজ্যে মিলিত হয়ে গোপন ভোটদান পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচনের জন্য ভোটদান করেন। সংবিধানের ২৩ তম সংশোধনের ফলে বর্তমানে নির্বাচক সদস্যরা নিজ নিজ জেলায় উপস্থিত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর ভোটবাক্সগুলিকে সিল করে ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। পরের বছর ৬ই জানুয়ারি সেনেটের অধ্যক্ষ সিনেট সদস্যদের সামনে ভোটপত্রগুলি গণনা করেন। যিনি নির্বাচক সংস্থার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট লাভ করেন, তিনি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে যদি কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পান তাহলে অধিক ভোট পেয়েছেন এমন অনধিক তিনজন প্রার্থীর মধ্যে থেকে একজনকে জনপ্রতিনিধিসভা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত করে।

দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ নির্বাচন কার্যত প্রত্যক্ষ নির্বাচন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নির্বাচক সংস্থার সদস্যরা দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হন বলে তাঁরা নিজ নিজ দলের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষেই ভোট দেন। তাই নির্বাচন সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাবি রাষ্ট্রপতি কে হবেন তা স্থির করা যায়। নির্বাচক সংস্থা দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন তাই আনুষ্ঠানিক হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতিটি জটিল, সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। তাছাড়াও এই পদ্ধতিতে বড় কয়েকটি রাজ্যের ভোটদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। ১৮টি অঙ্গরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে একজন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। আর একজন ৩২টি অঙ্গরাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও পরাজিত হতে পারেন। তাছাড়া দলব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে নির্বাচন আর পরোক্ষ নয়, প্রত্যক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেক সমালোচক জনগণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা বলেন।

০৬.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বিপুল সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইংল্যান্ডের রাজার মত রাজত্ব করেন, আবার ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীর মত শাসন করেন। রাষ্ট্রপতি একাধারে নিয়মতান্ত্রিক ও প্রকৃত শাসক। স্ট্রং-এর মতে, পৃথিবীর অন্য কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রপ্রধান দেখা যায় না। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই হলেন কেন্দ্রীয় চরিত্র। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি হলেন একক শাসক, ইংল্যান্ডের মত ক্যাবিনেট তাঁর সঙ্গে ক্ষমতা ও দায়িত্ব ভোগ করে না।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে নয় ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

(১) শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ঃ সংবিধানের ১(১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতির হাতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে প্রয়োগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতির শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতাকে আবার নিম্নোক্ত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

(ক) জাতীয় প্রশাসনের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি জাতীয় প্রশাসনের প্রধান হিসেবে শাসনবিভাগীয় নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণ, প্রশাসনিক আদেশ জারি, প্রশাসনিক কাঠামোর নিয়ন্ত্রণ ও বিন্যাস, বিভিন্ন বিভাগের কাজের সমন্বয়, প্রশাসনিক এজেন্সিগুলির তদারকি, বিভাগীয় কাজ সম্বন্ধে বিভাগীয় কর্মচারীদের কাছে লিখিত রিপোর্ট তলব, নির্দেশ অমান্যকারী বিভাগীয় কর্মচারীকে অপসারণ, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, বিদ্রোহদমন, নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ, আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি ক্ষমতাগুলি ভোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান, কংগ্রেস প্রণীত আইন, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের রায়, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ইত্যাদি ঠিকমত কার্যকর হচ্ছে কিনা তা রাষ্ট্রপতি দেখেন। প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি সেনাবাহিনী মোতায়েন করে শান্তিশৃঙ্খলা বলবৎ করতে পারেন।

(খ) নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কর্মচারীদের দুভাগে ভাগ করা হয়—উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ। বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান, কূটনৈতিক দূত, বিচারপতি, বাণিজ্যদূত, মন্ত্রী ইত্যাদি প্রথম শ্রেণির আর ব্যুরো প্রধান

ও অন্যান্য অধস্তন কর্মচারীরা দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত। প্রথম শ্রেণিভুক্ত কর্মচারীদের নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতিকে সেনেটের অনুমোদন নিতে হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত করেন সেনেট তা সাধারণত মেনে নেয়। একে ''সেনেটোরীয় সৌজন্যবিধি'' বলে। এ জাতীয় নিয়োগের আগে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সেনেটরদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নেন।

(গ) অপসারণের ক্ষমতা ঃ কর্মচারীদের অপসারণ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু লেখা ছিল না। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে এ নিয়ে বিতর্ক দেখা যায়। শেষে স্থির হয়, রাষ্ট্রপতি সেনেটের মতামত ছাড়াই এককভাবে কর্মচারীদের পদচ্যুত করতে পারবেন। ১৮৬৬ সালে কংগ্রেস আইন করে ঘোষণা করে যে রাষ্ট্রপতি সেনেটের সম্মতি ছাড়া কর্মচারীদের অপসারণ করতে পারবেন না। তবে ১৮৮৭ সালে এই আইন বাতিল হয়ে যায়। তাই বর্তমানে নিয়ম হল যে যেসব কর্মচারীদের জন্য রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকতে হয় তাদের তিনি এককভাবে অপসারণ করতে পারবেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি, যে সব কমিশনের সদস্যদের আংশিক আইন ও আংশিক বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা আছে এবং রাষ্ট্রকৃত্যক নিয়মাবলী অনুসারে নিযুক্ত কর্মচারীদের রাষ্ট্রপতি অপসারণ করতে পারবেন না।

(ঘ) সামরিক ক্ষমতা ঃ সংবিধান অনুসারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি সেনেটের অনুমোদনক্রমে সেনা ও নৌবাহিনীর অফিসারদের নিয়োগ করতে পারেন এবং যুদ্ধের সময় প্রয়োজনবোধে তাদের পদচ্যুত করতে পারেন। তত্ত্বগতভাবে কেবলমাত্র কংগ্রেস যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে। কিন্তু বাস্তবে রাষ্ট্রপতি এমনভাবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করেন যে কংগ্রেসের পক্ষে যুদ্ধঘোষণা ছাড়া উপায় থাকে না। আবার মার্কিন কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়া, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশে সৈন্য প্রেরণ করেছে। ১৯৭৪ সালে কংগ্রেস প্রণীত যুদ্ধক্ষমতা সম্পর্কিত আইন রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রাষ্ট্রপতি বৈদেশিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে সৈন্য পাঠালে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে কংগ্রেসকে জানাতে হয়। কংগ্রেস অনুমোদন না করলে ৬০ দিনের মধ্যে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিতে হবে। তবে যুদ্ধ অবসানের ক্ষেত্রে তাঁর একক ক্ষমতা আছে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে রাষ্ট্রপতির সামরিক ক্ষমতা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় তিনি 'নিয়মতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। সৈন্য সংখ্যা স্থির করা, সৈন্য প্রেরণ করা, অস্ত্রশস্ত্রের কৌশল ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি একাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে অধিকৃত যে কোনও অঞ্চলে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। বর্তমানে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটিস্থাপন, সামরিক জোটে অংশগ্রহণ ইত্যাদির ফলে রাষ্ট্রপতির সামরিক ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

(ঙ) বৈদেশিক ক্ষমতা ঃ সংবিধানে কোথাও রাষ্ট্রপতিকে বৈদেশিক নীতির একক নির্ধারক বলা হয়নি। কিন্তু কার্যত তিনিই পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি হলেন পররাষ্ট্র বিষয়ে জাতির একমাত্র প্রতিভূ এবং বিদেশি রাষ্ট্রগুলির কাছে জাতির একমাত্র প্রতিনিধি। রাষ্ট্রপতি অন্যান্য দেশের সঙ্গে সন্ধি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন, আবার ওই সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি বিদেশি রাষ্ট্রে পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রদূত, কন্সাল ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের নিয়োগ করেন এবং অন্যদেশের রাষ্ট্রদূত, কন্সালদের গ্রহণ

করেন। তাঁর রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও সন্ধিচুক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন নিতে হয়। ১৯১৯ সালে রাষ্ট্রপতি উইলসন কর্তৃক সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি সিনেট বাতিল করে দেয়। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লিগ অফ নেশনসে যোগ দিতে পারেনি।

রাষ্ট্রপতি সেনেটের অনুমোদনের ঝামেলা এড়ানোর জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা নিতে পারেন, যেমন প্রশাসনিক চুক্তি সম্পাদন। এজন্য সেনেটের অনুমোদনের প্রয়োজন নেই। অথচ ওই রকম চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধি চুক্তি কার্যকর করতে পারেন, যেমন অতলান্তিক সনদ, কবলার প্রোটোকল, জাপসম্রাটের সঙ্গে রুজভেল্টের 'ভদ্রলোকের চুক্তি'।

১৯৩৪ সালে 'পারস্পরিক বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন পাশ করে কংগ্রেস তিন বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিকে বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দেয়। পরে কয়েকবার এই সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়।

(২) **আইন বিষয়ক ক্ষমতা ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসৃত হওয়ায় তত্ত্বগতভাবে শাসনবিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির আইন সংক্রান্ত কোনও ক্ষমতা নেই। তত্ত্বগতভাবে তিনি কংগ্রেসের সদস্য হতে পারেন না, কংগ্রেসের কোনও কক্ষকে ভেঙে দিতে পারেন না, কংগ্রেসের বিতর্কে যোগ দিতে, কংগ্রেসের বিল উত্থাপন করতে বা ভোট দিতে পারেন না। আইন সংক্রান্ত দিক থেকে তাঁর ভূমিকার পর্যালোচনা করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন, ''স্বাভাবিক অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঈর্ষা করতে বাধ্য।'' কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে অবস্থা অন্যরকম। রীতিনীতি উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রপতি আইনবিষয়ে পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করেন।

(ক) বাণীপ্রেরণ ঃ সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে কংগ্রেসকে ওয়াকিবহাল করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় কিছু ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারেন। এই সংবাদপ্রধান ও সুপারিগুলিকে রাষ্ট্রপতির বাণী বলা হয়। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসে প্রেরিত বাণীর মধ্যে দলীয় নীতির ঘোষণা, আইন প্রণয়নের সুপারিশ, সরকারি কাজের মূল্যায়ন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। ১৮২৩ সালে রাষ্ট্রপতি মনরো প্রেরিত বাণীর মধ্যে 'মনরো ডকট্রিন', ১৯৪১ সালে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টর বাণীর মধ্যে তার পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতি স্থানলাভ করে।

রাষ্ট্রপতি প্রেরিত বাণী বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলি দ্বারা জনগণের নজরে আসে এবং তা জনমতকে প্রভাবিত করে। জনসমর্থন হারানোর ভয়ে কংগ্রেস সাধারণত রাষ্ট্রপতির বাণী উপেক্ষা করতে পারে না। তবে রাষ্ট্রপতির বাণী কংগ্রেসকে কতটা প্রভাবিত করবে তা নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার ওপর। রাষ্ট্রপতি লিখিত ও মৌখিক দু-ধরনের বাণী প্রেরণ করতে পারেন।

(খ) জরুরি অধিবেশন আহ্বান ও অধিবেশন মুলতুবি রাখা ঃ রাষ্ট্রপতি সাধারণত কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন না। তবে জরুরি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। তিনি তাঁর সুপারিশ গ্রহণে কংগ্রেসকে বাধ্য করতে পারেন না। তবে কংগ্রেসে তাঁর দলের গরিষ্ঠতা থাকলে বা জনমত তাঁর পক্ষে থাকলে তিনি কংগ্রেসকে নিজ অনুকূলে প্রভাবিত করতে পারেন। অধিবেশন মুলতুবি রাখার ব্যাপারে দু-কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হলে রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(গ) অর্ডিন্যান্স ও শাসনবিভাগীয় আদেশ জারি ঃ বর্তমানে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইনের সংখ্যা ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেস সব আইন বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করতে পারে না। আইনের মূল কাঠামো ও নীতিগুলি কংগ্রেস রচনা করে। আইনকে পরিপূর্ণ করার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়। আইনের ফাঁকগুলি পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি অর্ডিন্যান্স ও শাসনবিভাগীয় আদেশ জারি করতে পারেন। এগুলি আইনের মতই কার্যকরী।

(ঘ) 'ভিটো' প্রয়োগ ঃ কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত সংবিধান সংশোধনী বিল ছাড়া প্রতিটি বিলেই রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়। রাষ্ট্রপতি বিলটি সম্পর্কে তিন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন—(i) তিনি বিলে স্বাক্ষর প্রদান করতে পারেন। ফলে বিলটি আইনে রূপান্তরিত হয়। (ii) তিনি কোনও বিলে সম্মতি জানাতে অস্বীকার করতে পারেন। বিলে অসম্মতি জ্ঞাপনকে 'ভিটো' বলে। এক্ষেত্রে দশদিনের মধ্যে বিলটি যে কক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছিল সেই কক্ষে ভিটোসহ ফেরত পাঠাতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট বিলটি কংগ্রেসের উভয় কক্ষে পুনরায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হলে বিলটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়াই আইনে পরিণত হয়। (iii) রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর না করে বিলটি আটকে রাখতে পারেন। বিল প্রেরণের ১০ দিনের মধ্যে যদি কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে যায়, তাহলে সেই বিলটির মৃত্যু ঘটে। এই ব্যবস্থাকে পকেট ভিটো (Pocket Veto) বলে। ভিটো প্রয়োগ করে বা ভিটোর ভয় দিয়ে রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজকে প্রভাবিত করতে পারেন।

(ঙ) চাকুরি বিতরণ ঃ চাকুরি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিতরণের দ্বারা তিনি কংগ্রেসের অনেক সদস্যকে নিজ প্রভাবাধীন করতে পারেন। তাদের দিয়ে তিনি তাঁর পছন্দমত বিল কংগ্রেসে উত্থাপন করাতে পারেন।

(চ) দলব্যবস্থার উদ্ভব ঃ রাষ্ট্রপতি তাঁর দলের নেতা। দলীয় নেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের দলীয় সদস্যদের সাহায্যে প্রয়োজনীয় আইনের খসড়া কংগ্রেসে উপস্থাপিত করতে পারেন। কংগ্রেসে তাঁর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে এই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়।

(৩) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** রাষ্ট্রপতির অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি হল ঃ

(i) ১৯২১ সালের প্রণীত 'বাজেট ও হিসাবরক্ষা আইন' অনুসারে রাষ্ট্রপতি ব্যয়নির্বাহের জন্য কংগ্রেসের কাছে প্রয়োজনীয় অর্থ দাবি করতে পারেন। এই আইন অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন বিভাগের আনুমানিক ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে, হ্রাস করতে বা সংশোধন করতে পারেন।

(ii) তাঁকে সারা বছরের জন্য আনুমানিক আয়ব্যয়ের হিসাব কংগ্রেসের সামনে পেশ করতে হয়।

(iii) রাষ্ট্রপতি ব্যয়বরাদ্দের পরিপূরক দাবিও কংগ্রেসের কাছে উত্থাপন করতে পারেন। তবে কংগ্রেসকে দাবি অনুযায়ী বরাদ্দ মঞ্জুর করবে এমন কথা নেই। তবে রাষ্ট্রপতির দলভুক্ত সদস্যরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, তাহলে রাষ্ট্রপতির ব্যয়বরাদ্দ সহজেই কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে।

(iv) 'বাজেট ও হিসাবরক্ষা আইন' অনুসারে 'বাজেট ব্যুরো' গঠিত হয়। এর কাজ রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করা। ব্যুরোর ডাইরেকটর রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন এবং তাঁর অধীনে থেকে তাঁর নির্দেশেই কাজ করেন।

(৪) **বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** রাষ্ট্রপতির বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতাগুলি হল—

(i) রাষ্ট্রপতি সেনেটের অনুমোদন ক্রমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। তবে তাঁদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

(ii) সংবিধানের ২ (২) নং ধারা রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার প্রদান করেছে। ইম্‌পিচমেন্ট ছাড়া অন্য যে কোন অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীদের দণ্ডাদেশ রাষ্ট্রপতি স্থগিত রাখতে পারেন, হ্রাস করতে পারেন বা শাস্তির হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের আইনভঙ্গের জন্য শাস্তিপ্রাপ্তদের রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার আছে। অঙ্গরাজ্যের আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের তিনি ক্ষমাপ্রদর্শন করতে পারেন না। দণ্ড হওয়ার আগে, পরে বা কারাবাসকালীন সময়েও রাষ্ট্রপতি দণ্ডিত ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি ক্ষমা প্রদর্শন করলে তা বাধ্যতামূলক ভাবে কার্যকর হয়।

(৫) **জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতা ঃ** গৃহযুদ্ধ, অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধে বা অর্থনৈতিক সংকটে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে, রাষ্ট্রপতি সৈন্য পরিচালনা, যুদ্ধপ্রণালী ও রণকৌশল স্থির করেন এবং জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার বাধানিষেধ আরোপ করতে পারেন। কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের সময় অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উইলসন্ এবং অর্থনৈতিক মন্দার সময় রুজভেল্টের হাতে কংগ্রেস বিপুল পরিমাণ ক্ষমতা প্রদান করে।

(৬) **দলীয় নেতা হিসাবে ভূমিকা ঃ** দলনেতা হিসাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনের আগে রাষ্ট্রপতির দল জনগণের সামনে যে কর্মসূচী ঘোষণা করেন নির্বাচনে জয়লাভ করার পর সেই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা তাঁর দায়িত্ব। দল ও দলের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। সিনেট ও প্রতিনিধিসভায় তাঁর দলের প্রাধান্য থাকলে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রণ করতে তাঁর কোনও অসুবিধা হয় না। নিজ দলের জাতীয় সংগঠনের পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ভূমিকাই প্রধান। জাতীয় দলের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৭) **রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ভূমিকা ঃ** ইংল্যান্ডের রাজা বা রানির মত মার্কিন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বিশিষ্ট অভ্যাগতদের অভিবাদন জানান, জাতির পক্ষে বড়দিন বা 'ক্রিসমাস' উৎসবের আলোকবৃক্ষ প্রজ্জ্বলিত করেন।

(৮) **জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে ভূমিকা ঃ** রাষ্ট্রপতি জনগণের নেতা হিসাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন। তিনি হলেন জনগণের নৈতিক মুখপাত্র ও জনমানসের প্রতিনিধি। নেতা হিসাবে জনগণের আশা আকাঙ্খাকে রূপায়িত করেন রাষ্ট্রপতি। জনসমর্থনের ওপরই তাঁর ভাগ্য নির্ভর করেন।

(৯) **বিশ্ব রাজনীতিতে ভূমিকা ঃ** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতি থেকে দূরে থাকত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসাবে দেখা দেয় এবং বিশ্বরাজনীতিকে প্রভাবিত করার

জন্য সচেষ্ট হতে থাকে। বিশ্বে মার্কিন আধিপত্য স্থাপন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জকে মার্কিন স্বার্থে ব্যবহার, সমাজতন্ত্রের প্রসাররোধ ইত্যাদির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি সক্রিয় থাকেন। এজন্য তিনি একদিকে শক্তিজোট গঠন করেন এবং অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন।

রাষ্ট্রপতির প্রভূত ক্ষমতা থাকলে তাঁর প্রভাব নির্ভর করে দুটি বিষয়ের ওপর—

(i) সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল হলে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, নতুবা নয়।

(ii) রাষ্ট্রপতির যোগ্যতা, দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের ওপর তাঁর ক্ষমতা নির্ভরশীল। ওয়াশিংটন, লিঙ্কন, রুজভেল্ট, উইলসন, কেনেডি ইত্যাদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপতিদের ভূমিকা রাষ্ট্রপতির পদকে মর্যাদা প্রদান করেছে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা থাকলেও সেই ক্ষমতা অবাধ বা অনিয়ন্ত্রিত নয়। তিনি একনায়কের মত অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী নন। তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ফলে সরকারের তিনটি বিভাগের কোনওটিই অবাধ ক্ষমতার অধিকারী নয়। শাসনতান্ত্রিক ও শাসনবহির্ভূত বিভিন্ন বাধানিষেধ, কংগ্রেসের দ্বারা আরোপিত বাধা, দলব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, জনমতের চাপ, বিচারবিভাগের রায়, আমলাতান্ত্রিক বাধা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ইত্যাদি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ক্রমবিকাশ

সংবিধান স্বীকৃত ক্ষমতার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতি সংবিধান বহির্ভূতভাবে কিছু ক্ষমতা ভোগ করেন। সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রপতির হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দান করে তাঁর ওপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করেন। তাঁরা রাষ্ট্রপতির সীমাবদ্ধ রূপের কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবৃদ্ধি মার্কিন শাসনতন্ত্রের বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই শাসনবিভাগের ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়। অর্থনৈতিক সংকট, যুদ্ধবিগ্রহ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ইত্যাদি নানা কারণে সব রাষ্ট্রেই শাসনবিভাগের ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়েছে। এককেন্দ্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টারি বা রাষ্ট্রপতি শাসিত সব ব্যবস্থাতেই এই প্রবণতা দেখা যায়। ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের মত মার্কিন শাসনও এই প্রবণতামুক্ত নয়। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য হল—

(১) বিচার বিভাগের রায় ঃ সুপ্রিম কোর্ট রায় দানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রদান করেছে। যুক্তরাষ্ট্র বনাম কারটিস-রাইস এক্সপোর্ট কর্পোরেশন, ১৯৬৬ মামলায় পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতির অপ্রতিহত ক্ষমতা স্বীকৃত হয়েছে। মেয়ার্স বনাম যুক্তরাষ্ট্র, ১৯২৬ মামলায় রাষ্ট্রপতির অপসারণ সংক্রান্ত ক্ষমতাকে প্রায় নিরঙ্কুশ করা হয়।

(২) কংগ্রেসের ভূমিকা ঃ কংগ্রেস অর্থনৈতিক সংকট ও যুদ্ধকালীন অবস্থায় হস্তান্তরিত ক্ষমতার নিয়মনীতি অনুসারে অনেক বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছে। আমদানি-রপ্তানি শুল্ক নির্ধারণ, বাজেট তৈরি ও তা

কংগ্রেসে পেশ করার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কাছ থেকে পেয়েছেন। জাতীয় নেতা হিসাবে মর্যাদা, দলীয় নেতৃত্ব ইত্যাদির কারণে রাষ্ট্রপতিরা কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন।

(৩) দলব্যবস্থা ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বেড়েছে। রাষ্ট্রপতি দলীয় নেতা। তাঁর দলীয় সদস্যদের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দল কংগ্রেসের উভয় কক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা পেলে এই নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় হয়।

(৪) যুদ্ধ ও সংকট ঃ যুদ্ধ ও যুদ্ধের আশংকা মার্কিন রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। দেশের নিরাপত্তা ও সংকটে রাষ্ট্রপতির বাড়তি ক্ষমতার দাবি কংগ্রেস মেনে নিয়েছে।

(৫) জনমতের সমর্থন ঃ মার্কিন জনগণ রাষ্ট্রপতির মতকে জাতীয় মত বলে মনে করে। তাঁর নেতৃত্বের ওপর দেশবাসীর অগাধ আস্থা। এই আস্থার ফলে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি নির্ধারণ প্রভৃতি বিষয়ে যা সিদ্ধান্ত নেন, জনগণ তা সমর্থন করে। আমেরিকার ওপর ইসলামি জঙ্গিদের আক্রমণের (১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১) পর মার্কিন জনগণ পুরোপুরি রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন।

(৬) সরকারি দায়-দায়িত্বের প্রসার ঃ দেশের মধ্যে ও বাইরে সরকারের দায় দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। একদিকে দেশের মধ্যে সরকারি জনকল্যাণমূলক কাজ বেড়েছে, অন্যদিকে অকমিউনিস্ট জগতের নেতা ও এক নম্বর বিশ্বশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত হতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও বেড়েছে।

(৭) রাষ্ট্রপতি পদের ভূমিকা ঃ দৃঢ়চেতা রাষ্ট্রপতিদের ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভূমিকা রাষ্ট্রপতি পদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা, আর্থিক সংকটে রুজভেল্টের 'নিউ ডিল', কিউবার সংকটে জন কেনেডির সিদ্ধান্ত ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

০৬.৬ কংগ্রেসের গঠন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস। ভারত, সুইজারল্যান্ড, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের আইনসভার মত মার্কিন কংগ্রেসও দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ বা সিনেটে অঙ্গরাজ্যের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব থাকে, আর নিম্নকক্ষ বা প্রতিনিধিসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। অর্থাৎ উচ্চকক্ষে থাকে রাজ্যগুলির প্রতিনিধি আর নিম্নকক্ষে থাকে জনগণের প্রতিনিধি।

জনপ্রতিনিধিসভা (House of Representatives)

গঠন—এই কক্ষের আকার সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু বলা হয়নি। কেবলমাত্র জাতীয় প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতেই জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যরা দুই বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন বলে সংবিধানে লেখা আছে। সাধারণতঃ ৪,৮০,০০০ জনসংখ্যা পিছু একজন করে প্রতিনিধি এই কক্ষে নির্বাচিত হন। ভোটাধিকারের ভিত্তি স্থির করে অঙ্গরাজ্যগুলি। কোথাও

কর প্রদানকে, কোথাও শিক্ষাগত যোগ্যতাকে মাপকাঠি করা হত। ২৪তম সংবিধান সংশোধন অনুসারে, করপ্রদানে অক্ষমতার অজুহাতে এবং পঞ্চদশ ও ঊনবিংশ সংবিধান অনুসারে জাতি, নারীত্ব, বর্ণ ও পূর্ব দাসত্বের অভিযোগে কোনও নাগরিককে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সার্বিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন ১৮ বছর বয়স্ক যে কোনও সুস্থ মস্তিষ্ক নাগরিক জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যদের নির্বাচন করতে পারে।

জনপ্রতিনিধিসভায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থীর যোগ্যতা হল—(১) কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক; (২) অন্তত ৭ বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব; (৩) প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা; (৪) সরকারি পদে অধিষ্ঠিত না থাকা।

অধিবেশন চলাকালীন অবস্থায় দেওয়ানি অপরাধের জন্য তাঁদের গ্রেপ্তার করা যায়। কিন্তু সভার আলোচনার সময় সদস্যরা যে বক্তব্য রাখেন, সেজন্য তাদের কোনও শাস্তি দেওয়া যায় না।

জনপ্রতিনিধিসভার অধিবেশন বছরে অন্তত একবার আহ্বান করতে হয়। ৩রা জানুয়ারি সভার অধিবেশন আহূত হয় ও ৩১শে জুলাই পর্যন্ত তা চলে। একই সঙ্গে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময় বিশেষ প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধিসভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। জনপ্রতিনিধিসভার সদস্যরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে স্পিকার নির্বাচন করেন। তিনি সভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কয়েকটি কমিটির মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিসভার কার্যাবলী সম্পাদিত হয়।

সেনেট (Senate)—অঙ্গরাজ্যগুলি থেকে সমপ্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে সেনেট গঠিত হয়। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে দুই জন করে প্রতিনিধিকে সেনেটের সদস্য নির্বাচিত করা হয়। মোট ৫০টি অঙ্গরাজ্য থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি সেনেট সভায় থাকেন। সমপ্রতিনিধিত্ব দ্বারা ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব অঙ্গরাজ্যকে সমানভাবে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সংবিধান অনুসারে, কোনও অঙ্গরাজ্যের সম্মতি ছাড়া সেই রাজ্যকে সেনেটের সমপ্রতিনিধিত্বের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।

সেনেট সদস্য হতে গেলে প্রার্থীর যোগ্যতা হল—(১) অন্তত ৩০ বছর বয়স্ক; (২) কমপক্ষে ৯ বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং (৩) প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারী অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা।

প্রথমে অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভা সেনেট সদস্যদের নির্বাচিত করত। পরে সেনেটে নির্বাচনে দলীয়, প্রাধান্য ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে সেনেট সদস্যদের প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের দাবি ওঠে। ১৯১৩ সালে সংবিধানের সপ্তদশ সংশোধনের মাধ্যমে স্থির হয় যে, সেনেট সদস্যরা ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হবেন।

সেনেট ঃ স্থায়ী পরিষদ—সেনেটের প্রতিটি সদস্যের কার্যকাল ৬ বছর। প্রতি দুবছর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর নেন এবং এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচিত হয়। কোনও সময় যাতে শূন্য না হয়, তা দেখা হয়। সেনেটের সভায় সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্ট্রপতি। তিনি ভোটপ্রদান করেন। পক্ষে ও বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে তিনি নির্ণায়ক ভোট দেন। প্রতি বছর ৩রা জানুয়ারি সেনেটের অধিবেশন শুরু হয়। সেনেটও কয়েকটি কমিটির সাহায্যে কাজ করে।

০৬.৭ কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী

আমেরিকার সংবিধান প্রণেতারা ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ ও কংগ্রেস আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। কংগ্রেসের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হল ঃ—

(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ কংগ্রেসের প্রধান কাজ আইনপ্রণয়ন। কংগ্রেসের উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোনও বিল আইনে পরিণত হয় না। কোনও বিল নিয়ে উভয় কক্ষের মতপার্থক্য হলে উভয় কক্ষের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কনফারেন্স কমিটি তার মীমাংসা করে।

কংগ্রেসের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা দুধরনের—(ক) সাংবিধানিক—আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে সংবিধানপ্রদত্ত ক্ষমতা। (খ) অন্যান্য—শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, বিচারের রায়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আবার তিন ধরনের—(অ) অনুমিত ক্ষমতা—জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়ন; (আ) জরুরি ক্ষমতা—জরুরি অবস্থায় কাজ করার ক্ষমতা এবং (ই) অন্তর্নিহিত ক্ষমতা—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষমতা।

(২) সংবিধান সংশোধন ঃ সংবিধান অনুসারে কংগ্রেস উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বা দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহূত কনভেনশনে সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাসমূহের তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা বা ওই উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যগুলিতে আহূত কনভেনশনের তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা অনুমোদিত হলে ওই প্রস্তাব গৃহীত হয়। কংগ্রেস এককভাবে সংবিধান সংশোধন করতে না পারলেও তার সম্মতি ছাড়া সংবিধানের কোনও অংশেরই সংশোধন সম্ভব নয়।

(৩) নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি পদে কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে না পারলে জনপ্রতিনিধি সভা সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করে। একইভাবে সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্ত দুজনের মধ্য থেকে সেনেট উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত করে। ১৮০১ ও ১৮২৫ সালে জনপ্রতিনিধিসভা এবং ১৮৭৬ সালে সেনেট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

(৪) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ইম্‌পিচমেন্ট অভিযোগ এনে বিচার করতে পারে। জনপ্রতিনিধি সভা অভিযোগ আনে ও সেনেট তা বিচার করে। সেনেট দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রস্তাব গ্রহণ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পদত্যাগ করতে হয়।

কংগ্রেসের কোনও কক্ষের সদস্য না, এরূপ কোনও ব্যক্তি কংগ্রেসের কাজে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করলে বা বাধা দিলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ তাকে শাস্তি দিতে পারে। সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করলে সংশ্লিষ্ট কক্ষে কংগ্রেসের অবমাননার দায়ে সেই ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারে। মনে করলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে হাজতে রাখার জন্য সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মসকে নির্দেশ দেয়। যতদিন কংগ্রেসের অধিবেশন চলে ততদিনের জন্যই ব্যক্তিটিকে আটকে রাখা যায়।

(৫) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতিকে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন ছাড়া এই ক্ষমতা কার্যকর হয় না। সেনেটে অন্য দলের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে রাষ্ট্রপতির সন্ধিচুক্তি বা নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব যে কোনও মুহূর্তে বাতিল হয়ে যেতে পারে।

(৬) নির্দেশমূলক ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা ঃ কংগ্রেস প্রশাসনিক দপ্তর ও এজেন্সিগুলিকে গঠন করে। তাদের গঠনক্ষমতা ও কাজ সম্পর্কে সংবিধানে কিছু বলা নেই। কংগ্রেস আইনপ্রণয়ন করে তা স্থির করে। তাছাড়া এগুলির জন্য ব্যয় কংগ্রেসই অনুমোদন করে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া কোনও খরচ করা যায় না কংগ্রেস যে কোনও সময় আইন প্রণয়ন করে প্রশাসনিক দপ্তরগুলিকে তাদের কার্যাবলীর রিপোর্ট কংগ্রেসের সামনে পেশ করার নির্দেশ দিতে পারে।

(৭) প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ ঃ কংগ্রেসের সদস্যরা নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধি। তাদের স্বার্থ দেখা কংগ্রেসের কাজ। তাদের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে।

(৮) বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ঃ সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন মামলার রায়ে ঘোষণা করেছে যে আন্তঃরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে।

(৯) তদন্ত করার ক্ষমতা ঃ সেনেট শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে তদন্ত বা অনুসন্ধানের মাধ্যমে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। তদন্ত কমিটি গঠন করে সেনেট যে কোনও সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করে।

(১০) যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজ ঃ যুদ্ধ ঘোষণা, সামরিক বাহিনীগঠন, অভ্যুত্থান দমন ইত্যাদির দায়িত্ব কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতি যুদ্ধঘোষণা বা সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে পারেন না।

(১১) তথ্য সরবরাহ ঃ সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে কংগ্রেসে আলোচনা ও বিতর্কের সময় যে সব তথ্য ও সংবাদ পরিবেশিত হয়, তার দ্বারা জনগণ বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে পারে।

কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতো মার্কিন কংগ্রেস সার্বভৌম আইনসভা নয়। কংগ্রেসের ওপর নানা ধরনের নিয়ন্ত্রণ আছে—

(১) নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির জন্য এক বিভাগ অন্য বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শাসনবিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি নানাভাবে কংগ্রেসকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে—(ক) বাণীপ্রেরণ দ্বারা রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ করেন।

(খ) রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন এবং অধিবেশন মুলতুবি রাখার ব্যাপারে উভয় কক্ষের মতবিরোধ হতে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন।

(গ) কংগ্রেস আইনের মূল কাঠামো স্থির করে। আইনের ফাঁক পূর্ণ করার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় আদেশ জারী করতে পারেন। এগুলি আইনের মতই কার্যকরী।

(ঘ) রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনও বিল আইনে পরিণত হয় না।

(২) সংবিধান কংগ্রেসের ওপর কিছু বাধানিষেধ আরোপ করে, যেমন—কংগ্রেস এককভাবে সংবিধান করতে পারে না, কোনও অঙ্গরাজ্যের সম্মতি ছাড়া তার সীমানা বা সেনেটে তার প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা বদলাতে পারে না, নাগরিকদের সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারে না।

(৩) কংগ্রেস জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত কোনও ক্ষমতা ভোগ করে না। তবে মন্দা বা যুদ্ধের মোকাবিলার জন্য কংগ্রেস জরুরি আইন প্রণয়ন করতে পারে।

(৪) সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেস প্রণীত যে কোনও আইনের যাথার্থ বিচার করে। সংবিধান বা ন্যায়নীতি বিরোধী যে কোনও আইনকে বাতিল করে দিতে পারে।

(৫) স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কংগ্রেসকে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে আনে। নানা কারণে স্বার্থগোষ্ঠীর চাপের কাছে কংগ্রেস নতিস্বীকার করে।

(৬) অন্যান্য দেশের মত মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রেও আইনসভার থেকে শাসনবিভাগের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিন রাষ্ট্রপতির গুরুত্ব বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে প্রসারিত হয়েছে। ফলে কংগ্রেসের ক্ষমতার হ্রাস ঘটেছে।

০৬.৮ রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক

মার্কিন শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির জন্য প্রশাসনিক প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি, আইনবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে কংগ্রেস এবং বিচারবিভাগীয় কর্তৃপক্ষ হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট পৃথকভাবে কাজ করে। ইংল্যান্ডের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের মধ্যে যে গভীর যোগ আছে, মার্কিন শাসনব্যবস্থায় তা নেই। মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের সদস্য নন। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত রাখতে বা নিম্নকক্ষকে ভেঙে দিতে পারেন না। আবার খুশিমত আইনসভায় উপস্থিত হয়ে বিতর্ক বা আলোচনায় যোগদানের অধিকার তাঁর নেই। মার্কিন কংগ্রেসের কাছে রাষ্ট্রপতি দায়িত্বশীলও নন। কংগ্রেস অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে পারে না। আইন ও শাসনবিভাগ পৃথকভাবে নিজ বিভাগীয় দায়িত্ব সম্পাদন করেন। কিন্তু ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন শাসনব্যবস্থায় বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিও গৃহীত হয়েছে। তাই রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই বা একে অপরের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণমুক্ত, একথা ঠিক নয়।

বাস্তবে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি যে সকল পদ্ধতির সাহায্যে কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেন সেগুলি দুরকম—

(১) আনুষ্ঠানিক—সংবিধান স্বীকৃত পদ্ধতি হল আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি, তেমন কংগ্রেসে বাণী প্রেরণ, কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান, ভেটো প্রদান ইত্যাদি।

(২) অ-আনুষ্ঠানিক—সংবিধান বহির্ভূত পদ্ধতি, যেমন রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা, নিজস্ব লবি গঠন, জনমত গঠন ইত্যাদি।

পদ্ধতিগুলি নিম্নে আলোচিত হল ঃ

আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি—

(ক) বাণীপ্রেরণ—রাষ্ট্রপতির আইনপ্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে কোনও ক্ষমতা নেই। কিন্তু পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি এ ব্যাপারে ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করেন। সংবিধানের ২-সংখ্যক ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসেরগ কাছে দেশের অবস্থা সম্পর্কে বাণী পাঠাতে পারেন। এই বাণীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজনীয় আইনের সুপারিশ করেন। কংগ্রেস আইনপ্রণয়নের সময় এই সুপারিশগুলি অগ্রাহ্য করতে পারে না। রাষ্ট্রপতির বাণী নিয়ে কংগ্রেসের বিতর্ক সংবাদপত্র, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলির সাহায্যে দেশবাসী জানতে পারে। রাষ্ট্রপতি দেশবাসীর স্বার্থের প্রতীক। রাষ্ট্রপতির বাণী কংগ্রেস অগ্রাহ্য করলে জনমতের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে। তাই কংগ্রেস সাধারণত রাষ্ট্রপতির বাণী প্রত্যাখ্যান করে না।

(খ) কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান—রাষ্ট্রপতি আইনসভার অধিবেশন আহ্বান স্থগিত করতে পারে না। কিন্তু যে কোনও কক্ষের বা উভয় কক্ষের বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যে বিষয়ে এই বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করেন, কংগ্রেসকে সে বিষয়ে আলোচনা করতে হয়। অধিবেশন স্থগিত করার ব্যাপারে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ হলে রাষ্ট্রপতি নিজ বিবেচনা মত অধিবেশন স্থগিত করেন।

(গ) রাষ্ট্রপতির ''ভেটো'' ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোনও বিল আইনে পরিণত হয় না। কংগ্রেস দ্বারা গৃহীত যে কোনও বিল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠালে রাষ্ট্রপতি তাতে স্বাক্ষর দিতে পারেন, স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করতে পারেন বা স্বাক্ষর দান স্থগিত রাখতে পারেন। স্বাক্ষর দিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করাকে ''ভেটো'' প্রয়োগ বলে। ভেটো প্রয়োগ করলে বিলটি আইনে পরিণত হয় না। কিন্তু ১০ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতিকে বিলটি কংগ্রেসে ফেরত পাঠাতে হয়। কংগ্রেসের প্রত্যেক কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে বিলটি পুনরায় অনুমোদিত হলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর ছাড়াই তা আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির কাছে প্রেরিত বিল দশ দিনের মধ্যে স্বাক্ষরিত না হলে এবং ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে গেলে বিলটির মৃত্যু হয়। এইভাবে ভেটো দান স্থগিত রাখাকে পকেট ভেটো বলে। ভেটো দেওয়ার ভয় দেখিয়ে কংগ্রেসকে রাষ্ট্রপতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আগে থেকেই রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রযুক্ত হবে জানতে পারলে কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির পছন্দ অনুসারে বিলটির পুনর্বিন্যাস করে থাকে। এই ভেটো ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে তৃতীয় কক্ষে পরিণত করেছে।

অ-আনুষ্ঠানিক—

(১) দলব্যবস্থার উদ্ভব—রাষ্ট্রপতি দলীয় নেতা। কংগ্রেসের উভয় কক্ষেই রাষ্ট্রপতির দলের সদস্য থাকে। রাষ্ট্রপতি দলীয় সদস্যদের মাধ্যমে তাঁর ঘোষিত নীতি ও সিদ্ধান্তকে কার্যকর করেন। কংগ্রেসের দুটি কক্ষে তাঁর দলের সদস্যরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলে রাষ্ট্রপতির প্রয়োজন মতো আইন প্রণয়ন করতে কোনও অসুবিধা হয় না।

(২) পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন—রাষ্ট্রপতি চাকরি ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা বিতরণের মাধ্যমে কংগ্রেসের সদস্য নিজ পক্ষে নিয়ে আসতে পারেন। বিশেষ করে প্রভাবশালী সদস্যদের তিনি এইভাবে করতে পারেন।

(৩) ব্যক্তিগত যোগাযোগ—রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য ও কমিটি সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে চলেন। কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এই

ধরনের আলোচনার ফলে কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক সহজ হয় এবং রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হন। তবে রাষ্ট্রপতি নিজের দল ও বিরোধী দল—সব সদস্যদের সঙ্গেই আলোচনা করে থাকেন।

(৪) জনমত গঠন—বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির আইনের প্রস্তাব জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। এইভাবে রাষ্ট্রপতি জনমতকে প্রভাবিত করে কংগ্রেসকে প্রভাবিত করতে পারেন। কংগ্রেস জনসমর্থন হারানোর ভয়ে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাকে মানতে বাধ্য হয়।

(৫) রাষ্ট্রপতির লবি—যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের কর্মচারীরা হলেন রাষ্ট্রপতির 'লবি'। তাঁরা রাষ্ট্রপতির অধীনে কাজ করেন। রাষ্ট্রপতির কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার জন্য ওই লবি সাহায্য করে। এই লবির সাহায্যে তিনি কংগ্রেসকে প্রভাবিত করেন।

(৬) ব্যক্তিগত আবেদন—অনেক সময় রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করে কাজ সম্পাদনের চেষ্টা করেন। রাষ্ট্রপতির আবেদনকে কংগ্রেস সহজে প্রত্যাখ্যান করে না।

(৭) আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব—বর্তমানে আইনপ্রণয়নের কাজটি জটিল ও বিশেষজ্ঞের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমলাতন্ত্রের মধ্যেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া যায়। তাই কংগ্রেসের সদস্যরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অনেক সময় কংগ্রেস আইনের খুঁটিনাটি বিষয় প্রণয়নের দায়িত্ব শাসনবিভাগকে সমর্থন করে। এইভাবে সংবিধান বহির্ভূত পথে কংগ্রেসের আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা আমলাতন্ত্রের হাতে আসে। আমলাতন্ত্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ পান।

(৮) রাষ্ট্রপতির নেতৃত্ব—রাষ্ট্রপতি জাতির নেতা। কংগ্রেসের নেতৃত্ব বহুজনের হাতে ন্যস্ত। রাষ্ট্রপতি দ্রুত কাজ করতে পারেন। বহুজনের হাতে নেতৃত্ব থাকায় কংগ্রেস দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। ফলে যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইত্যাদি সময়ে মার্কিন জনগণ কংগ্রেসের বদলে রাষ্ট্রপতির ওপর বেশি নির্ভর করে। ফলে রাষ্ট্রপতির বিভিন্ন ক্ষমতা (আইন প্রণয়ন ক্ষমতাসহ) বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা এতক্ষণ রাষ্ট্রপতি কিভাবে কংগ্রেসের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তা আলোচনা করলাম। কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। রাষ্ট্রপতি যাতে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত না হন তার ব্যবস্থাও আছে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির মধ্যে। কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে নিম্নলিখিত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে—

(১) ব্যয়বরাদ্দের দাবি—রাষ্ট্রপতি বাজেট তৈরি করেন। কিন্তু কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়া তা কার্যকর হয় না। কংগ্রেস ব্যয়বরাদ্দ মঞ্জুর করে। রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের কাছে যে ব্যয়বরাদ্দের দাবি করেন, কংগ্রেস তা মেনে নাও নিতে পারে। অনেক সময়ই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতির ব্যয়বরাদ্দের দাবি কমিয়ে দেয়।

(২) সন্ধি চুক্তি ও নিয়োগ—রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের বিনা সম্মতিতে কোনও সন্ধিচুক্তি বা নিয়োগ কার্যকর করতে পারেন না।

(৩) ইম্‌পিচমেন্ট—কংগ্রেসে প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে 'ইম্‌পিচমেন্ট' আনতে পারে।

(৪) ভেটো নাকচ—কংগ্রেস কর্তৃক প্রণীত বিলে রাষ্ট্রপতি ভেটো দিলে তার কারণ জানিয়ে ১০ দিনের মধ্যে তিনি বিলটি কংগ্রেসে ফেরত পাঠাতে বাধ্য। এরপর কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিলটি পুনরায় গ্রহণ করলে তা রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়াই আইনে পরিণত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির ফলে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের ক্ষমতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হলেন দেশ ও জাতির প্রতিনিধি। কংগ্রেসের সদস্যরা হলেন আঞ্চলিক প্রতিনিধি। তাই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য থাকতে পারে। উভয়ের মধ্যে বিরোধও মাঝে মাঝে ঘটে। আবার উভয়ের মধ্যে সহযোগিতাও দেখা যায়।

০৬.৯ সারাংশ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস যথাক্রমে শাসন ও আইনবিভাগের ক্ষমতা ভোগ করেন। সংবিধানে রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা, কার্যকাল, পদচ্যুতি ও নির্বাচন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতির মৃত্যু হলে বা রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে বা রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হলে উপরাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি হলেন একক শাসক এবং অসীম ক্ষমতার অধিকারী। শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রপতি আইন, অর্থ, জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি দলের নেতা, রাষ্ট্রপ্রধান, জনগণের প্রতিনিধি এবং বিশ্বারাজনীতির নিয়ামক। তবে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতির দ্বারা তাঁর ক্ষমতা নানাভাবে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে।

তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান বহির্ভূত কিছু কিছু ক্ষমতাও যুক্ত হয়েছে। যেমন—বিচারের রায়, কংগ্রেস প্রণীত আইন, দলব্যবস্থা, যুদ্ধ ও সংকটকালীন পরিস্থিতি, জনমতের সমর্থন, সরকারি দায়দায়িত্ব বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রপতিদের ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির মাধ্যমে।

জনপ্রতিনিধিসভা ও সেনেট নিয়ে কংগ্রেস গঠিত হয়। কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ নানা ক্ষমতার মধ্যে আছে—আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা, শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলী, নির্দেশদান ও তত্ত্বাবধান, প্রতিনিধিত্ব, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, তদন্ত, যুদ্ধ ও তথ্য সরবরাহ সংক্রান্ত কাজ। তবে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি দ্বারা কংগ্রেসের ক্ষমতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতাও আরোপিত হয়েছে।

কংগ্রেসে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত পদ্ধতিটি সংবিধানে আলোচিত হয়েছে। দুই কক্ষে গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পরই আইনে পরিণত হয়। রাষ্ট্রপতির ভেটো ক্ষমতা আছে।

রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। কংগ্রেসও রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। উভয়ের মধ্যে বিরোধও মাঝে মাঝে ঘটে। তা সত্ত্বেও উভয়ের সম্বন্ধ সহযোগিতামূলক।

০৬.১০ প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করুন।

২। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী ও ভূমিকা আলোচনা করুন।

৩। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উপাদানগুলি কী কী?

৪। মার্কিন কংগ্রেসের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৫। কংগ্রেসের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগুলি কী কী?

৬। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(ক)রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ কত বছর? তিনি কতবার নির্বাচিত হতে পারেন?

(খ)রাষ্ট্রপতির 'ইম্‌পিচমেন্ট' পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

(গ)রাষ্ট্রপতির 'ভেটো' প্রয়োগ ক্ষমতা আলোচনা করুন।

(ঘ)রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন কেন পরোক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে?

(ঙ)রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার কী কী সীমাবদ্ধতা আছে?

(চ) জনপ্রতিনিধিসভা কীভাবে গঠিত হয়?

(ছ)সেনেট কীভাবে গঠিত হয়?

(জ) কংগ্রেস কীভাবে রাষ্ট্রপতিকে নিয়ন্ত্রণ করে?

০৬.১১ উত্তরমালা

১। ০৬.৪ দেখুন।

২। ০৬.৫ দেখুন।

৩। ০৬.৫ দেখুন।

৪। ০৬.৬ ও ০৬.৭ দেখুন।

৫। ০৬.৭ দেখুন।

৬। ০৬.৮ দেখুন।

(ক) ০৬.৩ দেখুন। (খ) ০৬.৩ এ ৯৯ পাতা। (গ) ০৬.৫ এ ১০৪ পাতা। (ঘ) ০৬.৪ এ উত্তর খুঁজুন। (ঙ) ১০৬ পাতা দেখুন। (চ) ০৬.৬ দেখুন। (ছ) ০৬.৬ এ উত্তর আছে। (জ) ০৬.৭ এ পাতা ১১০।

০৬.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১। Brownlow, L—The President and Presidency.

২। Lorki, H.G.—The American Presidency.

৩। Munro—The Govt. of the United States.

৪। Ogg. FA & Ray, P.O.—Essentials of American Govt.

৫। Hayman, S—The American President.

৬। Potter, Allen M—American Govt. of Politics.

৭। মহাপাত্র, অনাদিকুমার—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ০৭ ❑ আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট

গঠন

০৭.১ উদ্দেশ্য

০৭.২ প্রস্তাবনা

০৭.৩ সুপ্রিম কোর্টের গঠন, বিচারপতিদের যোগ্যতা, কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি

০৭.৪ সুপ্রিম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা

০৭.৫ সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা

০৭.৬ সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

০৭.৭ সারাংশ

০৭.৮ প্রশ্নাবলী

০৭.৯ উত্তরমালা

০৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

০৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা। এককটি পড়লে আপনার গোচরে আসবে—

- সুপ্রিম কোর্টের গঠন, বিচারপতিদের যোগ্যতা, কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি।
- সুপ্রিম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা।
- সুপ্রিম কোর্টের বিভিন্ন ভূমিকা।
- সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা ও মূল্যায়ন।

০৭.২ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। মার্কিন বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান। সংবিধান বিচারপতিদের সংখ্যা স্থির করে দেয়নি। মাঝে মাঝে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে বিচারপতিদের

সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে প্রধান বিচারপতি ও আটজন সহকারী বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়। সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদনক্রমে বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। বিচারপতিদের যোগ্যতা বা কার্যকাল সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু লেখা নেই। ফলে রাষ্ট্রপতি নিজ দলের মধ্য থেকে বিচারপতি নিয়োগ করতে পারেন। তবে রাষ্ট্রপতির দলের সমর্থক নন, এমন বিচারপতির নজিরও দেখা যায়। বিচারপতিরা সাধারণত ব্যবহারজীবী হন। বিচারপতিরা একবার নিযুক্ত হলে আমৃত্যু পদে বহাল থাকেন। আসদাচরণের জন্য ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে তাঁদের পদচ্যুত করা যায়।

সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকায় মামলা সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের কাছে যায়। কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত মামলা বা যে মামলায় কোন একটি অঙ্গরাজ্য পক্ষ থাকে, সেইসব মামলা সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকায় বিচার্য। তাছাড়াও আপিলের মাধ্যমে অধস্তন আদালত থেকে মামলা সুপ্রিম কোর্টের আপিল এলাকায় আনা যায়।

সুপ্রিম কোর্ট একাধারে সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা, নাগরিক অধিকারের সংরক্ষক, সংবিধানের বিকাশে সহায়ক, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বৃধ্বিকারক এবং নীতি নির্ধারণকারী। আমেরিকার জাতীয় জীবনে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

০৭.৩ সুপ্রিম কোর্টের গঠন, বিচারপতিদের যোগ্যতা, কার্যকাল ও অপসারণ পদ্ধতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সংখ্যা সংবিধান নির্দিষ্ট করে দেয়নি। কংগ্রেস আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিচারপতিদের সংখ্যা স্থির করে। প্রথমে ১৭৮৯ সালে প্রণীত বিচারব্যবস্থা সম্পর্কিত আইন অনুসারে ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৫ জন অন্যান্য বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয়। ১৮০৭ সালে বিচারপতিদের সংখ্যা বাড়িয়ে ৭ জন করা হয়। ১৮৬৯ সালে কংগ্রেস আইন প্রণয়ন করে বিচারপতিদের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়। তখন থেকে সুপ্রিম কোর্ট ১ জন প্রধান বিচারপতি ও ৮ জন সহকারী বিচারপতি নিয়ে গঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা সেনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের অনুমোদন ক্রমে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিযুক্ত হন। বিচারের সময় অন্তত ৬ জন বিচারপতির উপস্থিতি প্রয়োজন। সংখ্যাগরিষ্ঠ বিচারপতিদের সমর্থনে সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বিচারপতিদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংবিধানে কিছু লেখা নেই। বিচারপতিদের যে ব্যবহারজীবী হতে হবে তাও নয়। তবে সাধারণত ব্যবহারজীবীদের মধ্য থেকেই বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট যোগ্যতার নির্দেশ না থাকায় সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি নিয়োগের সময় রাজনৈতিক প্রভাব কার্যকরী হতে দেখা যায়। রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন নিজ

দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই বিচারপতি নিয়োগ করতেন। পরবর্তী রাষ্ট্রপতিরাও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। তবে রাষ্ট্রপতির দলের দলের লোক নন, এমন বিচারপতিরও দৃষ্টান্ত আছে।

সংবিধান বিচারপতিদের কার্যকাল নির্দিষ্ট করে দেয়নি। তাই একবার নিযুক্ত হলে বিাচরপতিরা আমৃত্যু স্বপদে বহাল থাকেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনও বিচারপতি দশ বছর পর বা ৭০ বছর বয়সে পুরো বেতনসহ অবসর গ্রহণ করতে পারেন।

দেশদ্রোহিতা, উৎকোচগ্রহণ বা অন্য কোন ধরনের অসদাচরণের জন্য ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতির সাহায্যে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করা যায়। অসদাচরণের অভিযোগটি প্রথমে জনপ্রিতিনিধিসভায় পেশ করতে হয়। তারপর তা সেনেটে উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনে অনুমোদিত হতে হয়।

০৭.৪ সুপ্রিম কোর্টের এলাকা ও ক্ষমতা

মার্কিন সংবিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের দু-ধরনের এলাকা আছে—**(১) মূল এলাকা**—মূল এলাকার মামলাগুলি সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের কাছে যায়। সংবিধানে ৩ [২(২)] নং ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রদূত বা অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি ও কনসাল সম্পর্কিত মামলা কিংবা যে মামলায় কোনও অঙ্গরাজ্য পক্ষ থেকে, সেইসব মামলা সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকায় অন্তর্ভুক্ত। ফলে মূল এলাকায় চার ধরনের মামলা হতে পারে—(ক) কোনও অঙ্গরাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে মামলা; (খ) অঙ্গরাজ্যের সঙ্গে অঙ্গারাজ্যের মামলা; (গ) রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত মামলা; (ঘ) এক অঙ্গরাজ্যের নাগরিকের সঙ্গে অন্য কোনও অঙ্গারাজ্যের নাগরিক বা বিদেশির মামলা এবং কংগ্রেস আইনপ্রণয়নের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকা হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারে না।

(২) আপিল এলাকা—সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ মামলার বিচার হয় আপিল আদালতে। অধস্তন যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রীয় আপিল আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যেতে পারে। যুক্ত রাষ্ট্রের স্বার্থ জড়িত আছে এমন সব অঙ্গারাজ্যের আদালতের মামলার রায়ের বিরুদ্ধেও সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়। সুপ্রিম কোর্ট সাধারণত আপিলের অনুমতিদানের জন্য উৎপ্রেষণ ও লেখ জারি করে থাকে।

আইনপ্রণয়ন করে কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টের মূল এলাকার বৃদ্ধি করতে না পারলেও আপিল এলাকার পরিধি বাড়াতে পারে। নিম্ন আদলতের বা ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায় না। অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতে বিচারের পরই সুপ্রিম কোর্টে মামলা আনা যায়। যে সব মামলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়, সেইসব রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়।

০৭.৫ সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই ভূমিকা প্রধানত পাঁচ দিক থেকে আলোচিত হতে পারে ঃ

(১) সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকর্তা হিসাবে ভূমিকা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় এখানে সংবিধানের প্রাধান্য দেখা যায়। মার্কিন সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। সরকারের শাসন আইন ও বিচারবিভাগকে সংবিধানের নির্দেশানুসারে নিজ নিজ সাংবিধানিক ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সংবিধান বিরোধী বা ন্যায়নীতি বিরোধী কোনও কাজ করলে সুপ্রিম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বলা হয়।

সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার দুটি দিক আছে—(ক) সংবিধান বিরোধী হলে আইনসভা প্রণীত যে কোনও আইন বা শাসনবিভাগের যে কোনও আদেশ, নির্দেশ ও কাজকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে।

(খ) 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসৃত হচ্ছে কিনা সুপ্রিম কোর্ট সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখে। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধন অনুসারে, 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার কোনও ব্যক্তিকে তার স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না। চতুর্দশ সংশোধনের মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলির সরকারগুলির ওপরও অনুরূপ বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছে। 'আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি' অনুসারে বিচার করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট কেবলমাত্র আইনটি সংবিধানসম্মত পদ্ধতিতে প্রণীত হয়েছে কিনা তার বিচার করে না, আইনটি স্বাভাবিক ন্যায়নীতিবোধ বিরোধী যে কোনও আইনকে সুপ্রিম কোর্ট বাতিল ঘোষণা করতে পারে। অন্য কোনও দেশের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায়নীতি বিরোধী বলে কোনও আইনকে বাতিল করতে পারে না।

বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতার জোরে সুপ্রিম কোর্ট একটি শক্তিশালী তৃতীয় কক্ষে পরিণত হয়েছে। সংবিধান প্রণেতারা সুপ্রিম কোর্টকে বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রদান করে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বিরোধিতা করেছেন বলে অনেক সমালোচক মনে করেন। তবে এই সমালোচনা অনেকে মানেন না। হ্যামিল্টনের মতে, সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের ক্ষমতা হল আদালতের যুক্তিসঙ্গত ও বিশেষ ক্ষমতা। ১৮০৩ সালে মারবারী বনাম ম্যাডিসন মামলার রায়দান প্রসঙ্গে বিচারপতি মার্শাল বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হল দেশের সর্বোচ্চ আইন। তাই এর অবস্থান আইনসভা প্রণীত আইনের ঊর্ধ্বে। বিচারপতিরা যেহেতু সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য শপথ নেন, তাই স্বাভাবিক ভাবেই আইনসভা প্রণীত আইনের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা তাঁদের আছে। যে কোনও সংবিধানবিরোধী আইনকে তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বাতিল করে দিতে পারেন। এই ক্ষমতাকে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয়

বা কংগ্রেস প্রণীত আইনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য আইনসভা প্রণীত আইন, রাজ্য সরকারের কাজ এবং রাজ্যের সংবিধানকেও বাতিল করে দিতে পারে।

(২) নাগরিক অধিকার সংরক্ষণে ভূমিকা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টকে ''নাগরিক অধিকার সমূহের সংরক্ষক'' বলা হয়। মূল সংবিধানে নাগরিক অধিকারের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নাগরিকরা যে সকল অধিকার ভোগ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, ধর্মের অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা ইত্যাদি। সংবিধানের নবম সংশোধনে বলা হয়েছে যে সংবিধানে বর্ণিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকরা স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধন অনুসারে কোনও অঙ্গরাজ্য নাগরিকদের সুযোগসুবিধা বা অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারবে না। তাছাড়া আইনের যথাবিহিত পদ্ধতি ছাড়া কোনও ব্যক্তিকে তার জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।

মার্কিন নাগরিকদের ওইসব অধিকার রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের হাতে অর্পণ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্বপালন করে। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইনসভার বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোনও আদেশ বা নির্দেশকে নাগরিক অধিকার বিরোধী মনে করলে সুপ্রিম কোর্ট সেগুলিকে বাতিল করে দিতে পারে।

সুপ্রিম কোর্ট এই নাগরিক অধিকার রক্ষার দায়িত্ব অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে পালন করে আমেরিকায় গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। কিন্তু সমালোচকরা মনে করেন যে সুপ্রিম কোর্ট শ্রমজীবী নাগরিকদের অধিকার রক্ষার বদলে কার্যত ধনী বণিক শ্রেণির স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষায় বেশি মনোযোগী। ১৮৯৫ সালে পোলক বনাম ফারমার্স লোন অ্যান্ড ট্রাস্ট কোম্পানির মামলায় আয়কর ধার্য করাকে সম্পত্তিশালীদের ওপর অত্যাচার বলে সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করে। ১৯০৫ সালে লোচ্‌নার বনাম নিউ ইয়র্কের মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলে যে শ্রমিকের কাজের সময়সীমা নির্ধারণের কোনও ক্ষমতা সরকারের নেই। এরূপ করার অর্থ শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতাকে খর্ব করা। এইভাবে সুপ্রিম কোর্ট শ্রমিক শোষণের রাস্তা দেখায়। দীর্ঘকাল ধরে সুপ্রিম কোর্ট সাধারণ মানুষের স্বার্থ ও অধিকার বিরোধী অনেক রায় প্রদান করেছে।

(৩) সংবিধানের সম্প্রসারণে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণেতারা সংক্ষিপ্ত সংবিধানে শাসন পরিচালনার মূল নীতিসমূহ লিপিবদ্ধ করে সংবিধান ব্যাখ্যার দায়িত্ব বিচারবিভাগের হাতে অর্পণ করেছিলেন। বিভিন্ন সময়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংবিধানের প্রায় প্রতিটি ধারাকে সুপ্রিম কোর্টের কাছে উপস্থিত করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারার ব্যাখ্যা প্রদান করে কার্যত সংবিধানের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট কংগ্রেসের হাতে 'অনুমিত ক্ষমতা' বলে আইন প্রণয়নের

ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতির হাতে সরকারি কর্মচারীদের পদচ্যুত করার ক্ষমতা ইত্যাদি প্রদান করেছে, যা মূল সংবিধানে ছিল না।

(৪) কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা—ঊনবিংশ শতক থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রায়দান করে কার্যত তার ক্ষমতাবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। অনেক মামলায় সুপ্রিম কোর্ট এই অভিমত ব্যক্ত করে যে জাতিগঠন ও সমাজকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের জন্য কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে। বিাচরপতি মার্শাল কেন্দ্রের অনুমিত ক্ষমতা প্রসঙ্গে বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষমতার অধিকারী হলেও সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতার বাইরেও কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। কেন্দ্রীয় সরকারকে তার কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যেসব ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি ছাড়াও যা কিছু অপরিহার্য, তা সম্পাদনের ক্ষমতা কেন্দ্রের আছে। এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার রেলপথ, জলপথ, মোটর ও বিমানপথে দ্রব্য চলাচল নিয়ন্ত্রণ করার অধিকারী। এইভাবে কেন্দ্রের ক্ষমতা সংবিধান বহির্ভুত পথে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৫) নীতি নির্ধারণকারী হিসেবে ভূমিকা—মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট যখন আইন, প্রশাসনিক নির্দেশ, সন্ধি চুক্তি প্রভৃতির বৈধতা বিচার করে বা কোনও আইন বা প্রশাসনিক নির্দেশ বা সন্ধিচুক্তিকে সংবিধান বিরোধী বলে ঘোষণা করে, তখন সুপ্রিম কোর্ট কার্যত সেই আইন নির্দেশ ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নীতির বিরোধিতা করে। এইভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট অগ্রণী ভূমিকা নেয়। ১৯৪৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট পৃথক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিগ্রো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানকে বৈষম্যমূলক বলে বাতিল করে দেয়। ফলে এতদিন ধরে অনুসৃত বৈষম্যমূলক নীতিটির পরিবর্তনসাধন করা হয়।

(৬) যুক্তরাষ্ট্রের আদালত হিসাবে ভূমিকা—যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে বা রাজ্য সরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার বন্টনকে কেন্দ্র করে বিরোধের আশংকা থাকে। এই ধরনের কোন বিরোধ বাধলে তার মীমাংসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে উপযুক্ত ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নিরপেক্ষ আদালত প্রয়োজন। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট হল এই ধরনের একটি নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সংবিধান নির্দিষ্ট ক্ষমতার প্রকৃতি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে কোনও বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসা করে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

তাছাড়াও মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট শাসন ও আইনবিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বিভাজনকে বলবৎ করে এবং উভয় কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ করে।

সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র রাজ্য বিরোধের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলেই সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছে।

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকার সামলোচনাও কম হয়নি।

০৭.৬ সুপ্রিম কোর্টের সমালোচনা ও মূল্যায়ন

সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকার সমালোচনা হিসাবে নিম্নোক্ত বক্তব্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঃ

(১) সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা রাজনীতি-নিরপেক্ষ কিনা এ বিষয়ে সমালোচকরা প্রশ্ন তোলেন। তাঁরা মনে করেন যে সমকালীন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের সঙ্গে সংবিধানের সঙ্গতি রক্ষায় সুপ্রিম কোর্ট উদ্যোগ নিয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি দ্বারা বিচারপতিরা নিযুক্ত হন। বিচারপতিদের এই নিয়োগের ক্ষেত্রে বিচারপতিদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিযুক্ত হওয়ার পরও তাঁরা সমকালীন ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে যোগ রেখে চলেন। শাসনবিভাগের কর্তা বা আইনবিভাগের সদস্যদের মত বিচারপতিদেরও নিজস্ব মতামত আছে। সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তাঁরা সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত হন। অনেকে মনে করেন যে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট দেশের রাজনৈতিক বা জাতীয় জোটের অংশবিশেষ। অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট হল রাজনৈতিক নেতৃত্বের অংশ।

(২) মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা নানাদিক থেকে সমালোচিত হয়েছে—

(ক) অনেক সমালোচক মনে করেন যে মার্কিন সংবিধান সুপ্রিম কোর্টের হাতে এই ক্ষমতা প্রদান করেনি। সুপ্রিম কোর্ট বৈধতা বিচারের ক্ষমতাকে নিজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে গণ্য করে এবং সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমেই সুপ্রিম কোর্ট এই ক্ষমতা করায়ত্ত করেছে। তাই সমালোচকরা বলেন, যে সুপ্রিম কোর্ট বিনা অধিকারে এই ক্ষমতা বলপূর্বক করায়ত্ত করেছে।

(খ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ মার্কিন শাসনব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুসারে এক বিভাগ অপর বিভাগের কাজে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু বিচার বিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ বিচারবিভাগ অন্য দুটি বিভাগের (আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ) ওপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ পায়। এই ক্ষমতাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অস্তীকৃতি মনে করা যায়।

(গ) মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা শুধুমাত্র আইনগত এলাকার মধ্যে সীমিত নয়। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রশ্ন ও সমস্যা দূরীকরণের ক্ষেত্রেও এই ক্ষমতা দেখা যায়। তাই অনেকে সুপ্রিম কোর্টের এই ক্ষমতাকে বিচারবিভাগীয় স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর মনে করেন।

(ঘ) সুপ্রিম কোর্টের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা মার্কিন শাসনব্যবস্থায় অথবা অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিচারপতিদের মানসিকতা ও সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়। একই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। এর ফলে মার্কিন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় অনিশ্চয়তার পরিবেশ দেখা যায়।

(ঙ) সুপ্রিম কোর্ট তার বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা সব সময় গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রয়োগ করেনি; বরং ধনী ও মালিক শ্রেণির স্বার্থরক্ষার জন্য এই ক্ষমতা প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে, সুপ্রিম কোর্ট অনেক সময় জনস্বার্থের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(চ) সুপ্রিম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক আইনের বিরোধিতা করেছে এবং প্রগতিবিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

(ছ) বিচারপতিদের নিয়োগ তাঁদের রাজনৈতিক মতামত ও দলীয় আনুগত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। ফলত বিচারপতিরা রাজনৈতিক প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেন না। বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষেত্রেও বিচারপতিরা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকেন।

অর্থাৎ বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতা বিচারপতিদের অপ্রতিহত ও স্বৈরী ক্ষমতার অধিকারী করেছে।

(৩) নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও সুপ্রিম কোর্ট অনেক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার পরিচয় দিয়েছে। গৃহযুদ্ধের সময় থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে বিত্তবানদের সম্পত্তির অধিকার রক্ষার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। উদাহরণ হিসাবে লোচনার বনাম নিউইয়র্ক (১৯০৫) মামলার উল্লেখ করা যায়। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট বলে যে শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারণের ক্ষমতা সরকারের নেই, কারণ তা মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

মূল্যায়ন—

সুপ্রিম কোর্ট কখনও কখনও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা পরিচালিত হন, একথা অনস্বীকার্য। তবে সর্বক্ষেত্রে তা ঘটে না, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের রাজনীতি-নিরপেক্ষ ভূমিকাও মাঝে মাঝে দেখা যায়।

বিচারবিভাগীয় সমীক্ষায় নেতিবাচক দিকটাই সব না। এই ক্ষমতার পক্ষেও জোরালো বক্তব্য আছে—

প্রথমত ঃ সুপ্রিম কোর্ট তার সমীক্ষার ক্ষমতাকে কখনোই দায়িত্বহীনভাবে বা খেয়ালখুশিমত ব্যবহার করেনি।

দ্বিতীয়ত ঃ এই সমীক্ষার ক্ষমতার জন্যই মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেস সংযতভাবে চলেন। তাঁদের আশংকা তাকে যে অবৈধ কাজ আদালত দ্বারা বাতিল ঘোষিত হতে পারে।

তৃতীয়ত ঃ আদালতের সিদ্ধান্তকে কংগ্রেস আইন করে বদলে দিতে পারে। কাজেই সুপ্রিম কোর্ট অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী, এই বক্তব্য ঠিক নয়।

চতুর্থত ঃ সুপ্রিম কোর্টের রায়ের মাধ্যমেই নিগ্রোদের অধিকার ও মর্যাদা অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের স্বৈরচারিতা থেকে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধান স্বীকৃত নাগরিক অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলে সুপ্রিম কোর্ট মার্কিন গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে।

পঞ্চমত ঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত হিসাবে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের মীমাংসা করতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

ষষ্ঠত ঃ মার্কিন সংবিধানের বিকাশে সুপ্রিম কোর্টের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। সংবিধান ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্ট পরিবর্তিত সময় ও পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তুলেছে।

সপ্তমত ঃ সুপ্রিম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার মাধ্যমে নীতি নির্ধারকের ভূমিকা পালন করেছে। যখন সুপ্রিম কোর্ট কোনও আইনকে অসাংবিধানিক বলে বাতিল করে, তখন সুপ্রিম কোর্ট সেই আইনটির সঙ্গে যুক্ত নীতির বিরোধিতা করে। এইভাবেই সুপ্রিম কোর্টের নীতি নির্ধারকের ভূমিকা কার্যকরী হয়। কতকগুলি ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় সুপ্রিম কোর্ট সফল হয়েছে। নিগ্রো ছাত্রদের জন্য পৃথক বিদ্যালয়ের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বাতিল, অশ্লীল চলচ্চিত্র ও সাহিত্যকর্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের অভিমত জনজীবনকে প্রভাবিত করেছে।

কাঠামো ও কার্যগত দিক থেকে গত শতাব্দী জুড়ে সুপ্রিম কোর্ট তার বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে নিজেকে সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে এবং ন্যায় বিচারের ধারণাকে সুস্পষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে।

০৭.৭ সারাংশ

আমেরিকায় বিচারব্যবস্থার শীর্ষে সুপ্রিম কোর্টের অবস্থান। সুপ্রিম কোর্ট বর্তমানে একজন প্রধান বিচারপতি ও আট জন বিচারপতি নিয়ে গঠিত হয়। বিচারপতিরা সাধারণত ব্যবহারজীবী হন এবং আমৃত্যু পদে বহাল থাকেন। তবে অসদাচরণের জন্য ইম্‌পিচমেন্ট পদ্ধতির মাধ্যমে বিচারপতিদের পদচ্যুত করা যায়।

সুপ্রিম কোর্টের দুধরনের এলাকা আছে। মূল এলাকা ও আপিল এলাকা। মূল এলাকায় কূটনৈতিক প্রতিনিধি সংক্রান্ত এবং কেন্দ্র রাজ্য বা রাজা-রাজ্যের বিরোধী সংক্রান্ত মামলা সরাসরি উত্থাপিত হয়। আপিল এলাকায় অধস্তন বিচারালয় থেকে আপিলের মাধ্যমে মামলা সুপ্রিম কোর্টে আসে। যে সকল মামলায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন, যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বা স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘিত হয়, সেইসব রায়ের বিরুদ্ধে অধস্তন আদালত থেকে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়।

সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যাকর্তা ও অভিভাবক, মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক, সংবিধানের সম্প্রসারণে সহায়ক, কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধিকারক এবং নীতি নির্ধারণকারী। আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির ভিত্তিকে সুপ্রিম কোর্ট বা কোনও কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে আইনগত পদ্ধতি ও স্বাভাবিক ন্যায়নীতি— এই দুই দিক থেকে বিচার করে এবং যে কোন দিক থেকে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে করলে সেই আইন বা শাসনসংক্রান্ত

কাজকে নাকচ করে দিতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের এই জাতীয় বিচারবিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা সুপ্রিম কোর্টকে আইনসভার তৃতীয় কক্ষে পরিণত করেছে। কোনও আইন আইনসভার দুকক্ষে পাশ হওয়ার পরও তা থাকবে কিনা এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা থাকে। আইনটি সংক্রান্ত একটি মামলা সুপ্রিম কোর্টে এলে এবং সুপ্রিম কোর্ট তাকে আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির ভিত্তিতে বিচার করে তাকে নাকচ না করলে তারপরই আইনটি থাকবে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়। আমেরিকার জনজীবনে অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি এবং তৃতীয় কক্ষের ভূমিকায় সুপ্রিম কোর্টের অবস্থানের জন্য অনেকে সুপ্রিম কোর্টকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন।

০৭.৮ প্রশ্নাবলী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। সুপ্রিম কোর্টের গঠন ও ক্ষমতা আলোচনা করুন।

২। সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকাকে বিভিন্ন দিক থেকে ব্যাখ্যা করুন।

৩। সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকার একটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন লিখুন।

৪। **সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির সংখ্যা বর্তমানে কত?

(খ)সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কার্যকাল কতদিন?

(গ)সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা কিভাবে পদচ্যুত হতে পারেন।

(ঘ)আইনের যথাবিহিত পদ্ধতির অর্থ বিশ্লেষণ করুন।

(ঙ)মূল এলাকায় কি ধরনের মামলা সুপ্রিম কোর্টে আসে?

(চ) কোন ধরনের মামলা সুপ্রিম কোর্টে আপিল করা যায়?

(ছ)সংবিধানের অভিভাবক হিসাবে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা কতটা?

(জ) সুপ্রিম কোর্ট কিভাবে মৌলিক অধিকার রক্ষা করে?

(ঝ) সংবিধানের সম্প্রসারণের ও কেন্দ্রীয় সরকারি ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা আলোচনা করুন।

০৭.৯ উত্তরমালা

প্রশ্ন১। ০৭.৩ ও ০৭.৪ দেখুন।

২। ০৭.৫ এ উত্তর আছে।

৩। ০৭.৬ দেখে লিখুন।

৪। (ক)০৭.৩ এর প্রথম পরিচ্ছেদে উত্তর আছে।

(খ)০৭.৩ এর তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখুন।

(গ)০৭.৩ এর শেষ পরিচ্ছেদ দেখে লিখুন।

(ঘ)০৭.৪ এর ১(খ) দেখুন।

(ঙ)০৭.৪ এর প্রথম স্তবক।

(চ) ০৭.৪ এর (২) দেখুন।

(ছ)০৭.৪ এর পাতা ১২০।

(জ) ০৭.৪ এর পাতা ১২০ দেখুন।

(ঝ)০৭.৪ এর পাতা ১২১ দেখুন।

০৭.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১। Allen M. Potter–American Govt. and Politics.

২। A. M. Schlesinger–The Supreme Court.

৩। C. A. Beard–The Supreme Court and the Constitution.

৪। Ogg. F. A. & Ray, P.O.—Essentials of American Govt.

৫। অনাদিকুমার মহাপাত্র—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

একক ০৮ ❑ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থগোষ্ঠী

গঠন

০৮.১ উদ্দেশ্য

০৮.২ প্রস্তাবনা

০৮.৩ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

০৮.৪ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার পরিণাম

০৮.৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

০৮.৬ মার্কিন ও ব্রিটিশ দলব্যবস্থার তুলনা

সাদৃশ্য

বৈসাদৃশ্য

০৮.৭ মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীর উদ্ভব

০৮.৮ মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ

০৮.৯ মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতি

মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের নির্ধারক

০৮.১০ সারাংশ

০৮.১১ প্রশ্নাবলী

০৮.১২ উত্তরমালা

০৮.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

০৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থ গোষ্ঠীর সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এককটি পড়লে আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন—

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব, বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী।
- মার্কিন ও ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার তুলনার ভিত্তিতে উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।
- মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যপদ্ধতি ও তাদের কাজের নির্ধারক।
- মার্কিন ও ব্রিটিশ স্বার্থগোষ্ঠীর তুলনার ভিত্তিতে উভয়ের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য।

০৮.২ প্রস্তাবনা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান নিয়ে আলোচনার সময় হ্যামিল্টনের ফেডারেলিস্ট ও জেফারসনের অ্যান্টি ফেডারেলিস্ট গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। অ্যান্টি ফেডারেলিস্ট গোষ্ঠী থেকে সাধারণতন্ত্রী দলের উদ্ভব হয়। এই দল অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও অধিকারকে সমর্থন করে। ফেডারেলিস্ট গোষ্ঠী থেকে উদ্ভুত ফেডারেলিস্ট দল কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছিল। কিন্তু ১৮১৬ সালে ফেডারেলিস্ট দল বিলুপ্ত হয়। তবে সাধারণতন্ত্রী দলের দুটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে—গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী ও জাতীয় সাধারণতন্ত্রী। প্রথম দলটি পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক দল এবং দ্বিতীয় দলটি সাধারণতন্ত্রী দল নামগ্রহণ করে। গণতান্ত্রিক দল রক্ষণশীল নীতি নেয় ও দাসপ্রথা সমর্থন করে, সাধারণতন্ত্রী দল সংস্কারপন্থী নীতি নিয়ে দাসপ্রথার বিরোধিতা করে। এখনও আমেরিকার এই দুটি দলই আছে। তবে উভয় দলই সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজ নীতির পরিবর্তন করেছে। বর্তমানে দল দুটির মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব কম।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছোটখাট অন্যান্য দল থাকলেও দ্বিদল ব্যবস্থাই প্রাধান্য লাভ করেছে। উভয় দলই নির্বাচনকেন্দ্রীক এবং উভয় দলেরই উদ্দেশ্য নির্বাচনে জিতে সরকারি ক্ষমতালাভ। উভয় দলের সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত। রাজ্যদলের প্রাধান্য থাকায় দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা দুর্বল। এজন্য সেখানে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুব শক্তিশালী।

মার্কিন উদারনীতিবাদী সমাজে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সমাজের বিভিন্ন অংশের স্বার্থের সংরক্ষণ করে। তাদের উদ্দেশ্য সরকারী ক্ষমতালোভ নয়, সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান দলের কোন কঠোর মতাদর্শ নেই, দলীয় শৃঙ্খলাও নেই। ফলে সেখানে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুব শক্তিশালী।

স্বার্থগোষ্ঠীগু:লি কাজ আদায়ের জন্য নির্বাচনমূলক, প্রচারমূলক, লবিং ইতাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে। মার্কিন শাসনব্যবস্থায় তাদের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

০৮.৩ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ

সাধারণত উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দলীয় ব্যবস্থাকে অপরিহার্য মনে করা হয়। কিন্তু মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা ব্রিটিশ সরকারের দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের কারণ হিসাবে সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলিকে দায়ী করেন এবং তাই দলব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। কিন্তু সংবিধানের কাঠামো নিয়ে আলোচনার সময় হ্যামিল্টন ও তাঁর সমর্থকরা যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার কথা বলেন। অন্যদিকে জেফারসন ও তাঁর সমর্থকরা অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্ররক্ষাকে গুরুত্ব দেন। এইভাবে প্রতিনিধিরা মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—হ্যামিল্টনের ফেডারেলিস্ট ও যুক্তরাষ্ট্রীয় দল ও জেফারসনের অ্যান্টিফেডারেলিস্ট বা যুক্তরাষ্ট্রীয় বিরোধী দল।

নবগঠিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাতে দলীয় সংকীর্ণতার শিকার না হয় সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর ক্যাবিনেটে হ্যামিল্টন ও জেফারসন উভয়কেই স্থান দেন। তবে সরকারি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি হ্যামিল্টনের সঙ্গে চলতে থাকেন এবং জেফারসনের বিরোধী হয়ে পড়েন। ১৭৯৩ সালে জেফারসন মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে রিপাবলিকান বা সাধারণতন্ত্রী দল গঠন করেন। এই দল অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ও তাদের অধিকার সংরক্ষণকে সমর্থন করে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় দল কেন্দ্রীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে চেয়েছিল। ১৮০০ সালে জেফারসন রাষ্ট্রপতি হন। তখন থেকে সাধারণতন্ত্রী দলের প্রভাব বাড়তে থাকে। নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর যুক্তরাষ্ট্রীয় দলের প্রভাব কমতে থাকে এবং ১৮১৬ সালে এই দলের বিলুপ্তি ঘটে।

সাধারণতন্ত্রী বা রিপাবলিকান দলের মধ্যে দুটি গোষ্ঠী দেখা দেয়—

(১) ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান বা গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী এবং

(২) ন্যাশনাল রিপাবলিকান বা জাতীয় সাধারণতন্ত্রী গোষ্ঠী।

গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রী গোষ্ঠী পরে গণতান্ত্রিক দল নামে অভিহিত হয়। জাতীয় সাধারণতন্ত্রী গোষ্ঠীর নাম হয় উদারনৈতিক বা হুইগ দল। পরে এই দল রিপাবলিকান পার্টি বা সাধারণতন্ত্রী দল নামে পরিচিত লাভ করে। প্রথম থেকেই ডেমোক্রাটিক পার্টি বা গণতান্ত্রিক দল রক্ষণশীল নীতি গ্রহণ করতে থাকে আর সাধারণতন্ত্রী দল সংস্কারমূলক নীতির কথা বলে। রাষ্ট্রপতি লিংকনের সময় দাসত্বপ্রথাকে কেন্দ্র করে উভয় দলের বিরোধীতা চলে। রক্ষণশীল গণতন্ত্রী দল দাসপ্রথাকে সমর্থন জানায় আর সংস্কারপন্থী সাধারণতন্ত্রী দল দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদের কথা বলে। গণতান্ত্রিক দল দক্ষিণের ভূস্বামী ও দাসমালিকদের পক্ষ নেয় আর সাধারণতন্ত্রী দল উত্তরের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিত্ব করে। লিংকনের সাধারণতন্ত্রী দলের নেতৃত্বে গৃহযুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে আমেরিকায় শিক্ষাভিত্তিক অর্থনীতি জোরদার হতে থাকে।

বর্তমানেও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী এই দুটি দলই আছে। এখন উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য খুব কম। আগেকার সংস্কারপন্থী সাধারণতান্ত্রিক দলের মধ্যেও রক্ষণশীলতার নীতি গৃহীত হয়েছে। গণতান্ত্রিক দলও নানাদিক থেকে সংস্কারপন্থী ও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছে। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ক্ষেত্রে উভয় দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্যকে গুরুত্বহীন বলা যায়।

০৮.৪ মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

মার্কিন দলীয় ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য মার্কিন দলব্যবস্থাকে স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছে। সেগুলি হল ঃ—

(১) মার্কিন দলীয় ব্যবস্থাকে দ্বিদলীয় বলা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় স্তরে গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী—এই দুটি দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দুটি বড় দল ছাড়াও অনেক ছোটখাট দল আছে, যেমন সাম্যবাদী দল, শ্রমিক দল, সমাজতন্ত্রী দল ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় রাজনীতিতে এগুলির প্রভাব খুব কম। মার্কিন সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার পর বহু ঘটনা ঘটেছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, আর্থিক মন্দা, মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ইত্যাদি। কিন্তু জাতীয় স্তরে শাসন-ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক—এই দুটি দলের মধ্যে সীমিত থেকেছে।

(২) রবার্ট ডালের মতে, ইউরোপীয় দেশগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যেরূপ সুস্পষ্ট মতাদর্শ ও কর্মসূচীগত পার্থক্য আছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী দলের মধ্যে তা দেখা যায় না। বস্তুত, সেখানে গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী দলের মধ্যে চিন্তা, মতাদর্শ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতি, কর্মসূচী, কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোন বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। উভয় দলই পুঁজিবাদে বিশ্বাসী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত এবং উভয় দলের কার্যপদ্ধতিও এক ধরনের। উভয় দলই নির্বাচনকেন্দ্রিক এবং উভয়েরই উদ্দেশ্য নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ। ফাইনার বলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেবলমাত্র একটি দলই আছে—সাধারণতন্ত্রী গণতান্ত্রিক দল। একই দলের দুটি অংশ পৃথক পৃথক নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। আলমন্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিদলীয় ব্যবস্থাকে তাই 'অস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা' বলে।

(৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশাল আয়তন এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির স্বার্থের বিভিন্নতার জন্যে সেখানে আঞ্চলিক সংগঠনগুলির গুরুত্ব খুব বেশি। তাছাড়াও, সংবিধান অনুসারে নির্বাচন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে অঙ্গরাজ্যগুলি। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি অঙ্গরাজ্যের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন দ্বারা পরিচালিত হয়, কেন্দ্রীয় আইন দ্বারা নয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় সমস্যা কিছুটা প্রাধান্য পায়। কিন্তু অন্যান্য নির্বাচনে আঞ্চলিক সমস্যাগুলিই ভোটদাতাদের কাছে গুরুত্বলাভ করে। রাজনৈতিক দলগুলিও প্রার্থীদের অনুকূলে সমর্থন আদায়ের জন্য আঞ্চলিক ও স্থানীয় সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দেয়। সাধারণতন্ত্রী দল মূলত উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের এবং গণতান্ত্রিক দল দক্ষিণাঞ্চলের রাজনৈতিক দল

হিসাবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে উভয় দলই আঞ্চলিকতাকে বাদ দিয়ে জাতীয় ভিত্তিতে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার নীতি গ্রহণ করেছে।

(৪) সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক উভয় দলেরই সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত। কোন দলেই দলীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত নয় এবং জাতীয় নেতা রাজ্য দলের নীতি বা মনোনীত প্রার্থীর বিরোধিতা করতে পারে না। রাজ্যদলগুলি জাতীয় সংগঠনের নিয়ন্ত্রণ থেকে অনেকখানি মুক্ত এবং স্বাধীনভাবে রাজ্য সংগঠন পরিচালনা করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য উভয় দলের যে কনভেনশনের ব্যবস্থা আছে, তা হল পঞ্চাশটি রাজ্যদলের কনভেনশন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জাতীয় নীতি প্রাধান্য পেলেও কংগ্রেসের নির্বাচনে আঞ্চলিকভাবে প্রাধান্য দেখা যায়।

(৫) দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাব মার্কিন দলব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিকেন্দ্রীভূত সংগঠন, রাজ্য নেতৃত্বের প্রাধান্য ইত্যাদি মার্কিন দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলকে দুর্বল করেছে। জাতীয় নেতাদের পরমর্শ উপেক্ষা করেও আঞ্চলিক স্বার্থ সমর্থনের নজির আইনসভার সদস্যদের মধ্যে প্রায়শ পরিলক্ষিত হয় দলীয় নির্দেশ অমান্য করে আইনসভার সদস্যরা আইনসভায় ভোট দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতির দলযুক্ত কংগ্রেসের সদস্যরা অনেক সময় রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে।

(৬) স্বার্থগোষ্ঠীর প্রাধান্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুবই প্রাধান্য লাভ করে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি দলের নীতিকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। এজন্য দলের আর্থিক ব্যয়, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদির দায়িত্ব তারা গ্রহণ করে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কাজের সঙ্গে মার্কিন কংগ্রেস সদস্যরাও যুক্ত থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলার অভাবে এই অবস্থা দেখা যায়।

(৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী গণভিত্তিক ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। জনসমর্থন লাভের জন্য দুটি দলই বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করে এবং দেশের বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতামতকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দল প্রার্থী ও নির্দল ভোটদাতাদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য দেশের দলীয় ব্যবস্থায় তা দেখা যায় না। সমর্থকদের মধ্যে মতাদর্শগত স্থায়ী দলীয় আনুগত্যও দেখা যায় না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনী রাজনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক এই দুটি প্রধান দলকে দেখা যায়। অন্যান্য কিছু দল আছে, যেমন সমাজতন্ত্রী শ্রমিক দল, কমিউনিস্ট দল ইত্যাদি। কিন্তু তৃতীয় কোন দল রাজনৈতিক ক্ষমতাদখলের প্রতিযোগিতায় প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বহুদলীয় ব্যবস্থার বদলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করেছে। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশ যেমন ফ্রান্স,

ইতালি, বেলজিয়াম, হল্যান্ড ও সুইজারল্যান্ডে বহুদলীয় ব্যবস্থা আছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন বহুদলীয় ব্যবস্থার বদলে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা দেখা যায়, তার কিছু কারণ হল ঃ—

(১) ঐতিহাসিক কারণ—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঔপনিবেশিক ইংল্যান্ডের হুইগ ও টোরীদের মধ্যেকার বিরোধ, সংবিধান প্রণয়নের সময় ফেডারেলিস্ট ও ফেডারেলিস্ট বিরোধী গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব, কিছুকাল পর ফেডারেলিস্ট ও জেফারসনীদের মতপার্থক্য ইত্যাদি থেকেই কালক্রমে সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক দলের সৃষ্টি হয়েছে।

(২) প্রতিষ্ঠানিক কারণ—মার্কিন সংবিধান প্রণেতারা রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জনগণের আনুগত্য তিন বা তার অধিক দলের মধ্যে বিভক্ত হলে তাদের পক্ষে কোন একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে বেছে নেওয়া কঠিন হয়। কারণ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কোন প্রার্থীকে নির্বাচিত হওয়ার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পেতে হয়। এই সাংবিধানিক শর্ত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থীর সংখ্যা এবং সেই সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক দলের সংখ্যা সীমিত করতে সহায়তা করেছে।

(৩) সামাজিক কারণ—জাতিগত, ধর্মীয়, আর্থসামাজিক থেকে বিভক্ত সমাজে বহুদলব্যবস্থা কার্যকরী হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের বিরোধ কম হওয়ার জন্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থা শক্তিশালী হয়েছে।

(৪) মতৈক্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক মতৈক্য আছে। ফলে দুটি দলের কর্মসূচীর মধ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য নেই। কোন বিভাজন না থাকায় তৃতীয় কোন দল গড়ে উঠতে পারেনি।

(৫) মানসিক প্রবণতা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দুটি প্রধান দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে গোড়া থেকেই নাগরিকদের মধ্যে প্রধান দুটি দলের যে কোন একটির প্রতি সমর্থনের মানসিকতা গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক নেতারাও মনে করেন যে প্রধান দুটি দলের কোন একটির সমর্থন ছাড়া রাজনৈতিক জীবনে সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। এই মানসিক প্রবণতা দ্বিদলব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব দান করেছে।

(৬) তৃতীয় দলের মধ্যে অসংহতি—তৃতীয় দলের অভ্যুত্থান সম্পর্কিত দীর্ঘদিনের আন্দোলন, প্রকৃতি, কর্মসূচী ইত্যাদি সবদিক থেকেই হতাশাজনক ও অসংযত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার পরিণাম

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থা থাকার পরিণাম হল ঃ—

(১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের উভয় সভার নির্বাচন বিভিন্ন সময়ে হয়। অভিনবত্ব হল যে একটি দলের প্রার্থী রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হলেও অন্য দলের পক্ষে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ সম্ভব।

(২) নির্বাচনে জয়লাভের জন্য কোন দল দেশের একটিমাত্র অংশ বা একটি স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটলাভের জন্য বিভিন্ন অংশ ও গোষ্ঠীর ব্যাপকতর স্বার্থের সমষ্টিকরণ করতে বাধ্য হয়। দুটি দলই এই কাজ করে থাকে।

(৩) দুটি দল থাকায় স্বাভাবিকভাবে একটি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সংসদীয় ব্যবস্থার মত ত্রিশঙ্কু অবস্থা হয় না।

(৪) গণতান্ত্রিক ও সাধারণতন্ত্রী দুটি দলই প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। ফলে প্রচলিত ব্যবস্থার স্থায়িত্বও অক্ষুণ্ণ থাকছে।

০৮.৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা ও প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহের কার্যাবলী উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হল ঃ

(১) নির্বাচনমূলক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি এবং দুবছর অন্তর প্রতিনিধিসভার সদস্য এবং সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। অঙ্গরাজ্যের গভর্নররাও নির্বাচিত হন। এই সব নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ ও সাফল্যলাভ করে রাজনৈতিক ক্ষমতাদখল হল রাজনৈতিক দলগুলির প্রধান কাজ। এজন্য সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক উভয় দলই ভোটদাতাদের সমর্থনলাভের জন্য সর্বপ্রকারে চেষ্টা করে। দলগুলি তাই প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচনী প্রচার ইত্যাদি কাজে মনোনিবেশ করে।

(২) সমস্যা নির্বাচন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলই দেশের বিভিন্ন সমস্যাসমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলিকে বাছাই করে এবং সেই সমস্যা সমাধানের পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে। সমস্যা বাছাই ও তাদের সমাধান নিয়ে রচিত দলীয় কর্মসূচী ভোটদাতাদের প্রভাবিত করে।

(৩) সরকার গঠন—মার্কিন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে বিজয়ী দল সরকার গঠন করে এবং অন্য দল বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে। তবে উভয় দলের মধ্যে মতাদর্শগত মৌলিক পার্থক্য না থাকায় উভয় দলই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করে।

(৪) সরকারের বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি দেখা যায়। তাই সেখানে আইন ও শাসনবিভাগ পরস্পর থেকে স্বতন্ত্র। অথচ এই বিভাগ দুটির মধ্যে সহযোগিতা ছাড়া সুশাসন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দল সেখানে আইন ও শাসনবিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা করে এবং প্রশাসনকে সচল রাখে।

(৫) সরকার ও জনগণের মধ্যো সংযোগসাধন—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলগুলি সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। জনগণের অভিযোগ বা দাবিসমূহ সম্বন্ধে দলগুলি সরকারকে অবহিত করে। আবার গৃহীত সরকারি ব্যবস্থা সম্বন্ধেও জনগণকে জানায়। কংগ্রেসের সদস্যরা নিজ নির্বাচকমণ্ডলীর অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সদাসচেতন থাকেন এবং এ ব্যাপারে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(৬) জনমত গঠন—অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক দলের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও রাজনৈতিক দলগুলি জনমত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। সাধারণতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উভয় দলই কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে জনমতকে অনুকূলে আনার চেষ্টা করে। জনমত গঠনের জন্য পত্রপত্রিকা, বেতার, চলচ্চিত্র, দুরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে কংগ্রেসের কাজ, সরকারি ত্রুটি বা অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে জনমতকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে।

(৭) জাতীয় ঐক্যসাধন—সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটদাতাদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক মার্কিন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও শ্রেণির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রচেষ্টা করে এবং বাস্তবে তা রূপায়ণেও ব্রতী হয়। তাই প্রতিটি দলই বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক স্বার্থকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং জাতীয় ঐক্য বৃদ্ধি করে।

(৮) রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা প্রদান—দুটি রাজনৈতিক দলই প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল। ফলে প্রচলিত ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বজায় থাকে। দলগুলি বিভিন্ন উপজাতি, সামাজিক শ্রেণি, ধর্মীয় ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ স্বার্থকে সংঘবদ্ধ করে গণভিত্তিক সরকার গঠন করে। তার ফলেও রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল হয়।

(৯) পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমর্থন—উভয় দলই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত বুর্জোয়া রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সাম্যবাদের বিরোধিতা করে।

০৮.৬ মার্কিন ও ব্রিটিশ দলব্যবস্থার তুলনা

মার্কিন ও ব্রিটিশ দলব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের দলব্যবস্থার সংগঠন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ভালভাবে অনুধাবন করা যায়। উভয় দলব্যবস্থার মধ্যে কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈসাদৃশ্য আছে।

সাদৃশ্য

১। দ্বিদলব্যবস্থা—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন উভয় দেশেই দ্বিদলব্যবস্থা প্রচলিত। মার্কিন দলদুটি হল গণতান্ত্রিক ও সাধারণতান্ত্রিক দল আর ব্রিটেনের দল দুটি হল রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল। উভয় দেশেই প্রধান দুটি দল ছাড়াও অন্যান্য দল আছে। কিন্তু তাদের ক্ষমতা ও প্রভাব খুবই কম। উভয় দেশেই সরকারি ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

২। **সাংগঠনিক দিক**—উভয় দেশেই দলীয় সংগঠনে কিছু সাদৃশ্য আছে। উভয় দেশেই দলীয় সংগঠন পিরামিডের মত বিভিন্ন কমিটি দ্বারা গঠিত। উভয় দেশের দুটি রাজনৈতিক দলেই জাতীয় ও আঞ্চলিক সংগঠন দেখা যায়।

৩। **আঞ্চলিক আনুগত্য**—উভয় দেশেই দুটি দলের সমর্থকদের দলীয় আনুগত্য আঞ্চলিক ও ভৌগলিক। ব্রিটেনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল ও উভয় আয়ারল্যান্ড রক্ষণশীল দলকে সমর্থন করে। উত্তর ও মধ্যাঞ্চলগুলি শ্রমিক দলের সমর্থক। আমেরিকাতেও কৃষি খামার ও ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলে সাধারণতন্ত্রী দল এবং দক্ষিণ ও বৃহৎ শহরগুলিতে গণতান্ত্রিক দলের সমর্থন দেখা যায়।

(৪) **সহযোগিতামূলক**—উভয় দেশেই দলগুলির মধ্যে সহশীলতা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতার মনোভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মৌলিক মূল্যবোধ বিষয়ে উভয় দেশেই প্রধান দলগুলির মধ্যে মতৈক্য দেখা যায়।

(৫) **রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার প্রতি আস্থা**—উভয় দলই প্রচলিত রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা ও সংবিধান সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কোন ক্ষেত্রেই দলদুটির নীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। ব্রিটেনে রক্ষণশীল দল প্রচলিত ব্যবস্থার সংরক্ষণ চায়। শ্রমিক দল সংস্কারনীতি ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে সমর্থন করলেও সামগ্রিকভাবে প্রচলিত ব্যবস্থাকে বজায় রাখতেই চায়।

(৬) **বিপ্লব বিরোধিতা**—উভয় দেশের উভয় দলই বিপ্লব-বিরোধী এবং সাংবিধানিক উপায়ে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতা দখলে সচেষ্ট।

(৭) **স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে নিকট সম্পর্ক**—উভয় দেশেরই রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হল যে রাজনৈতিক দল স্বার্থগোষ্ঠীগুলির মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক বর্তমান। রাজনৈতিক দলগুলির পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রেড ইউনিয়ন, শিক্ষক সংগঠন ইত্যাদি স্বার্থগোষ্ঠী সৃষ্ট হয়েছে এবং স্বার্থগোষ্ঠীগুলিও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে নির্বাচনী প্রচার, অর্থসরবরাহ ইত্যাদি বিষয়ে সহায়তা করে।

(৮) উভয় দেশেই রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ, কিন্তু কোন দেশেই রাজনৈতিক দল সংবিধান স্বীকৃত ব্যবস্থা নয়। সাংবিধানিক কাঠামোর বাইরে দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের কোন আইনের ভিত্তিতে দলব্যবস্থার সৃষ্টি হয়নি। মার্কিন লিখিত সংবিধানেও দলব্যবস্থার উল্লেখ নেই। উভয় দেশেই উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ যুক্ত।

বৈসাদৃশ্য

ব্রিটেনে ও আমেরিকার দলব্যবস্থার মধ্যে বৈসাদৃশ্য কম নয়। বৈসাদৃশ্যগুলি হল ঃ —

(১) **দলীয় ব্যবস্থার ভূমিকা**—ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা দলীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থাকে সর্বাংশে দল পরিচালিত বলা যায় না। ফলে উভয়ের ভূমিকা ভিন্ন ধরনের।

ব্রিটেনে কমন্সসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, সেই দলের নেতা প্রধানমন্ত্রী হন। দলীয় সদস্যদের নিয়ে তিনি মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ফলে দলীয় সরকার দলীয় কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে। ব্রিটেনে জাতীয় নীতি নির্ধারণে দলের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রতিষ্ঠিত এখানে সরকার কেন বিশেষ দল দ্বারা পরিচালিত হয় না। রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সব সময় একই দলভুক্ত হয় না। ফলে সরকারের সঙ্গে দলের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়। রাষ্ট্রপতির দলের সদস্যরাও অনেক সময় তার নীতির বিরোধিতা করেন। অন্য দলের সদস্যরা আবার কখনও কখনও তাঁকে সাহায্য করেন।

(২) আদর্শ ও কর্মসূচী—ব্রিটেনের দুটি দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীতে পার্থক্য আছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি দলের মধ্যে আদর্শ ও কর্মসূচীগত বিশেষ পার্থক্য নেই। ব্রিটেনের দলদুটির মধ্যে পার্থক্য আদর্শগত। আমেরিকার দলদুটির মধ্যে পার্থক্য সংগঠনগত।

(৩) দলীয় কাঠামোগত—ব্রিটেনে দল দুটি কেন্দ্রীভূত। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মত দলীয় কাঠামোও এককেন্দ্রিক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দুটি দলেরই প্রকৃত ক্ষমতা নিম্নস্তরে দলীয় সংগঠনের হাতে থাকে। ফলে দুটি দলই বিকেন্দ্রীভূত।

(৪) উদ্দেশ্যগত—ব্রিটেনের দুটি দলই উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। সরকারি ক্ষমতা দখল করতে পারলে দল দুটি দলীয় নীতি ও কর্মসূচী রূপায়ণের প্রচেষ্টা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দল দুটির মধ্যে কর্মসূচী বা নীতিগত কোন পার্থক্য না থাকায় শুধুমাত্র সরকারি ক্ষমতা লাভের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

(৫) দলীয় শৃঙ্খলা—ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল দুটির মধ্যে শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সংহতি দেখা যায়। কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনের ওপর সরকার নির্ভরশীল। দলীয় শৃঙ্খলার অভাব থাকলে সরকার বিপদের সম্মুখীন হবে। তাই সেখানে দলীয় শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারে। কংগ্রেসের সমর্থনের ওপর সরকার নির্ভর করে না। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দলীয় শৃঙ্খলার অভাব দেখা যায়।

(৬) দলীয় আনুগত্য—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অধিকাংশ নাগরিক পারিবারিক দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে ভোট দেন। কিন্তু ব্রিটেনে পারিবারিক ধারায় ভোটপ্রদান করা হয় না।

(৭) বিরোধী ও ক্ষমতাশালী দলের সম্পর্ক—ব্রিটেনের কমন্সসভায় সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সবসময় সংগ্রাম চলে। মার্কিন কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উভয় দলের সদস্যদের মধ্যে সমঝোতার মনোভাব দেখা যায়।

০৮.৭ মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীর উদ্ভব

সমাজে পরস্পর বিরোধী স্বার্থের অস্তিত্ব থাকলে স্বার্থগোষ্ঠী দেখা দেয়। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সর্বত্রই স্বার্থগোষ্ঠী বর্তমান। মার্কিন শাসনব্যবস্থা উদারনীতিবাদী। সেখানে পরস্পর বিরোধী স্বার্থ ও তাদের দ্বন্দ্বও আছে। একই শ্রেণির বিভিন্ন অংশের মধ্যেও বিরোধী দেখা যায়। তাই সেখানে অনেক স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য সরকারি ক্ষমতালাভ নয়, সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে নিজেদের অনুকূলে আনা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব ব্যাপক। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ, দুটি রাজনৈতিক দলের দুর্বল কাঠামো, কংগ্রেসে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কমিটি ব্যবস্থার প্রাধান্য ইত্যাদি স্বার্থগোষ্ঠীগুলির প্রাধান্য বিস্তারে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছে। দুটি প্রধান দলেরই নির্দিষ্ট মতাদর্শ নেই, দলীয় শৃঙ্খলারও অভাব আছে। ফলে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সহজেই তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ও ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ফলে সিদ্ধান্তগ্রহণের কেন্দ্রও অনেক। ফলে স্বার্থগোষ্ঠীগুলির সুবিধা হয়েছে। সিদ্ধান্তগ্রহণের বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিকে তারা প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। তবে তাদের সাফল্য নির্ভর করে তাদের গোষ্ঠী সামর্থ্যের ওপর।

মার্কিন স্বার্থ গোষ্ঠীগুলির সংখ্যা এত বেশি যে মার্কিন শাসনকে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহের বিকাশ ও বিস্তারের এক উল্লেখযোগ্য আবাসস্থল বলা যায়। এগুলিকে অনুধাবন না করলে মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝা যায় না।

০৮.৮ মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীর শ্রেণিবিভাগ

নানাভাবে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির শ্রেণিবিভাগ করা যায়।

(১) কার্যকলাপের ভিত্তিতে—কার্যকলাপের ভিত্তিতে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—অর্থনৈতিক ও অ-অর্থনৈতিক। অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর উদাহরণ হল কৃষি, শিক্ষা ও বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সংগঠন। এগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি হল অ-অর্থনৈতিক।

(২) সংখ্যা ও আর্থিক সামর্থ্যের বিচারে—সংখ্যা ও আর্থিক সামর্থ্যের দিক থেকে চার ধরনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী দেখা যায়—

(ক) কম সদস্য বিশিষ্ট, কিন্তু বিশেষ আর্থিক স্বাচ্ছল্যযুক্ত সংস্থা, যেমন, জাতীয় উৎপাদকের সংস্থা।

(খ) অধিক সদস্যবিশিষ্ট কিন্তু কম আর্থিক স্বাচ্ছল্যযুক্ত সংস্থা, যেমন, কৃষ্ণকায়দের সংগঠন।

(গ) বিশাল সদস্যবিশিষ্ট এবং আর্থিক স্বাচ্ছল্যযুক্ত সংস্থা যেমন শ্রমিক সংস্থা।

(ঘ) কম সদস্যবিশিষ্ট কিন্তু মর্যাদাযুক্ত যেমন, আণবিক বিজ্ঞানীদের সংস্থা।

ল্যাজারাস ও গিলেকপি তিন ধরনের স্বার্থগোষ্ঠীর কথা বলেছেন—

(ক) সমস্যাকেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠী যা বিশেষ ঘটনা বা সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যেমন, ধূমপান বিরোধীদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য অ্যাকশন্ অন স্মোকিং এন্ড হেলথ।

(খ) সরকার কেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠী বা লকিং-এর মাধ্যমে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার জন্য গঠিত স্বার্থগোষ্ঠী। এরা আইন, শাসন ও বিচারবিভাগীয় স্তরে কাজ করে।

(গ) আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থগোষ্ঠী বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ দ্বারা নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠী, যেমন ধর্ম ও বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠী।

০৮.৯ মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতি

মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেদের গোষ্ঠীস্বার্থ আদায়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সেগুলি হল ঃ—

(১) নির্বাচনমূলক—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি কোন বিশেষ প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যের জন্য ভোটসংগ্রহে তৎপর হতে পারে। এইভাবে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়লাভ করায়। গোষ্ঠীগুলি নির্বাচনে দলগুলিকে আর্থিক সাহায্য দেয়, দলীয় প্রার্থীর অনুকূলে প্রচারকাজ চালায়। নির্বাচনে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রেও দলগুলির ওপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে গোষ্ঠীর যোগ থাকতে পারে।

(২) প্রচারমূলক কাজ—স্বার্থগোষ্ঠীগুলি গণমাধ্যমগুলিকে (বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র ইত্যাদি) প্রভাবিত করে গোষ্ঠীস্বার্থের পক্ষে জনমত গঠনের জন্য প্রচারকাজ চালায়। তাছাড়াও কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতিকে প্রভাবিত করে গোষ্ঠীস্বার্থের অনুকূলে আইনপ্রণয়নের চেষ্টা করে।

(৩) বিচারব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার—স্বার্থগোষ্ঠীগুলি বিচারালয়কেও প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা করে থাকে। বৃহৎ গোষ্ঠীগুলি শাসনবিভাগের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বিচারকদের নিয়োগকেও প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। তাছাড়াও স্বার্থগোষ্ঠীগুলি নিজেরা মামলা দায়ের করতে বা অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক দায়ের করা মামলায় আর্থিক সাহায্য নিতে পারে।

(৪) গোষ্ঠীগুলি যে পদ্ধতিতে সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের কাছে প্রবেশ পাওয়ার এবং নিজেদের বক্তব্য বিবেচনার সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে তাকে লবিং বলে। স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে প্রতিনিধিরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের কাছে নিয়মিত যাতায়াত করেন ও যোগাযোগ রাখেন। শিল্পপতি, শ্রমিক ইত্যাদি সব গোষ্ঠীরই লবি আছে। মার্কিন কংগ্রেসের বিভিন্ন কমিটির প্রভাবশালী সদস্যদের মাধ্যমেও গোষ্ঠীগুলি উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়।

মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের নির্ধারক

যে কোন দেশের স্বার্থগোষ্ঠীর কাজ কয়েকটি উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই উপাদানগুলিকে স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যকলাপের নির্ধারক বলা হয়। নির্ধারকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) রাজনৈতিক সংস্কৃতি—মার্কিন রাজনৈতিক সংস্কৃতি সেখানকার স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভূমিকার নির্ধারক। মার্কিন জনগণ তাদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রায় স্বার্থগোষ্ঠীগুলি তাই আজ অপরিহার্য। এই অপরিহার্যতা মার্কিন রাজনৈতিক সংস্কৃতির অঙ্গ।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয়—মার্কিন শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয়। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন। তাই স্বার্থগোষ্ঠীগুলিও জাতীয় ও কেন্দ্র উভয় স্তরেই কাজ করে থাকে।

(৩) ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রযুক্ত হয়েছে। তাই মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলি শুধু শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে সব সময় কার্যসিদ্ধি লাভ করতে পারে না। আইনবিভাগ, বিচারবিভাগকেও তারা প্রভাবিত করে কাজ আদায়ের চেষ্টা করে।

(৪) রাজনৈতিক দল—রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিভিন্ন স্বার্থগোষ্ঠী যুক্ত থাকে। রাজনৈতিক দল দ্বারা তাদের সংগঠন ও কার্যকলাপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়। রাজনৈতিক দল স্বার্থগোষ্ঠীগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করে, স্বার্থগোষ্ঠীগুলিও রাজনৈতিক দলে নির্বাচনের প্রচারকাজে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য করে।

(৫) জনগণের মনোভাব—স্বার্থগোষ্ঠীগুলি জনগণের সামাজিক জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে জনগণ অনুকূল মনোভাব ব্যক্ত করে। জনসমর্থন ও জনআনুকূল্যের ওপর গোষ্ঠীগুলির সাংগঠনিক শক্তি , প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সাফল্য নির্ভর করে।

(৬) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা—স্বার্থগোষ্ঠীগুলির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সাফল্য নির্ধারিত হয়।

০৮.১০ সারাংশ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতন্ত্রী ও গণতান্ত্রিক এই দুটি দলকে প্রধান দল বলা যায়। অন্যান্য দল থাকলেও তাদের গুরুত্ব নেই। মার্কিন দ্বিদলব্যবস্থায় দলদুটির মধ্যে নীতিগত বা কর্মসূচীগত পার্থক্য খুব বেশি নেই। উভয় দলই পুঁজিবাদকে সংরক্ষণ করতে চায়। উভয় দলই নির্বাচনে বিশ্বাসী এবং বিপ্লব বিরোধী। উভয় দলেরই সংগঠন বিকেন্দ্রীভূত। উভয় দলেরই উদ্দেশ্য নির্বাচনে জিতে ক্ষমতা লাভ।

উভয় দলের কাজ হল—রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রতিনিধিসভার সদস্য ও সেনেটের সদস্যদের নির্বাচন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর নির্বাচন, সরকারগঠন বা সরকার বিরোধিতা, সরকারের বিভাগগুলির মধ্যে সংযোগসাধন, সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বিধান, জনমতগঠন, জাতীয় ঐক্যসাধন, রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা প্রদান এবং পুঁজিবাদের সংরক্ষণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুটি রাজনৈতিক দলের দুর্বল কাঠামো, দলীয় শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি স্বার্থগোষ্ঠীকে ক্ষমতাশালী আছে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য সরকারি ক্ষমতালাভ বা নির্বাচনে জয়লাভ করা নয়, সরকারকে প্রভাবিত করে সরকারি সিদ্ধান্তকে স্বার্থগোষ্ঠীর পক্ষে আনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থগোষ্ঠীগুলি সামাজিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে অনেক স্বার্থগোষ্ঠী যুক্ত থাকে। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক দলের প্রচার বা অন্যান্য কাজে দলগুলিকে সাহায্য করে।

০৮.১১ প্রশ্নাবলী

রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

২। মার্কিন দলীয়ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

৩। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী কী কী?

৪। স্বার্থগোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে কী বোঝেন? স্বার্থগোষ্ঠীগুলির শ্রেণিবিভাগ করুন।

৫। **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(ক) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার অস্তিত্বের কারণগুলি কী কী?

(খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিদলব্যবস্থার পরিণামগুলি আলোচনা করুন।

(গ) মার্কিন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির কার্যপদ্ধতি আলোচনা করুন।

(ঘ) মার্কিন স্বার্থগোষ্ঠীগুলির কার্যকলাপের নির্ধারকগুলি সংক্ষেপে লিখুন।

০৮.১২ উত্তরমালা

১। ০৮.৩ এ উত্তর আছে।

২। ০৮.৪ দেখুন।

৩। ০৮.৫ খুঁজুন।

৪। ০৮.৭ ও ০৮.৮ এ উত্তর দেওয়া হয়েছে।

৫। (ক) ০৮.৪ এর পাতা ১৩২ ও ১৩৩।

(খ) ০৮.৪ এ ১৩৩ ও ১৩৪ পাতা।

(গ) ০৮.৯ এ উত্তর দেখুন।

(ঘ) ০৮.৯ এ ১৪০ পাতা।

০৮.১৩ গ্রন্থপঞ্জী

১। Ogg FA & Ray. P. O.—Essential of American Govt.

২। Munro–The Govt. of United States.

৩। অনাদিকুমার মহাপাত্র—নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সহায়ক পাঠক্রম

দ্বিতীয় পত্র

(SPS-II)

পর্যায়

০৩

একক-০৯ ❑পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ক্রমবিকাশের ধারা ও বৈশিষ্ট্য

গঠন :

০৯.১ উদ্দেশ্য

০৯.২ প্রস্তাবনা

০৯.৩ প্যারী কমিউন

০৯.৪ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

০৯.৫ সারাংশ

০৯.৬ অনুশীলনী

০৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

০৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি ফ্রান্সের বিপ্লবের (১৭৮৯) পর যে কয়টি সাধারণতন্ত্রের উত্থান-পতনের পর পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও প্রায় ৪৫ বছর ধরে আজও একটানা কাজ করে চলেছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া এই এককের উদ্দেশ্য। ফ্রান্সের বর্তমান শাসনব্যবস্থার নাম পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। স্বভাবতই প্রশ্ন বা কৌতূহল হতে পারে যে তাহলে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণ সাধারণতন্ত্র কেমন ছিল? কেনই বা পঞ্চম সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হলো? এই প্রশ্ন ও কৌতূহল নিবারণ করাই এই এককের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট যার পটভূমিতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের আবির্ভাব ফ্রান্সে ঘটেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া আছে। তারপর অধুনা প্রচলিত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা করা হয়েছে।

০৯.২ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর যে কয়টি দেশ ইতিহাস সমৃদ্ধ ও রাজনীতি-সচেতন বলে পরিচিত তার মধ্যে ফ্রান্স হচ্ছে অন্যতম। অতীতে এবং বর্তমানেও ফ্রান্স হচ্ছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎশক্তি। ইউরোপীয় রাজনীতি তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ফ্রান্সের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আজকের 'ইউরোপীয় ইউনিয়ন'-এ ফ্রান্স হচ্ছে নেতৃত্বদানকারী দেশ।

সূতরাং ফ্রান্সের রাজনীতি ও শাসনব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে অত্যন্ত আগ্রহের বিষয়। তাই ফ্রান্সের সংবিধান, রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও রাজনীতি-প্রক্রিয়ার পঠন-পাঠনও গভীর অনুধাবনের বিষয়।

১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সে সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে ওঠে। মানুষের অধিকারের ঘোষণায় যার সূচনা—তার ক্রমবিকাশের ধারা দীর্ঘ। প্রথম সাধারণতন্ত্রের পতনের ১৮০৪ সালে নেপোলিয়ানের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। নেপোলিয়ানের পতনের পর নানা অনিশ্চয়তায় ১৮৩০-এ জুলাই বিপ্লব ও ১৮৪৮-এ ফেব্রুয়ারির বিপ্লব দ্বিতীয় সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। তারপর ১৯৭৫-এ তৃতীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা স্থায়ী হল না। পরবর্তী চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও পতন খুবই অনিবার্য ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ উত্তর ফ্রান্স অবশেষে, জাতীয় নায়ক দ্যাগলের নেতৃত্বে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হল ১৯৫৮ সালে। বর্তমান ফরাসি সাংবিধানিক ব্যবস্থার ভিত্তি তাই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান।

তাই ফ্রান্সের রাজনৈতিক ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই এককে আধুনিক ফ্রান্সের একটি রাজনৈতিক ইতিহাসকে ক্রমানুসারে ঘটনা ও সাল ভিত্তিক অবস্থায় উপস্থাপনা করা হয়েছে। তারপর বর্তমান ফ্রান্সের সাংবিধানিক ব্যবস্থা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

০৯.৩ ❑ প্যারী কমিউন

এই সময় ফ্রান্সে ইতিহাসিক বিপ্লবী "প্যারী কমিউন" গঠিত হয়। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ফ্রান্সে কমিউনিস্টরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার "প্যারী কমিউন" নামে পরিচিত। প্যারী কমিউনের সময় কমিউনিজমের স্রষ্টা ও প্রবর্তক কার্ল মার্ক্স জীবিত ছিলেন। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নানা কারণে এই প্যারী কমিউনের পতন ঘটে। প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কার্ল মার্ক্সের বিভিন্ন রচনা ও পত্রাবলী রয়েছে। প্যারী কমিউনের থেকে মার্ক্সের সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

সেডানের যুদ্ধের সময় (১৮৭০-৭১) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্যারী নগরীর শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতি মানুষ নিজেরাই গঠন করেছিল জাতীয় রক্ষীবাহিনী। প্যারিস রক্ষা করবার জন্য শ্রমিক শ্রেণি নিজেরাই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলে তিয়েরের (Adorhe Their) নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় প্রতিরক্ষার সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল, জনগণের এই সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মুখে তিয়েরের সরকার পিছু হটতে বাধ্য হয়। ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ প্যারিসে রাষ্ট্রক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণি দখল করে নেয়। তার ফলে জন্মলাভ করেছিল প্যারী কমিউন। ১৯৭১ সালের ১৮ই মার্চ প্রত্যুষে ঘোষিত হয় Viva la Commune অর্থাৎ "কমিউন দীর্ঘজীবী হউক"। ১৮ই মার্চ এক ইস্তাহারে শ্রমিকদের দ্বারা গঠিত জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেছিল, 'প্যারিসের প্রলেতারিয়েতেরা শাসক শ্রেণির ব্যর্থতা ও দেশদ্রোহিতা থেকে এ কথাই উপলব্ধি করেছে যে, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করে আপন

ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে যে তাদের অবশ্য কর্তব্য এবং পরম অধিকার একথা তারা অনুভব করেছে। পরিস্থিতি রক্ষা করার মুহূর্তটি আজ সমাগত....সরকারি ক্ষমতা দখল করে।

১৮ই মার্চ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে কমিউনের নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। জাতীয় রক্ষীবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করে যে, কমিউনই হবে সেই সংস্থা যার কাছে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। তাই সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কমিউনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কমিউন গঠিত হয়েছিল নগরের বিভিন্ন অংশের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটিগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে। এই প্রতিনিধিরা দায়ী ছিলেন নির্বাচকদের নিকট এবং নির্বাচকরা যে কোনো সময়ে-প্রতিনিধিবর্গকে প্রত্যাহার করবার ক্ষমতার (পদচ্যুতি বা Recall) অধিকার ছিল।

মার্কসের রচনা থেকে উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, সরলতম ধারণায় কমিউনের অর্থ হল শ্রমিকশ্রেণির সরকার। কমিউন পার্লামেন্টারি সংস্থা ছিল না, ছিল কাজের সংস্থা—একাধারে কার্যনির্বাহকর ও আইনি সংস্থা।

প্যারী কমিউনের কৃতিত্বের মধ্যে ছিল—

১. স্থায়ী ফৌজের বিলোপ সাধন ও জনসাধারণের সশস্ত্র বাহিনী গঠন।

২. পুলিশকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতিয়ারের পরিবর্তে কমিউনের সেবকে পরিণত করা। এই পুলিশ ছিল কমিউন কর্তৃক নিযুক্ত ও প্রত্যাহারযোগ্য। পুলিশের বেতন ছিল শ্রমজীবী মজুরের বেতনের সমান।

৩. বিচারপতিরাও ছিলেন নির্বাচিত, প্রত্যাহারযোগ্য ও দায়িত্বশীল।

৪. সমাজের সমস্ত বিষয়ে উদ্যোগ ছিল কমিউনের হাতে।

৫. সরকারি কাজকর্ম সমাজের ঊর্ধ্বে উঠে সম্পন্ন হত না, তা সম্পন্ন হত শ্রমিকশ্রেণির নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউন দ্বারা।

৬. কেন্দ্রীয় সরকারের পেটোয়াদের উপর ন্যস্ত বক্তিগত ধনসম্পত্তির উচ্ছেদ সাধন।

৭. গির্জা ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ।

৮. শিক্ষাকে সকলের জন্য উন্মুক্ত ও অবৈতনিক করা।

৯. রুটি তৈরির কারখানায় রাতের কাজ বন্ধ করা।

১০. কারখানায় কারখানায় জরিমানা প্রথা রহিত।

১১. গরিবদের বকেয়া খাজনা মকুব।

১২. বন্ধ কারখানা খোলা এবং সেগুলি পরিচালনার দায়িত্ব শ্রমিকদের সংস্থার উপর অর্পণ।

১৩. কমিউনের সদস্য থেকে অধস্তন কর্মচারী পর্যন্ত জনসাধারণের দ্বারা নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীর ছিল সমান মজুরি—এবং তা ছিল একজন শ্রমজীবী মানুষের মজুরির সমান।

১৪. বিজ্ঞানকে সকলের অধিগম্য করা।

১৫. কুসংস্কারের বন্ধন থেকে শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্ত করা।

১৬. কমিউন দ্বারা পৌরকর নির্ধারণ ও সংগ্রহ।

১৭. কর-সংগৃহীত হত সাধারণ রাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

১৮. কর-সংগৃহীত অর্থ বিলি হত সাধারণ উদ্দেশ্যের জন্য এবং বিলিব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করতেন কমিউন নিজে।

১৯. সরকারি নিপীড়নের শক্তি, যা ছিল সমাজের উপর কর্তৃত্ব—তা ভেঙে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি সংস্থার সরকার প্রবর্তন।

২০. ধর্ম ও শিক্ষার পৃথকীকরণ।

প্যারী কমিউনের পতনের কারণ হিসেবে মার্ক্স উল্লেখ করেছেন যে, কমিউনের ভুলের জন্য প্যারী কমিউনের সাফল্যের ফল জনসাধারণ বেশিদিন ভোগ করতে পারেনি। প্যারী কমিউনের ভুলগুলি ছিল—

১. "উচ্ছেদকারীদের উচ্ছেদ কর"—এই সংকল্প নিয়ে কমিউন অগ্রসর হয়নি।

২. ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স প্যারী কমিউনের হস্তগত হলেও প্রচুর অর্থ কমিউন বাজেয়াপ্ত করেনি এবং বুর্জোয়াদের এই ধন-সম্পত্তিকে কমিউন সযত্নে রক্ষা করেছিল।

৩. পলাতক বুর্জোয়াদের সম্পত্তি দখল না করা।

৪. রেল কোম্পানির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত না করা।

৫. ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্যে পাতি বুর্জোয়াসুলভ শ্রদ্ধা আর "সকলের ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার করার স্পৃহা"—এই অদ্ভূত ধরনের মনোভাব কমিউনের মধ্যে থাকা।

৬. শত্রুদের প্রতি প্যারী কমিউনের অত্যাধিক মহানুভবতা প্রদর্শন।

৭. শত্রুদের ধ্বংস করার পরিবর্তে তাদের উপর কমিউন নৈতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা।

৮. গৃহযুধে সামরিক কার্যকলাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারা।

৯. ১৮ই মার্চ তারিখেই ভার্সাই অভিমুখে অভিযান আরম্ভ করার ক্ষেত্রে দ্বিধা অবলম্বন এবং তার ফলে ভার্সাই অধিষ্ঠিত বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে সংগঠিত করার ও মে মাসের রক্তাক্ত অভিযান তিয়েরের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া।

১০. ফ্রান্সের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে কমিউন কর্তৃক সক্ষম না হওয়া।

১১. কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনে ব্যর্থ হওয়া।

১২. শ্রমিক শ্রেণির নিজস্ব কোনও পার্টি না থাকা।

প্যারী কমিউনের নেতৃত্বস্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন প্রুঁধোপন্থী। এঁরা কমিউন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে কৃষকদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে বলেছিলেন এবং কৃষকদের উদ্দেশ্যে এও বলেছিলেন যে এই বিপ্লব (প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠা) থেকে কৃষকেরা কিছুরই যেন আশা না করে, কারণ এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল শ্রমিকদের স্বার্থে। এইভাবে প্যারী কমিউন প্রতিষ্ঠা থেকে ফ্রান্সের জনসাধারণের সর্ববৃহৎ অংশ বিচ্ছিন্ন থাকায় কমিউন স্থায়ী হতে পারেনি। বরং বলা যায় শুরু হতেই মিত্রহীন হয়ে শ্রমিকশ্রেণি ছিল বিচ্ছিন্ন। সমাজের মূল অংশ হতে বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী প্যারী কমিউন দ্রুত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কোন বিপ্লবী সামাজিক পরিবর্তন অদ্যাবধি সমাজের কৃষকশ্রেণির সমর্থন ব্যতীত সাফল্য লাভ করেছে এমন উদাহরণ মানব ইতিহাসে নেই। সুতরাং ইতিহাসের বাইরে গিয়ে এবং মার্ক্সের কথায় কর্ণপাত না করে প্যারী কমিউনের নেতৃবৃন্দ ভুল করেছিলেন। তার ফলেই এবং তিয়েরের মিথ্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তাক্ত অত্যাচারের ফলেই প্যারী কমিউনের পতন ঘটেছিল।

লেনিন প্যারী কমিউনের অভিজ্ঞতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কাউটস্কি, বানস্টিন প্রমুখ সংশোধনকারীদের বিরুদ্ধে তিনি প্যারী কমিউনের শিক্ষার যুক্তি অবতারণা করে সর্বহারার একনায়কত্ব এবং 'সর্বহারা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠাকে শ্রমিকশ্রেণির ক্ষমতা দখলের প্রকৃত মার্ক্সীয় পন্থা বলে 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে বর্ণনা করেছিলেন।

০৯.৪ ❑ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় আলজিরীয় যুদ্ধের অবসানের মধ্যেই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান তৈরি হওয়ায় চার্লস দ্য গলের রক্ষণশীল চিন্তা এই সংবিধানকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের কাঠামো দুটি মূল বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। মূল বৈশিষ্ট্য দুটি হল ঃ (১) অত্যাধিক শক্তিশালী শাসনবিভাগের হাতে ফ্রান্সের রাষ্ট্র-কাঠামোর পুনর্গঠন এবং (২) পার্লামেন্টকে সীমিত রাজনৈতিক ও আইনগত ক্ষমতায় রাখা। এই দুটি শর্ত সাপেক্ষেই দ্য গল ৪র্থ রিপালবিকের পতনের পর ফরাসি দেশের ক্ষমতার হাল ধরতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। এই ভাবেই ফরাসি দেশে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত।

❑ প্রস্তাবনা

এই মূল বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক প্রস্তাবনা ঘোষণা করা হয়েছে। মোট ৯২টি ধারা সংবলিত ওই সংবিধান প্রস্তাবনায় মানুষের "অধিকারের ঘোষণার সনদের" প্রতি ফ্রান্সের জনগণের অগাধ আস্থার কথা বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে ১৭৮৯ সালের ঘোষণার জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা হয়েছে।

❑ সম্প্রদায়

সংবিধানের ১নং ধারায় ফ্রান্সকে একটি Community বলা হয়েছে। এই ধরায় বলা আছে, ''The Republic and the poeple of the overseas territorries, who by an art of free determination, adopt the new constitution, institute a community. The community is founded on the equality and solidarity of the people composing it.

১নং ধারা ব্যতীত ৭৭-৭৮ নং ধারা সমূহেও ফ্রান্সকে সম্প্রদায় (Community) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ফরাসি সম্প্রদায়ভুক্ত (Community) অঞ্চলসমূহ স্বয়ংশাসিত থেকে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিকভাবে নিজেদের শাসন পরিচালনা করে। ফরাসি সম্প্রদায় (Community)-এর লোকেরা একই ধরনের নাগরিকত্ব ভোগ করে। সব ফরাসি নাগরিক ফরাসি আইনের চোখে সমান। আইনগত কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা প্রত্যেক ফরাসিকে সমানভাবে বহন করতে হয়। বৈদেশিক নীতি, প্রতিরক্ষা, অর্থব্যবস্থা, দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের কাঁচামাল সংক্রান্ত ব্যাপারে সম্প্রদায় (Community) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া সাধারণত বিচার ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষা, সাধারণ ও বিদেশির যোগাযোগ, পরিবহন, তার- যোগাযোগ ব্যাপারেও সম্প্রদায়ের (Community) নিয়ন্ত্রণ থাকে।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সমগ্র ফরাসি সম্প্রদায়ের (Community) সভাপতিত্ব ও প্রতিনিধিত্ব করেন। সম্প্রদায়ের (Community) কাজ পরিচালনার জন্য একটি কর্মপরিষদ, সেনেট ও সালিশি আদালত আছে। কমিউনিটিভুক্ত অঞ্চলগুলি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। ফরাসি কমিউনিটির রাষ্ট্রপতি হিসাবে কমিউনিটিভুক্ত প্রতিটি অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। কমিউনিটিভুক্ত যে কোনও বর্হিদেশীয় অঞ্চল ইচ্ছা করলে ৮৬নং ধারানুযায়ী কমিউনিটি ত্যাগ করতে পারে।

কমিউনিটি ধারণা দ্বারা সাম্রাজ্যবাদী উদারতা উপনিবেশগুলিকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিয়ে দ্য গল তাদের একসূত্রে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ধারণা তাঁর মাথার ছিল। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। একে একে ফরাসি উপনিবেশগুলি তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। Metropolitan Finance সম্বন্ধে উপনিবেশগুলির কোনও উৎসাহ ছিল না। কমিউনিটি সংক্রান্ত ধারাগুলি তাই আজ কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ।

❑ সাধারণতন্ত্র

সংবধিানের ২নং ধারায়, ''ফ্রান্স একটি সাধারণতান্ত্রিক, অবিভাজ্য, ধর্মনিরপেক্ষ, সামাজিক ও গণতান্ত্রিক''—এই কথা বলা হয়েছে (France is an Indivisible, Secular, Democratic and Social Republic)-এর দ্বারা নাগরিকদের অধিকার ও সমস্ত প্রকার বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে। মার্সাই ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের লক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর কথা বলা হয়েছে।

❑ গণসার্বভৌমত্ব

সংবিধানের ৩নং ধারা অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার আধার হল জনগণ। এই সার্বভৌম ক্ষমতা কেবল জনসধারণের প্রতিনিধিদের মধ্যেই সীমিত থাকবে না। গণভোটের মাধ্যমেই সার্বভৌম ক্ষমতার ব্যবহার হবে। নির্বাচন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হলেও নির্বাচন সর্বদা সার্বজনীন, সমান ও গোপনভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

❑ বহুদলীয় ব্যবস্থা

সংবিধানের ৪নং ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান শ্রদ্ধাশীল। এই কথা বলে রাজনৈতিক দলগুলিকেও জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও গণতান্ত্রিক নীতিগুলির প্রতি শ্রদ্ধানুগ থাকতে বলা হয়েছে (Political parties and groups may complete for the expression of the suffrage. They may freely form themselves and exercise their activities. They may respect the principles of national soverignty and of democracy).

অনেকে মনে করেন যে, তদানীন্তনকালে শক্তিশালী ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টিকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আটক রাখাই ছিল ৪নং ধারার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সের রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থা নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। ফ্রান্সে জোট-রাজনীতি (coalitional politics) গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে জোটও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে আছে। ফরাসি রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় বহুদলীয় বা দ্বি-মেরুকরণ জোট প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থা চতুর্দলীয় বা পঞ্চদলীয় ব্যবস্থার রূপ লাভ করেছে। দ্য গলপন্থী দল, সমাজতন্ত্রী দল, কমিউনিস্ট পার্টি এবং মধ্যপন্থী দল ও গোষ্ঠীসমূহ ফ্রান্সের নির্বাচনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ফ্রান্সে বহু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অবদান লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রয়েছে।

❑ রাষ্ট্রপতি

সংবিধানের ৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, সংবিধানকে ঠিকভাবে পরিচালিত করা রাষ্ট্রপতির আবশ্যিক কর্তব্য। তিনি নিয়মিত সরকারি কাজকর্ম পরিচালনা করবেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখন্ডতা এবং জাতীয় চুক্তি ও সন্ধির রক্ষক। রাষ্ট্রপতি জরুরি ক্ষমতার অধিকারী (১৬নং ধারা) আলজিরীয় যুদ্ধের গৌরবময় ব্যক্তিত্ব দ্য গল রাষ্ট্রপতি হিসেবে অনেক সময় সংবিধানের ধারার অতিরিক্ত ক্ষমতাও ভোগ করতেন। এ থেকে বলা যায় যে, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জনপ্রিয়তার স্রোতে তাল রেখে তাঁর নিজের ভূমিকা যথেচ্ছভাবে পালন করতে পারেন। ডরোথি পিকল্‌স্ একে রাষ্ট্রপতির ''This principle of a president whose role is positive, who though he does not govern does than reign–was expressed in the 1958 constitution by means of a division of executive power between president and Prime Minister that was not precisely defined.''

❑ পার্লামেন্ট

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট জাতীয়সভা ও সেনেট। জাতীয়সভার প্রতিনিধি বা ডেপুটিগণ প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন ও সেনেটর সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। ভৌগোলিক প্রতিনিধিত্বে জাতীয়সভা গঠিত ডেপুটিগণ পাঁচ বছরের জন্য ও সিনেটরগণ এক বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি তিন বছর অন্তর সেনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন। তুলনামূলকভাবে সেনেটের ক্ষমতা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেনেটে ও জাতীয়সভার মধ্যে পার্থক্য দূরীভূত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী উভয় কক্ষের সমান সংখ্যক প্রতিনিধির যুক্ত কমিটির অধিবেশন আহ্বান করেন।

❑ সংসদের সীমিত ক্ষমতা

পঞ্চম সাধারণতন্ত্র একটি 'Rationalised' (সুসংহত) পার্লামেন্টের প্রবর্তন করে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে সীমিত রেখেছে। এক বছর মাত্র দুবার জাতীয় সভা ও সেনেটের অধিবেশন বসে। প্রধানমন্ত্রী অবশ্য বিশেষ অধিবেশন ডাকতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা দেয়। পার্লামেন্টের আইন করার ক্ষমতা সংবিধানপ্রদত্ত এলাকাতেই সীমিত। সংবিধানের ৩৭নং ধারা অনুযায়ী, ওই এলাকার বাইরে কোনো কিছু করার ক্ষমতার নিয়মকানুন প্রণয়নকর্তার হাতে অর্পিত অর্থাৎ শাসন বিভাগ সরকারের উপরই ন্যস্ত। এছাড়া পার্লামেন্ট শাসনবিভাগকে আইন করার ক্ষমতা delegate করতে পারে। তাই ফ্রান্স রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের ব্যাপারে পার্লামেন্টের ভূমিকা অপেক্ষা সরকারের ভূমিকাই ব্যাপক। অতীতে পার্লামেন্ট যেভাবে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল তাতে দেশে স্থায়ী সরকার না থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতাই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টকে দুর্বল এবং শাসনবিভাগকে শক্তিশালী করেছে। রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে সংসদীয় গণতন্ত্র (Parliamentary Government with Presidential Leadership) হচ্ছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসনতান্ত্রিক অভিনবত্ব (Constitutional innovation)।

❑ সংসদের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা

পার্লামেন্ট দুর্বল হলেও সরকার পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল। পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যার অর্ধেকের—একজনের ভোটে পরাজিত হলে সরকারকে ক্ষমতা হতে পদচ্যুত করা হয়। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর যে বিশেষ ক্ষমতায় পার্লামেন্টকে বাতিল করা হয় তা ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে রাষ্ট্রপতি নিজের ব্যক্তিগত অভিরুচিতে ভোগ করে থাকেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি এক বছরে পার্লামেন্টকে দুবার বাতিল করতে পারেন না। এই বাতিল করার সময় রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সভাপতির সাথে আলোচনা করতে হয়।

সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত হলে ওই প্রস্তাব স্বাক্ষরকারীগণ একই অধিবেশনে দ্বিতীয়বার ওই প্রস্তাব আনতে পারেন না।

এইভাবে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভার মধ্যে ভারসাম্য রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফ্রান্সের চিরাচরিত সংকট 'স্থায়ী সরকারের অভাব' মোকাবিলা করবার জন্য পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে ডরোথি পিকল্‌সের বক্তব্য হল যে, 'The unity, cohesion and internal discipline of the French government must be held sacred, if national leadership is not to degenerate rapidly into incompetence and impotence.

❑ গণভোট

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অন্যতম নতুনত্ব হল যে, কোনও কোনও বিষয়ে গণভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সিদ্ধান্ত স্থির করতে পারেন। ১১নং ধারা অনুযায়ী তিনটি বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে—প্রথমত, সরকারি সংগঠন, দ্বিতীয়ত, জাতির সাথে কোনও চুক্তির ব্যাপারে, তৃতীয়ত, কোনও সন্ধি সম্পাদনের ক্ষেত্রে। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১১নং ধারা অনুসারে গণভোটের ব্যবস্থা সংবিধানসম্মত নয়। এই প্রসঙ্গে ব্লন্ডেল ও গডফ্রে বলেন, ''This article has led to the clearest cases of unconstitutional on the part of the President, both in spirit and letter.

কারণ, স্পষ্ট বর্ণনা না থাকার জন্য ইহা অনুমেয় যে, পার্লামেন্ট অনুমোদন করার পরই রাষ্ট্রপতি যে কোনও বিষয়ে গণভোটে দিতে পারেন। কিন্তু এ যাবৎ যে কটি গণভোট হয়েছে, সমস্ত ক্ষেত্রেই পার্লামেন্টের অনুমোদন তো দূরের কথা, পার্লামেন্টকে এড়িয়ে রাষ্ট্রপতি নিজেই গণভোটের ব্যবস্থা করেছেন। সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে ১১নং ধারা প্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গণভোট অনুষ্ঠান ঠিক সাংবিধানিক কাজ নয়। কারণ, ওই গণভোট ৮৯নং অনুযায়ী হওয়ার কথা, ১১নং ধারা অনুযায়ী নয়। কিন্তু দ্য গল এই ক্ষেত্রেও ১১নং ধারা ব্যবহার করেছিলেন।

❑ সংবিধানিক সভা

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সাংবিধানিক কমিটির পরিবর্তে পঞ্চম সাধারতন্ত্রে সাংবিধানিক সভা চালু করা হয়। সংবিধানের ৫৬নং ধারা হতে ৬৩নং ধারাগুলিতে সাংবিধানিক সভা সংক্রান্ত ব্যাপারে বর্ণনা রয়েছে। এই সাংবিধানিক সভা নয় বছরের জন্য নয়জন সদস্য নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক সদস্য প্রতি তিন বছর অন্তর সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ করতে পারেন।

এই নয়জন ব্যতীত সমস্ত ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতিগণ এই সাংবিধানিক সভার সদস্য। সাংবিধানিক সভার সভাপতি কর্তৃক নিযুক্ত নয়। ভোটাভুটিতে দুইদিকে সমান সংখ্যক ভোট হলে পরে তিনি ভোট প্রদান করেন। সাংবিধানিক সভা প্রধানত চার প্রকার কাজ সম্পাদন করে থাকে। প্রথমত, রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেন্টের নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারগুলি গণভোটের নিয়ম অনুযায়ী হচ্ছে কিনা তা দেখেও ফলাফল ঘোষণা করে। দ্বিতীয়ত, পার্লামেন্টের উভয়

কক্ষের স্ট্যান্ডিং নির্দেশ ও আইন ব্যাপারে সাংবিধানিক সভা অবশ্যই সংবিধানসম্মতভাবে আলোচনা করে। তৃতীয়ত, জরুরি ক্ষমতার ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুসারে সংবিধানিক সভা রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। চতুর্থত, সাধারণ বিলগুলি (সন্ধির বিল সহ) রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতির নিকট বাস্তব রূপায়ণের জন্য প্রেরণের পূর্বে সাংবিধানিক সভার নিকট প্রেরণ করা হতে পারে। সাংবিধানিক সভা কোনও বিলকে অসাংবিধানিক বললে সেই বিলটি আর আইন হতে পারে না।

এইভাবে সাংবিধানিক সভা আইন ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে। পার্লামেন্ট তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছে কিনা সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সাংবিধানিক সভাই গ্রহণ করে এবং তা সকলের উপর বাধ্যতামূলক।

মার্কিন দেশের মতো বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা (Judicial Review)-র কোনও সুযোগ ফ্রান্সে নেই। সাংবিধানিক সভা যা কিছু করে থাকে তা কেবল সাংবিধানিক পর্যালোচনা মাত্র।

❑ রাষ্ট্রীয় সভা

রাষ্ট্রের প্রশাসনে সর্বোচ্চ তদারকি সংস্থা হল রাষ্ট্রীয় সভা বা এটা প্রশাসনের ব্যাপারে সরকারের সুদক্ষ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে। বিলের খসড়া এবং মন্ত্রিদের আদেশ ও ঘোষণার বয়ানে সে পরামর্শ দান করে। প্রশাসনিক সমস্যার সমাধানে সে সরকারকে পরামর্শ দিয়ে থাকে। তা ছাড়া, প্রশাসনিক সংস্কারে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনব্যবস্থার তদারকি কাজেও সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয় সভা চারটি বিভাগে বিভক্ত ঃ (১) স্বরাষ্ট্র বিভাগ, (২) অর্থ বিভাগ, (৩) সরকারি পূর্ত ও উন্নয়ন বিভাগ এবং (৪) সামাজিক বিভাগ।

❑ অর্থনৈতিক সভা

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক সভা নতুন পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সভা নামে কাজ করছে। এর গঠন ও কাজেরও পরিবর্তন নতুন সংবিধানে ঘটেছে। এর অধিবেশন প্রকাশ্য নয়। অর্থনৈতিক সভার সদ্যস্যগণ সাধারণত বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত। সদস্যগণ তিন বছরের জন্য অর্থনৈতিক সভাতে নিযুক্ত হন। জাতীয়সভার অধিবেশন থাকাকালীন সময়ে এই সভার অধিবেশন বসে। অর্থনৈতিক সভার কাজ প্রধানত পরামর্শদানমূলক। অর্থনৈতিক সভা সরকারকে চারটি বিষয়ে পরামর্শ দান করতে বাধ্য থাকে। বিষয়গুলি হল ঃ (১) জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, (২) অর্থনৈতিক সভা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থনৈতিক আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ও বিভিন্ন নিয়মকানুন এবং আদেশ জারিসংক্রান্ত ব্যাপারে, (৩) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে, (৪) জাতীয় আয়ের সরকারি হিসাব ও সমীক্ষার ব্যাপারে। এছাড়া অর্থনৈতিক সভা নিজের উদ্যোগে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা আলোচনা করতে পারে।

পরিশেষে, কোনও কোনও অর্থসংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা করাবার জন্য অর্থনৈতিক সভাকে ডাকা হয়।

ফ্রান্সে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে অর্থনৈতিক সভা যেভাবে গঠিত হয়েছে তা বার্কারের, সামাজিক পার্লামেন্টের ধারণা-র বাস্তব রূপ। ফরাসি পার্লামেন্ট হচ্ছে রাজনৈতিক সভা (Political Parliament) কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গঠিত হয়েছে অর্থনৈতিক সভা। বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অর্থনৈতিক সভা বস্তুত একটি সামাজিক সভা (Social Parliament) কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে গঠিত হয়েছে অর্থনৈতিক সভা। বৃত্তিগত সভা। বৃত্তিগত ট্রেড ইউনিয়ন ও সমবায় প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারতন্ত্রের অর্থনৈতিক সভা বস্তুত একটি সামাজিক সভা (Social Parliament) সুতরাং পঞ্চম সাধারণতন্ত্র এক্ষেত্রে শাসনতান্ত্রিক অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।

❑ জরুরি অবস্থা

দেশের জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা ফরাসি রাষ্ট্রপতির একান্তভাবে ব্যক্তিগত অভিরুচি ও বুদ্ধি-বিবেচনার ব্যাপার। ফ্রান্সে সাধারণতান্ত্রিক কাঠামো, জাতীয় স্বাধীনতা, দেশের অখন্ডতা, আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রশ্নে কোনও বিপদ দেখা দিলে অথবা দেশে অভ্যন্তরীণ সাধারণ কাজকর্মের ব্যাঘাত ঘটলে রাষ্ট্রপতি যে কোনও সময় জরুরি অবস্থার ঘোষণা করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি জাতির নিকট একটি ঘোষণা জারী করেন ও সাংবিধানিক সভার পরামর্শ গ্রহণ করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির জরুরি সংক্রান্ত প্রসঙ্গে মন্তব্য যে, "It also made him both judge and jury, since he alone is constitutionally empowered to decide when such circumstances exist and what measures are to be taken to restore normality."

❑ সংবিধানের সংশোধন

চতুর্থ সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মতোই ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনের দুই প্রকার পদ্ধতি (১১ ও ৮৯ নং ধারা) আছে।

সংবিধান সংশোধন দ্বারা ফ্রান্সের সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মৌল কাঠামো (basic structure) এবং সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান সংবিধান মতে অপরিবর্তনীয়। এ ছাড়া, ফরাসি জাতির ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পরিস্থিতিতে কোনও সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন বা অনুমোদন করা যায় না।

❑ বিচার ব্যবস্থা

ফ্রান্সের বিচারমন্ত্রীর অধীনে বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হয়। সাধারণ বিচার (অর্থাৎ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার বিচার) এবং প্রশাসনিক বিচার (অর্থাৎ সরকারি কর্মচারীদের ত্রুটি-বিচ্যুতিজনিত অপরাধের বিচার) দুই ধরনের আদালত হয়। Droit Administrative বা প্রশাসনিক বিচার ব্যবস্থার সাহায্যে প্রশাসনিক আদালতে সরকারি কর্মচাযীদের ত্রুটি-বিচ্যুতির মামলার বিচার হয়।

❑ উচ্চতর বিচারসভা

সাধারণতন্ত্রের উচ্চতর বিচারসভা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপর্যায়ে সরকারি নিয়োগের ব্যাপারে পরামর্শ দান করে, বিচারকগণের নিয়মশৃঙ্খলাজনিত আচরণের ব্যাপারে বিচার করে ও ক্ষমা প্রদর্শনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করে।

❑ মহাধর্মাধিকরণ

চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রেও জাতীয়সভা দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত মহাধর্মাধিকরণ জঘন্য অপরাধের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে বিচারের কাঠগড়ায় অভিযুক্ত করতে পারে। মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারি কর্মচারী নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক অপরাধ করলে মহাধর্মাধিকরণ তাঁদেরও বিচার করতে পারে।

❑ এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ছাড়া অন্য কোনও স্তরে সরকারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। ফ্রান্সের স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা দেশের রাজধানী প্যারিস থেকে পরিচালিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের যুগে বিশুদ্ধ এককেন্দ্রিক সরকারি কাঠামোর উদাহরণ হল ফ্রান্স। ব্রিটেনে যা 'স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন', ফ্রান্সে তা হল ''স্থানীয় প্রশাসন'' (local administration)।

❑ মৌল অধিকার

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তবে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে কোনও অধ্যায় বা ধারায় পৃথকভাবে ও নির্দিষ্টভাবে ''মৌলিক অধিকার'' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়নি। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯)-এর সময়ের ''মানবাধিকার ঘোষণা'' এবং ''স্বাধীনতা'', ''সমতা'' ও ''সৌভ্রাত্র''-র নীতিকে এই সংবিধানে প্রাথমিক ও প্রধান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ফরাসি বিপ্লবের সামাজিক-দার্শনিক-অর্থনৈতিক ভিত্তি, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানেরও ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত অধিকারসমূহ বর্তমানে ফরাসি নাগরিকগণ মৌলিক অধিকার হিসাবে ভোগ করেন। এই অধিকারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—(১) প্রত্যেক নাগরিকের সমানাধিকার, (২) আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, (৩) সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, (৪) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, (৫) সম্পত্তির অধিকার (৬) সভা, সমিতি ও রাজনৈতিক দল গঠনের অধিকার, (৭) ধর্মঘট করার অধিকার, (৮) দমন পীড়ন প্রতিরোধের অধিকার, (৯) বাক্-স্বাধীনতার, সংবাদপত্রে অধিকার (১০) ব্যক্তিগত নিরাপত্তার অধিকার।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের ফরাসি নাগরিকগণের রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যের কোনও প্রকার উল্লেখ নেই। তবে ফরাসি নাগরিকগণকে দেশের আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই মৌলিক অধিকারগুলিকে ভোগ করতে হয়। মৌলিক অধিকারগুলি ফ্রান্সে সাধারণ আইনের (ordinary law) দ্বারাই রক্ষিত ও পরিচালিত হয়। দেশের সাধারণ আইন পালন করার মাধ্যমেই ফরাসি নাগরিকরা তাঁদের কর্তব্যও পালন করে থাকেন।

❑ আধা-রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যালোচনা করে অনেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানকে 'রাষ্ট্রপতি শাসিত এবং সংসংদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর সংমিশ্রণ' বলে অভিহিত করেন। এই ধরনের মিশ্রিত শাসনব্যবস্থাকে আবার অনেকে "রাজতান্ত্রিক শাসনের আধুনিক সংস্করণ" বলে অভিহিত করেন। আর. জি. নিউম্যানের মতে, পঞ্চম ফরাসি সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান হচ্ছে মূলত একটি রাজতান্ত্রিক সংবিধান"। কিন্তু নিউম্যানের এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান কোনওমতেই 'রাজতান্ত্রিক' বা রাজতন্ত্রের আবরণ নয়। কিন্তু ডরোথি পিক্লসের বক্তব্য অনুযায়ী এই সংবিধান দ্ব্যর্থব্যঞ্জক, অস্পষ্ট এবং ধোঁয়াশাপূর্ণও নয়। প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান পার্লামেন্টের তুলনায় রাষ্ট্রপতি এবং সরকারকে (President and Government) অধিক শক্তিশালী করা হয়েছে। তাই এই কাঠামো 'আধা-রাষ্ট্রপতিশাসিত' (quasi-Presidential) সরকারি কাঠামো বলে অভিহিত করা উচিত।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান একটি শাসনতান্ত্রিক মডেল হিসেবে অভিনব (a constitutional innovation)। অনেকে মনে করেছিলেন যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা "আধা রাষ্ট্রপতি" শাসন-কাঠামো হিসেবে বেশিদিন কাজ করবে না। অচিরে এটা সম্পূর্ণরূপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার অথবা সম্পূর্ণরূপে ব্রিটেনের মতো সংসদীয় সরকারে পরিণত হবে। কিন্তু বাস্তবে কোনওটাই না হয়ে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যেই পঞ্চম সাধারণতন্ত্র দীর্ঘকাল কাজ করে চলেছে।

আবার অনেকে আশংকা করেছিলেন, ফরাসি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান দ্য গল সৃষ্ট সংবিধান বলে দ্য গলের মৃত্যুর পর হয়তো পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কার্যকর থাকবে না, পঞ্চম সাধারণতন্ত্র ব্যর্থতায়

পর্যবসিত হবে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, দ্য গল মৃত, কিন্তু দ্য গল ব্যবস্থা জীবিত (De Gaulle is dead; Long live De Gaulle)। দ্য গল জীবিতাবস্থায় যে শাসনতান্ত্রিক অভ্যাস জাতির জীবনে গড়ে তুলেছিলেন তা আজও বজায় রয়েছে। ব্যক্তি দ্য গলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দ্য গল রীতি বা দ্য-গল ব্যবস্থার অবলুপ্তি হয়নি।

❑ উপসংহার

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের প্রতিষ্ঠা প্রকৃত পক্ষে দ্য গলের ব্যক্তিগত কৃতিত্ব। দেশের স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকারের প্রয়োজনে পঞ্চম সাধারণতন্ত্র নানা কায়দায় গঠিত। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, সে সংসদীয় কাঠামো বজায় রেখে রাষ্ট্রপতিকে অত্যধিক শক্তিশালী করে তুলেছে। জরুরি আইন ও অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষাও ফরাসি রাষ্ট্রপতি অধিক শক্তিশালী। এই অবস্থায় পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান অনেক জায়গায় গোলমেলে, ঘোলাটে ও দ্ব্যর্থব্যঞ্জক। এই সংবিধানকে নানা শক্তির সমঝোতা প্রসূত সংবিধান বলা যায়। কেউ কেউ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রকে untidy constitution বলেন। যাই হোক, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি দ্য গলের জীবদ্দশায় তেমন কিছু অপ্রীতিকর সাংবিধানিক বিপর্যয় ঘটেনি। দ্য গল এখন জীবিত নেই কিন্তু দ্য গলের জীবদ্দশায় জাতির যে শাসনতান্ত্রিক অভ্যাস গড়ে উঠেছে তার মৃত্যু হয়নি। তবুও পুরোনো দিনের দ্বন্দ্ব, মতপার্থক্যের দলাদলি ও অভিজ্ঞতা আজকের দিনে ভবিষ্যতের সতর্কতা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। কারণ ফ্রান্সে রাজনীতির ঘূর্ণি যত না বাস্তব ও ব্যবহারিক-জ্ঞানগত তার চেয়ে বেশি আদর্শগত ও আবেগ-সঞ্চালিত।

দীর্ঘ পঁয়চিত্রিশ বছর ধরে ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ পৃথিবীতে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কাজ করে নিজের অভিনবত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। এক অখন্ড বিশ্বে নানা ধরনের শাসনব্যবস্থার মধ্যে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্র একটি বিশেষ রূপ Model হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের মতে 'The Principal achievement of the Fifth Republic is to have gained considerable 'legitimach', that is widespread accentance that its political institutions are just.'' অর্থাৎ সংবিধান কর্তৃক গৃহিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং প্রতিষ্ঠানগুলির বৈধতা সার্বিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

০৯.৫ ❑ সারাংশ

এই একটিতে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পেছনে যে চারটি সাধারতন্ত্রের উদ্ভব ও পতন ঘটেছিল এবং চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের পতনের পর যে ঘটনাবলী পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কাঠামোকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সেই সমস্ত সাংবিধানিক কাঠামোও রাজনৈতিক ঘটনাবলী আলোচনা করা হয়েছে।

০৯.৬ ❑ অনুশীলনী

১। **রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ**

(১) পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন (৯.৪ পড়ুন)।

২। **সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন ঃ**

(১) পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে গণ ভোটের ভূমিকা কি? (পাতা ১৫৩)

(২) রাষ্ট্রীয় সভার কাজ কি? (পাতা ১৫৪)

০৯.৭ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

১. Dorothy Pickles—The Government and Politics of France, Vol. I and II.

২. Vincent Wright—The Government and Politics of france.

৩. D.H. Hanley, A.P., Kerr and N.H. Waites—Contemporary France.

৪. Alan R Ball—Modern Politics and Government.

৫. J. Devis Derbyshire & Law Derbyshire—Political Systems of the World.

———————

একক-১০ ❑ রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রিসভা এবং সংসদ

গঠন :

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১০.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

১০.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

১০.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা পর্যালোচনা

১০.৭ তুলনামূলক আলোচনা

১০.৮ মন্ত্রিসভা----সরকারের অন্যমুখ

১০.৯ প্রধানমন্ত্রী

১০.১০ মন্ত্রিসভা

১০.১১ সংসদ

১০.১২ সংসদের গঠন ও কার্যাবলী

১০.১৩ উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

১০.১৪ তুলনা

১০.১৫ সারাংশ

১০.১৬ অনুশীলনী

১০.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে ফ্রান্সের সরকারের শাসন বিভাগ ও আইনবিভাগ সম্পর্কে সম্যক ধারণার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ফ্রান্সের সরকার হচ্ছে রাষ্ট্রপতি-ব্যবস্থা ও সংসদীয়-ব্যবস্থার এক সংমিশ্রিত রূপ। তাই সরকার বর্ণনা করার জন্য রাষ্ট্রপতি ও সংসদ উভয়কে একত্রে আলোচনা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রিসভা শাসনবিভাগের দুইটি মুখ হিসাবে কিভাবে কাজ করে এবং সংসদের অর্থাৎ আইনবিভাগের সাথে রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রিসভার পারস্পরিক সম্পর্ক কি প্রকারের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে বিন্যাস করা হয়েছে তার আলোচনা করাই এই এককের উদ্দেশ্য।

১০.২ প্রস্তাবনা

সাধারণভাবে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার মধ্যে তুলনা করা হয়ে থাকে। এই দুইটি পৃথক শাসনকাঠামোর সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। এই দুই ধরনের শাসন কাঠামোর অসুবিধা দূরে রেখে শুধু সুবিধাগুলোকে একত্রিত করে একটি শাসনকাঠামো পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে চালু হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় উভয়ের সংমিশ্রিত রূপ হচ্ছে ফ্রান্সে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসন-কাঠামো। এই মিশ্র-রূপ কাঠামো প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে—একদিকে সরকারের স্থায়িত্ব ও অন্যদিকে সরকারের কাজে জনগণের অংশগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে একটি সুস্থিত ভারসাম্য বজায় রাখা। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের এই মিশ্র রূপ হচ্ছে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংবিধান থেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামোকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। এই স্বাতন্ত্রের মূলে আছে যে শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগ সেই দুটি বিভাগের আলোচনা এই এককে করা হয়েছে।

১০.৩ রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে ফরাসি রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন ফ্রান্সের দ্বি-মুখ বিশিষ্ট সরকারের একটি মুখ। যে কোনও দেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির মূল প্রশ্নটি হচ্ছে—'কে শাসন করে'? পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে এই প্রশ্নের উত্তর রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর জোড়াতালি এক কর্তৃত্ব। ফরাসি শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ভিন্‌সেন্ট রাইটের মতে "With the French Constitution of 1958 we enter the world not of Descartes but of Lewis Caroll. Ambiguity shrouds key areas of decision-making" অর্থাৎ সংক্ষেপে বললে—সিদ্ধান্ত গ্রহণের কিছু কিছু জায়গায় অস্পষ্টতা দেখা যায়।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি এখানে সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সমগ্র রাষ্ট্রকাঠামোর স্থায়িত্ব ও প্রবহমানতার মৌল প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রপতি ফরাসি জাতির প্রতীকী ও প্রকৃত শাসক। ফরাসি রাষ্ট্রপতি রাজত্বও করেন, শাসনও করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ৪৪ বছরে-পদ কার্যক্ষেত্রে দ্য গল শৈলী (the style of general De gaulle) অনুসরণ করেই চলেছে।

ডি. এন. হাসলে, এ. পি. কের এবং এন. এইচ. ওয়েট-এর মতে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কেবল নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান নহেন (ওয়ালটার বেজহটের মতে যিনি শুধুমাত্র সরকারের সম্ভ্রান্ত অংশ হিসাবে আনুষ্ঠানিক শোভা বর্ধন করেন)।

[Clearly the President of the Fith Republic is no longer merely a constitutional head of state that part of the executive dealing only with ceremonial, what Walter Bagehot would call 'the dignified parts of government' but a head of state who is politically active as well a key figure in the efficient parts of government.]

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গলের ভাষায়, "আমাদের শাসনব্যবস্থার মূল প্রস্তরখণ্ড হচ্ছে নতুন সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদ, যা ফরাসি জনসাধারণের বুদ্ধি ও অনুভূতি দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান ও পদ-প্রদর্শক হয়ে উঠেছে। (The keystone of our regime is the new institution of a President of the Republic, designated by the reason and feelings of the French people to be the head of state and guide of France)

রডি, এ্যান্ডারসন ও ক্রিস্টল এর মতে, "এটা স্পষ্ট যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির চাইতেও ফরাসি পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অধিকতর ক্ষমতা ভোগ করেন। তত্ত্বগতভাবে না হলেও, বাস্তবে পার্লামেন্টের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে থাকেন।

১০.৪ রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

মূল সংবিধানে মার্কিন ধাঁচে নির্বাচনী সংস্থার মারফত পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৬২ সালে সংবিধানের ৬ ও ৭ নং ধারার সংশোধিত রূপ হচ্ছে যে, সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের (১৮ বছর) ভিত্তিতে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 'দুই ব্যালট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। প্রথম ব্যলটে যদি কোন প্রার্থী উপযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করেন তখন প্রথমে নির্বাচনের তারিখের পরবর্তী রবিবারে দ্বিতীয় ব্যালটে ভোট নেওয়া হয়। দ্বিতীয় ব্যালট ভোটে কেবলমাত্র প্রথমবার ভোট গণনায় শীর্ষ স্থানাধিকারী দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। দ্বিতীয় ব্যালট গণনার সময় সাধারণ গরিষ্ঠতা দ্বারাই ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য ইচ্ছুক প্রার্থীকে অবশ্যই প্রথমে প্রার্থীপদের সমর্থনে ১০০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির সমর্থনসূচক স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তি বলতে বোঝায়—পার্লামেন্টের সদস্যগণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা, স্থানীয় কাউন্সিলর অথবা মেয়রগণ। এঁদের মধ্যে কমপক্ষে ১০টি ভিন্ন ভিন্ন ডিপার্টমেন্ট-এর প্রতিনিধি থাকবেন। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে প্রতি প্রার্থীকে ১০,০০০ ফ্রাঁ জমা রাখতে হয় (জামানত)। যদি কোনও প্রার্থী মোট প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫ শতাংশ লাভ করেন তা হলে জামানতের ১০,০০০ ফ্রাঁ সরকারি কোষাগার থেকে দান করা হয়। রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বী সকল প্রার্থীকেই নির্বচনী প্রচারের জন্য বেতার ও দূরদর্শনে প্রচারের সমান সুযোগ দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রপতি পদে একই ব্যক্তির পুনর্নির্বাচনের ব্যাপারে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিছু উল্লেখ নেই। ফলে ধরা হয় যে, একজন ব্যক্তি যতবার ইচ্ছা রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি পদে যোগ্যতার ব্যাপারেও পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কোনও কিছু উল্লেখ নেই। রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবার জন্য বংশ, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ বা জাতীয়তা কোনও কিছুরই উল্লেখ সংবিধানে নেই। শুধুমাত্র প্রার্থীকে ২৩ বছর বয়স্ক ফরাসি নাগরিক হতে হয়।

সাংবিধানিক সভা ফরাসি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্তরকম কাজকর্মের পরিচালনা করে, অভিযোগ বিচার করে ও ফলাফল ঘোষণা করে। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে এবং নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার আগে নির্বাচন সম্পর্কে কোনও অভিযোগ সাংবিধানিক সভার কাছে জানানো যায়। রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে নির্বাচনী প্রচার চলে পনেরো দিন। এই নির্বাচনী প্রচারকার্য পরিচালিত হয় পাঁচ জন সদস্যের এক বিশেষ কমিশন দ্বারা।

ফরাসি রাষ্ট্রপতির কার্যকালের মেয়াদ সাত বৎসর। কিন্তু এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করতে পারেন অথবা পদচ্যুত হতে পারেন। সংবিধান অনুসারে একমাত্র "রাষ্ট্রের গুরুতর অপরাধ" (high treason) সম্পর্কিত অভিযোগ প্রমাণিত হলেই রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগের বিচার করে থাকে ফ্রান্সের উচ্চ-বিচারালয়। রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে "গুরুতর রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ"-এর নিন্দাপ্রস্তাব পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে একই রূপে প্রকাশ্য ভোটে এবং প্রতিটি কক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত হলে উচ্চ-বিচারালয় রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিচার করে থাকে।

অবসরগ্রহণকারী রাষ্ট্রপতি কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পঁয়ত্রিশ দিন আগে বা কুড়ি দিনের কম সময়ে নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করা হয় না। কোনও কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ সেনেটের সভাপতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করেন। সাংবিধানিক সভা কোনও রাষ্ট্রপতিকে অযোগ্য ঘোষণা করলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সেনেটের সভাপতি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। তবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১ এবং ১২ নং ধারা সংক্রান্ত গণ-ভোটের ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারেন না—বিশেষত যেখানে সরকারের কোনও রাজনৈতিক শাখার সংগঠন বা চুক্তির অনুমোদন বা জাতীয় সভা বাতিল বা যে সমস্ত ক্ষেত্রে ৪৯, ৫০ এবং ৮৯ ধারা অনুযায়ী সরকার পরাজিত হতে পারে ও সংবিধান সংশোধনের ব্যাপার জড়িত থাকে। অযোগ্য রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের সিদ্ধান্তের কুড়ি দিন আগে নতুবা পঁয়ত্রিশ দিনেরও বেশি পরে এই রকম একটা সময়ের মধ্যে সাংবিধানিক সভাকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির সঙ্গে ফরাসি রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির তুলনা করে বলা হয় যে, (ক) ফরাসি রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি বিশেষ স্বতন্ত্র নির্বাচক সংস্থা দ্বারা (খ) ফরাসি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে নাগরিকদের মধ্যে

কোনও ভেদাভেদ করা হয় না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও অনুমোদন সিদ্ধ নাগরিক রাষ্ট্রপতি হতে পারে না। (গ) ফরাসি রাষ্ট্রপতি 'দুই ব্যালট' পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও প্রার্থী যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভে ব্যর্থ হন তবে কোনও প্রার্থীকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয় না। প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যার ভিত্তিতে প্রথম তিনজন প্রার্থীর নাম প্রতিনিধিসভার নিকট প্রেরণ করা হয়। প্রতিনিধি সভা (জাতীয় আইনসভা কংগ্রেসের দ্বিতীয় কক্ষ) ওই তিনজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে নির্বাচিত করে।

ফরাসি রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির মধ্যে তুলনা করে বলা যায় যে, ফরাসি রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি মার্কিন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি অপেক্ষা বেশি উন্মুক্ত, উদার, সহজ ও সরল।

১০.৫ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রচয়িতাগণের উদ্দেশ্য যাই থাকুক, ১৯৮৬ সালের মধ্য ফরাসি শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভিন্‌সেন্ট রাইটের মন্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, "practice transformed the nature and scope of office." বর্তমানে ফরাসি রাষ্ট্রপতি সাধারণভাবে পাঁচ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করেন—(১) রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান, (২) জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক, (৩) পৃষ্ঠপোষকতার উৎস, (৪) শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ, (৫) শাসনবিভাগীয় প্রধান। এই পাঁচ ধরনের কার্যাবলীর মধ্যে প্রথম চারটি কার্যাবলী মোটমুটি একই প্রকার থাকলেও শেষ কার্য অর্থাৎ শাসনবিভাগীয় প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতির কার্য রাষ্ট্রপতির রুচি ও মর্জি (taste and temperament) অনুসারে পরিচালিত হয়।

(১) রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতিকে অধিক সময় ব্যয় করতে হয়। বিভিন্ন বিদেশি দূত গ্রহণ, বিদেশে স্বদেশের দূত প্রেরণ এবং নিজে বিদেশ ভ্রমণ দ্বারা রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক পদের ভূমিকা পালন করেন। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশে বা অঞ্চলেও রাষ্ট্রপতি সফর করেন। এই সব প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাষ্ট্রপতির সফর রাষ্ট্রপতিকে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করে। আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে এতাবৎ পাঁচজন রাষ্ট্রপতির মধ্যে কিন্তু কাজের শৈলীর (style) পার্থক্য দেখা যায়।

(২) জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক হিসেবে রাষ্ট্রপতি হলেন জাতির নেতা, প্রাচীনত্বের প্রতীক, আধুনিকতার অগ্রদূত, ভবিষ্যতের ভবিতব্য। রাষ্ট্রপতি দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য সর্বদাই সর্বসাধারণের নিকট ত্যাগ স্বীকারের আবেদন জানান। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সের প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল জাতির নেতা হিসেবে ১৯৬২ সালে আলজিরিয়ায় সৈন্য বিদ্রোহের সময় জনসাধারণের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। দ্য গলের মতো নাটকীয় না হলেও রাষ্ট্রপতি মিতর ১৯৮২ সালে আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষিতে দূরদর্শনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন।

(৩) রাষ্ট্রপতির তৃতীয় ধরনের কাজ হল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিয়োগ সংক্রান্ত সাংবিধানিক ক্ষমতা প্রয়োগ। সৈন্যবাহিনী, আমলাতন্ত্র এবং বিচার বিভাগের সর্বোচ্চপদে নিয়োগ রাষ্ট্রপতি দ্বারাই সম্পাদিত

হয়। তবে তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ ক্ষমতা হল প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ। ১৯৮৬ সালের প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতির প্রভাব কাজ করে। প্রধানমন্ত্রীরা যখন পদত্যাগ করেন, তখন তাঁরা প্রায় বাধ্য হয়েই পদত্যাগ করেন। সুতরাং বলা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ফ্রান্সে সরকার গঠনের ব্যাপারেও ফরাসি রাষ্ট্রপতির পৃষ্ঠপোষকতা কাজ করে।

(৪) পৃষ্ঠপোষকতা বিতরণ ফরাসি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার একটি বিশেষ ক্ষেত্র। তিনি নিজের পছন্দমতো ব্যক্তিদের মন্ত্রিসভায় এবং উচ্চতর বিচারসভার সদস্যদের নিয়োগ করেন। ফ্রান্সে ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী সাংবিধানিক পরিষদের নয়জন সদস্যের মধ্যে তিনজন সদস্যকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রদূত, রাষ্ট্রীয় সভার সদস্য, প্রিফেক্ট, শিক্ষায়তনের রেকটর, হিসাব পরীক্ষা সংস্থার পদস্থ ব্যক্তি, সম্প্রচার বিভাগের পদস্থ ব্যক্তি প্রভৃতিকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। এই সমস্ত নিয়োগ দ্বারা সমগ্র দেশের চেহারাকে রাষ্ট্রপতি এক বিশিষ্টরূপে মণ্ডিত করতে পারেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা দ্বারা ফ্রান্সকে দ্য গলীয় রাষ্ট্রে (the Gaullist state) পরিণত করেছিলেন। দ্য গল নিযুক্ত ব্যক্তিদের দেশের প্রশাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে গিসকার্দ রাষ্ট্রপতি হিসেবে সমস্ত পদে নিজেদের পছন্দমতো ব্যক্তিদের নিয়োগ করেন। তার ফলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় চেহারা হয় 'গিসকার্দীয়' রাষ্ট্রব্যবস্থা (Giscardran state)। ১৯৯৩ সালে নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি মিতঁর একই ধারা অনুসরণ করে নিয়োগ কার্য পরিচালনা করায় সমাজতন্ত্রী দলের লোকেরাই সর্বত্র নিযুক্ত হতেন। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ফ্রান্সে কিন্তু "spoils system" প্রচলিত নেই। কেবল উচ্চতর ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদের ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতি নিজ পছন্দ ব্যক্তিদের নিয়োগ করে থাকেন। ফ্রান্সের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ সম্পন্ন হয় আইন দ্বারা, গরিষ্ঠতার হিসেব দ্বারা এবং সুপ্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি দ্বারা। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে প্রমাণিত যোগ্যতা দ্বারাই ফ্রান্সে নিয়োগ-নীতি পরিচালিত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি এমনভাবে তাঁর নিয়োগ কার্য সম্পন্ন করেন যাতে তাঁর বিশ্বস্ত অনুগতরা পুরষ্কৃত হন—তাঁর প্রতি বিরক্ত ও বিদ্রোহীরা শাস্তিপ্রাপ্ত হন। এইভাবে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিয়োগ ক্ষমতা দ্বারা তাঁর ব্যক্তিগত দলবল ভারী করে থাকেন। কাজের ফলে ফ্রান্সে শাসনব্যবস্থা কার্যত রাষ্ট্রপতির শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়।

(৫) ফরাসি রাষ্ট্রপতির চতুর্থ ধরনের কাজের প্রকৃতি রাজনৈতিক। ১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতিকে রাজনৈতিক দায়িত্বশূন্য (politically non-responsible) বলে ঘোষণা করার অর্থ ছিল রাষ্ট্রপতিকে রাজনীতির ঊর্ধ্বে (above party-politics) রাখা। কিন্তু বাস্তবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতিই নিজেকে দেশের রাজনীতির সাথে যুক্ত করে চলেছেন। কারণ সরকারের কার্যকরী প্রধানরূপে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিই সরকারি নীতির স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন এবং বিরোধীদের বক্তব্য খণ্ডন করেন। রাষ্ট্রপতি নিজেদর কাজের সমর্থনের জন্য নিজ দলের সদস্য, কর্মী, সমর্থকদের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন এবং নিজ সমর্থন-ভিত্তি (support base) বজায় রাখেন। সর্বোপরি তিনি নির্বাচনী রাজনীতিতে সক্রিয়ভবে যুক্ত থাকেন।

সুতরাং দেখা যায় যে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি তিন ধরনের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। প্রথমত, তিনি সরকারের সাধারণ মুখপাত্র এবং প্রধান পরিচালক (১৯৮৬-৮৮ সাল বাদে), দ্বিতীয়ত, তাঁর

সমর্থনকারী কোয়ালিশনের ঐক্যের তিনি অভিভাবক এবং তৃতীয়ত, ওই কোয়ালিশনের নির্বাচনী রাজনীতির পরিচালক, পথ-প্রদর্শক এবং এজেন্ট।

রাষ্ট্রপতির পঞ্চম এবং সর্বশেষ ধরনের কাজ হল নীতি প্রণয়ন। নীতি-প্রণেতার ভূমিকায় তিনি নির্দেশক। প্রধানমন্ত্রী সহ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ তাঁর সহকর্মী নহেন, তাঁর রাষ্ট্রপতির অনুগত ভৃত্য। কারণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংবিধানের অক্ষরগুলিকে সময়ে অসময়ে ক্ষুণ্ণ করে চলা এবং সংবিধানের আত্মাকে দৃঢ়ভাবে লঙ্ঘন করা ফরাসি রাষ্ট্রপতিদের কাজের শৈলী (style)। রাজনৈতিক জুজুর ভয় দেখিয়ে রাষ্ট্রপতিগণ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাজত্বকালে তাঁদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে পঁম্পিদু দেশবাসীকে দক্ষিণপন্থী জুজুর ভয় ও কমিউনিজমের ভূতের ভয়ও দেখিয়েছিলেন। গিসকার্দ দাস্তাঁই নিজেকে বামশক্তি-বিরোধীদের নেতা বলে ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম রাষ্ট্রপতি দ্য গল যেভাবে আলজেরীয় যুদ্ধ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন তা এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। দ্য গল, পঁম্পিদু, দাঁস্তাই জাঁক সিরাক প্রত্যেকেই পূর্বতন রাজত্বের অপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিলেন। দ্য গল বলেছিলেন যে, চতুর্থ সাধারণতন্ত্র ছিল বিশৃঙ্খলার রাজত্ব (chaotic and unstable regime)। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দ্বারা শৃঙ্খলা আনা। তাই শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর স্বাভাবিকের তুলনায় ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ৪৮ বছর পরেও জাঁক সিরাক ঐ একই সুরে চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের দলপ্রথার কুফলের কথা স্মরণ করে বলেছেন "ওই কালো-দিনগুলি যাতে আর ফিরে না আসে" তারজন্য রাষ্ট্রপতিকে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত এইভাবে প্রত্যেক রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য ফ্রান্সের সকলেই (প্রধানমন্ত্রী, সরকার, পার্লামেন্ট, অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী) স্বীকার করেছিলেন। ফরাসি জনসাধারণের কাছে রাষ্ট্রপতিই ছিলেন ফান্সের প্রকৃত ক্ষমতাকেন্দ্র। ফ্রান্সের নির্বাচনে নির্বাচক মণ্ডলীর নিকট বিবেচনার বিষয় থাকে একটাই—কোন্ ব্যক্তির উপর দেশ শাসনের দায়িত্ব থাকছে? ১৯৫৮ সালের সংবিধান এবং ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধন আইনের মধ্যেই আজকের দিনের ওই প্রশ্নের উত্তর ফরাসি লোকেরা খোঁজ পেয়েছে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ব্যাপ্তিতে। তবে সরকারের প্রধান হিসেবে ফরাসি রাষ্ট্রপতির ব্যাপক ক্ষমতা বৃদ্ধি একেবারে সাম্প্রতিককালের ঘটনা।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পর্কে হ্যানলে, কের এবং এয়েটস্ মন্তব্য করেছেন যে, "পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান যেরূপে নানাভাবে ব্যাখ্যায়িত হয় এবং সংবিধান নিজেই স্বেচ্ছাচারীভাবে পরিচালিত হয় তাতে স্বৈরতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রবণতা সংবিধান নিজেই বহন করে চলে, কারণ রাষ্ট্রপতি নিজেই সংবিধানের ব্যাখ্যা দ্বারা নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ফলে স্থিতিশীলতার পরিবর্তে সুদূর ভবিষ্যতে এই সংবিধান এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যেখানে সংবিধানের এক প্রকার ব্যাখ্যা অপর এক ব্যাখ্যাকে বাতিল করবে এবং এমন বিপজ্জনক পরিস্থিতি উদ্ভূত হবে যা কেবল তাত্ত্বিক বিতর্কেই সীমিত না থেকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি করবে এবং তার ফলে সরকারের ঘন ঘন উত্থান-পতন ঘটবে এবং বৈপ্লবিক বৈধতা লাভ করবে।"

১০.৬ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পর্যালোচনা

১৯৫৮ সালের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি এর কম বা বেশি কোনওটাই নন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্রথমত, শাসন বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত—রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি) ও মন্ত্রিসভা (সরকার)। এই মন্ত্রিসভার নেতা প্রধানমন্ত্রী সহসমস্ত মন্ত্রিসভা নীতি নির্ধারণ ও নীতি রূপায়ণের জন্য জাতীয় সভার নিকট যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

রাষ্ট্রপতি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মতই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ও রাজনৈতিক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান নন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি অন্যান্য সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে কম ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্বিতীয় ক্ষেত্রের পরিধি খুবই অল্প হওয়ায় পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি সর্বসাকুল্যে অত্যধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। দ্য গলের শাসনকালে সেটাই প্রমাণিত হয়েছে।

এতদ্‌সত্ত্বেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে যথেষ্টভাবে বজায় আছে, যথা—আইনসভার নিম্নকক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দ্বারা মন্ত্রিসভা বা সরকার গঠন এবং আইনসভার নিম্নকক্ষের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা—রাষ্ট্রপতি দ্য গল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার বা তত্যধিক ব্যবহার করেছিলেন। ফলে, ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা প্রায় রাষ্ট্রপতি পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে মনে হয়। যদিও এই মনে হওয়াটা অস্বাভাবিক, তা হলেও দ্য গলের উদাহরণে স্রষ্টা হয়ে স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকে বলেন যে, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান বস্তুত tailor-made for general De-Gaulle। আবার কেউ কেউ কিঞ্চিৎ ভিন্ন উক্তি করেন যে, প্রথম থেকে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান tailor-made for De-Gaulle ছিল না। পরবর্তী বছরগুলিতে সংবিধান সংশোধন দ্বারা ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান ক্রমে ক্রমে tailor-made for De-Gaulle হয়ে পড়েছিল। দ্য গলের ভাষায় ঃ 'রাষ্ট্রপতি যেহেতু জনসাধারণ দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন, তাই রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা হলেন রাষ্ট্রপতি'। যাই হোক, পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান হল দুই বিপরীত গণতান্ত্রিক রূপের-সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থার-সংমিশ্রিত (queen mixture of Parliamentary and Presidentia form of govt.)। এই কাঠামোতে, সীমিত ক্ষমতার পার্লামেন্ট ও একজন শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি আছেন। বস্তুত এই সাধারণতন্ত্রে প্রশাসনিক নৌকার কাণ্ডারি হলেন রাষ্ট্রপতি। দ্য গলও এই অভিমতে একমত হয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার পরিধির ব্যাপকতার নানা সম্ভাবনা দেখেছিলেন। বিশেষত সংবিধানের ৫নং ধারাতে, তাঁর ব্যাখ্যায়, রাষ্ট্রপতিকে দেশের প্রকৃত নেতা করা হয়েছে। দ্য গলের সময় বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্সের জনসাধারণ রাষ্ট্রপতি দ্য গলকেই প্রকৃত নেতা বলে মনে করতেন। রাষ্ট্রপতির অনেক কাজ বিশেষত পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে অনেক সিদ্ধান্ত তিনি নিজেই গ্রহণ করে বলবৎ করতেন। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা

এমন কি পররাষ্ট্র নীতির ব্যাপারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও দ্য গলের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জনসাধারণের একজনের মতোই খবরের কাগজের পাতায় প্রথম দেখতেন। দ্য গলের এই অদ্ভুত ক্ষমতা ও মন্ত্রিসভার নির্জীবতা সম্পর্কে ফ্র্যাসোঁয়া মিতঁর ও কস্তা ফ্লরেৎ সমালোচনা করেছিলেন। অন্যদিকে, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পঁম্পিদ্যু, দ্য গলের কাজকর্মকে অন্তত অসাংবিধানিক বলে ভাবেননি। বরং ১৯৬২-তে গণভোটে দ্য গলের বিতর্কিত সংশোধনী প্রস্তাবের পক্ষে জনগণের বিপুল অংশ রায় দেওয়ায় দ্য গলের কাজকর্মকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ—সাংবিধানিক বলে মনে করতেন। ১৯৭০ সালে দ্য গলের মৃত্যুর পর পঁম্পিদু বলেছিলেন—General De Gaulle is dead, France is a widow."

দ্য গলের মৃত্যুর পর নির্বাচনে পঁম্পিদু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি দ্য গল থেকে পৃথক কোন কিছু অদ্বিতীয় ছাপ সৃষ্টি করেননি বা দ্য গলের ধারণার কোনও জোড়াতালি দেননি। পঁম্পিদু পূর্ণাঙ্গভাবে দ্য গলপন্থী ছিলেন। কিন্তু দ্য গলের ন্যায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন না। পঁম্পিদুর শাসনকাল খুব অল্প। পঁম্পিদু অকালে মারা যাওয়াতে নতুন করে নির্বাচন হয়েছিল। তারপর ফরাসি দেশের রাষ্ট্রপতি হন দেস্ত্যাঁ—দেস্ত্যাঁর পর মিতঁর। তিনি গলপন্থী নন। তবে তাঁকে দ্য গল কাঠামোর বিরোধীও ঠিক বলা যায় না। এক কথায়, পঞ্চম সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রপতি ক্ষমতার নানা সম্ভাবনাময় দিক থাকায় রাষ্ট্রপতিপদে আসীন ব্যক্তি যা হতে চান—ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির কাঠামোর সাংবিধানিক রূপ তাই হয়—একথা অত্যুক্তি নয়।

১০.৭ তুলনামূলক আলোচনা

পৃথিবীতে অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে তুলনা করলে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি পদমর্যাদা ও ক্ষমতার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া যায়। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক সুযোগসুবিধা যত বেশি আছে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি সেই তুলনায় শাসনতান্ত্রিক একনায়কত্বের সুযোগ কম ভোগ করেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সুযোগ কম থাকলেও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি বাস্তবিকপক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মতই দাপটে দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে থাকেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ভাবমূর্তিই ফ্রান্সের পরিচয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ও ফরাসি রাষ্ট্রপতি উভয়েই শাসনবিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করলেও মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক-শাসক অন্যদিকে ফরাসি রাষ্ট্রপতি হলেন দ্বি-মুখবিশিষ্ট শাসনবিভাগের একটি মুখ। অর্থাৎ ফরাসি রাষ্ট্রপতির উপর রয়েছে ফ্রান্সের শাসনবিভাগের আংশিক কর্তৃত্ব। এই শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতির প্রক্রিয়াতেও পার্থক্য রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা অন্যদিকে ফ্রান্সে রয়েছে বহুদলীয় ব্যবস্থা। এই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পার্থক্য উভয় দেশের রাষ্ট্রপতির মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পার্থক্যের জন্য যদি মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফরাসি রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হন, তাহলে ফ্রান্সে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বহুদলীয় ব্যবস্থা থাকার জন্য মার্কিন রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা ফরাসি রাষ্ট্রপতি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ভূমিকা পালন করেন।

মার্কিন রাষ্ট্রপতির মন্ত্রিসভা বলে কিছু নেই। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাসহ পার্লামেন্টকে গুরুত্ব দিয়ে নিজের কাজ পরিচালনা করেন। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিকে সংসদীয় নিয়মকানুন মানতে হয়। কিন্তু মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে তা করতে হয় না। তাঁর সচিবসভা একান্তভাবে তাঁর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা কমিটি। এই ক্ষেত্রে মার্কিন রাষ্ট্রপতি ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা সুউচ্চ অবস্থায় আছেন। আর অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা—আইনসভার প্রতি দায়িত্বশীলতা—উভয়ের কারও নেই। ইমপিচমেন্ট পদ্ধতি উভয়ের ক্ষেত্রেই আছে। দেশের শাসনব্যবস্থার উপর উভয় দেশের রাষ্ট্রপতিগণ প্রায় সমান ক্ষমতায় প্রভাব বিস্তার করেন।

ফ্রান্স এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হওয়ায় ফরাসি রাষ্ট্রপতির কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাত্রা অনেক বেশি। মার্কিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য (autonomy) মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে রক্ষা করতে হয়। ফরাসি রাষ্ট্রপতির এই ধরনের কোনও বালাই নেই।

এককথায় বলা যায় যে—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি উভয়ে নিজের নিজের দেশের সর্বোচ্চ প্রকৃত শাসক ও জননেতা। পার্থক্য যা, তা কেবল দুই দেশের রাজনৈতিক নানা সংস্কৃতির জন্য, আমেরিকান রাজনৈতিক-সংস্কৃতি ও ফরাসি রাজনৈতিক-সংস্কৃতির ভিন্নতার জন্য। আর আমেরিকার রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে মার্কিন রাষ্ট্রপতি একক শাসক (single executive) কিন্তু রাষ্ট্রপতি ও সংসদীয় রূপের মিশ্র গণতন্ত্র হওয়ায় ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি একক শাসক নন। মন্ত্রিসভা হল ফ্রান্সের সরকার, আর রাষ্ট্রপতি হলেন ফ্রান্সের রাজনৈতিক নেতা।

তাই শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হতে উভয়েই সমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সংগঠন হিসেবে কাজ করেন। সুতরাং দুই দেশের রাষ্ট্রপতির মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য আলোচনায় বলা যায় যে-দুই দেশের দুই-রাষ্ট্রপতি একটি তাসের দুটি পিঠ।

সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির কোনও তুলনা হয় না। উভয়দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো সামগ্রিকভাবে সংসদীয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত রূপের হলেও সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর প্রথম জন। সুইজারল্যান্ডের ৭ জন সদস্যের রাষ্ট্রপতিমণ্ডলী হতে প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে এক বছরের জন্য রাষ্ট্রপতিমণ্ডলীর 'প্রথম জন' হিসাবে সুইজারল্যান্ডের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করেন।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের ১৯৮২ সালের সংবিধানের নতুনভাবে সৃষ্ট রাষ্ট্রপতি পদের সঙ্গে কিছুটা তুলনীয়। গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি সংসদীয় ব্যবস্থা রীতি অনুসারে কেবল আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু সরকারের কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে তিনি নিজের দায়িত্ব বা কোনও ক্ষমতা প্রয়োগ না করে জাতীয় কংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইন ঘোষণা করেন বা সরকারি আদেশ জারী করেন, প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রীয় পরিষদের মহাসচিবকে নিযুক্ত ও অপসারিত করেন। জাতীয় গণকংগ্রেস ও তার স্থায়ী কমিটির

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি রাষ্ট্রীয় পদক ও সম্মানজনক উপাধি বিতরণ করেন, বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, সামরিক আইন জারী, যুদ্ধ ঘোষণা এবং সৈন্য সমাবেশ করেন।

কিন্তু প্রজাতন্ত্রী চিন একদলীয় সরকারের রাষ্ট্র। উপরন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন দেশের এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা জাতীয় গণ কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটির দ্বারা। কিন্তু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ফরাসি জনসাধারণ দ্বারা এবং তিনি কাজ করেন বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে। তার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কিন্তু রাজনৈতিক ব্যক্তি নন। অন্যদিকে, গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের মতই ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিকভাবে দায়িত্বশীল শাসক না হয়েও দেশের প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে কাজ করেন। গণ প্রজাতন্ত্রী চিনের রাষ্ট্রপতি যেখানে দেশের নায়ক হিসেবেই জনসাধারণের কাছে গণ্য হন না, সেখানে ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি দেশের মানুষের কাছে প্রায় একনায়ক হিসেবে পরিগণিত হন।

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ভারতের রাষ্ট্রপতির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য হল যে, দুজনকেই সংসদীয় রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। তবে ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোতে রাষ্ট্রপতি হলেন নিয়মতান্ত্রিক শাসক মাত্র। ৪২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের পর ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ইংলন্ডের রানির চেয়েও কম। অন্যদিক ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অনেক বেশি। জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতা ও গণভোট গ্রহণের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে প্রায় প্রকৃত শাসক হিসেবে ফ্রান্সের প্রথম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। ডরোথি পিকলসের মন্তব্য উদ্ধৃত করে ফরাসি রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে আলোচনা শেষ করা যায়। ডরোথি পিকলস মন্তব্য করেছেন—"The general assumption that the President and not the Prime Minister is the real source of power in the Fifth Republic is based on the nature of the Presidential functions as defined by the constitution, but on the imponderables related to personalities and to the problems of the first year of the regime, as well as General De Gaulle's own interpretation of his role—on what has come to be known as 'the style of the General'. আসলে ফরাসি শাসনতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা অনেকটাই স্থির হয়ে গেছে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধানতম স্থপতি রাষ্ট্রপতি দ্য গলের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের ছাঁচ অনুসারে।

১০.৮ মন্ত্রিসভা—সরকারের অন্যমুখ

ফরাসি মন্ত্রিসভা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের শাসনবিভাগ হিসেবে গুরুত্ব অর্জন করে। ১৯৮৮ সালের পর মিতরঁ রাষ্ট্রপতি থাকলেও তাঁর বিরোধী দলের নেতা চিরাক ১৯৮৬-৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব স্বাধীন ও সুদৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। ১৯৮৮ সালের পর থেকে ফরাসি রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার মধ্যে কাজের ভাগাভাগি (job division) হয়ে যায় এইভাবে—প্রতিরক্ষা, ইউরোপীয় ও বৈদেশিক ব্যাপার দেখেন রাষ্ট্রপতি এবং আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ দেখেন প্রধানমন্ত্রী। এইভাবে

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ভারসাম্য (balance) বজায় রেখে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সাংবিধানিক কাঠামো কাজ করে চলেছে। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমানে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে শাসনবিভাগে রাষ্ট্রপতিকেন্দ্রিকতার যুগের অবসান ঘটেছে। এই পরিবর্তনের আগেও অবশ্য পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতেন। বাস্তবিক পক্ষে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফরাসি প্রধানমন্ত্রীকে পাঁচ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনের কাজ করতে হয়। যথা—(১) সরকারি নীতিসমূহের সঠিক সমন্বয় সাধন, (২) সরকারি আইন যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুমোদিত হয় তার জন্য পার্লামেন্টের সাথে যোগাযোগ রাখা, (৩) সরকারি কোয়ালিশনে বৃহৎ দলের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা, (৪) সরকারি কোয়ালিশনের বিভিন্ন শরিকের বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী দাবির মধ্যে মীমাংসা করা, (৫) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের মূল কেন্দ্রীয় শক্তি হিসাবে কাজ করা।

ভিন্‌সেন্ট রাইটের মতে "The Prime Minister provides a two-way channel between the President on the one hand and, on the other, the Government, Parliament, the ruling party coalition and the administration. In short, he initiates, corrdinates, arbitrates, concentrates and implements. It is the Prime Minister who heads Frances vash administrative machine, his power over the implementation of politics is very much greater than that of the President of the Republic."

সংবিধানের ২০নং ধারায় বলা আছে যে—প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের প্রতি দায়িত্বশীল থেকে দেশের শাসন-নীতি নির্ধারণ করবেন। রাষ্ট্রপতির ভূমিকা এই ক্ষেত্রে সংবিধানের ৫নং ধারা মতো অভিভাবকের ভূমিকামাত্র। ফরাসি মন্ত্রিসভার ভূমিকাই হল ফ্রান্সের শাসনের ভূমিকা। পদাধিকারবলে মন্ত্রিসভার সভাপতি হলেও সাধারণত মন্ত্রিসভা বিশেষত প্রধানমন্ত্রী দেশ শাসনের নীতির জন্য জনসাধারণের নিকট দায়িত্বশীল থাকেন।

১০.৯ প্রধানমন্ত্রী

ফরাসি মন্ত্রিসভার গঠন অনুযায়ী প্রমাণিত হয়, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রিক ফ্রান্সে মন্ত্রিপরিষদ-শাসিত বা সংসদীয় সরকারের শাসন প্রবর্তিত আছে। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী "প্রিমিয়ার" (Premier) নামে অভিহিত। সাংবিধানিক অর্থে তাঁর ক্ষমতাও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতোই। ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার অস্থায়িত্বে অভিজ্ঞতালব্ধ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রচয়িতাগণ এমন ভূমিকা প্রধানমন্ত্রীর জন্য স্থির করেছেন যেখানে মন্ত্রিসভার স্থায়িত্বের মাত্রা অধিক হয়। 'প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী বিভাগীয় মন্ত্রীর স্বাক্ষরে গৃহীত হওয়া'—পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে অপরিহার্য বলে ধরা হয়েছে। এমতাবস্থায় ফরাসি প্রিমিয়ারের ভূমিকা সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতো হলেও নানা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার বাধায় ফরাসি প্রিমিয়ারের ক্ষমতা বাস্তবিকপক্ষে সীমিত, ভূমিকাও নিষ্প্রভ।

প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও তিনি মন্ত্রিসভার সভায় পৌরোহিত্য করেন (৮নং ধারা)। পার্লামেন্টে তাঁর সরকারের ঘোষিত নীতির পক্ষে তিনি বক্তব্য রাখেন। সরকারি প্রশাসনকে তিনি পরিচালনা করেন। পার্লামেন্টে বিভিন্ন সদস্যগণের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রশ্নের উত্তর তাঁকেই মূলত দিতে হয়। তিনিই সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় সভায় তাঁর সরকারের প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করেন (৪২ নং ধারা) যে সমস্ত ক্ষেত্রে সংবিধান কর্তৃক রাষ্ট্রপতি দ্বারা নিয়োগের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ নেই, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতির পরিবর্তে তিনি প্রতিরক্ষা দপ্তরের কমিটি ও কাউন্সিলরগুলির সভাপতি হিসেবে কাজ করতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী যদি স্পষ্টভাবে (authorised) হন, তা হলে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সভায় সভাপতি হিসেবেও কাজ করেন (২১ ও নং ধারা)। ৩৯ নং ধারা অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রিদের মত প্রধানমন্ত্রী ও পার্লামেন্টে বিল (Bill) উত্থাপন করতে পারেন কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে অথবা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অনুরোধে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন বসতে পারে, ওই নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য আহূত বিশেষ অধিবেশন একমাত্র প্রধানমন্ত্রীই আহ্বান করতে পারেন (২৯ নং ধারা)। এ ছাড়া, সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সভা বাতিলের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ প্রয়োজন হয় (১২ নং ধারা) এবং ১৬ নং ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণের সাহায্যেই জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ঘোষণা জারি করেন।

১০.১০ মন্ত্রিসভা

ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা যৌথদায়িত্বশীলতা নীতির উপর গঠিত। সংবিধানের ১৩ ও ২০ নং ধারার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের যৌথ দায়িত্বের অর্থই প্রকাশ পায়। সংবিধানের ৩৮নং ধারাতেও এই তাৎপর্যের সমর্থন পাওয়া যায়। ৩৮নং ধারায় বলা হয়েছে যে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য মন্ত্রিদপ্তরের নীতি রূপায়ণে বা পার্লামেন্টের সম্মতিসূচক অনুরোধে রাষ্ট্রীয় সভার সাথে আলোচনার পর মন্ত্রিসভা কোনও আইন প্রণয়নের ব্যাপারে অস্থায়ী আইন (ordinance) ঘোষণা করতে পারে। ২০নং ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সরকার অর্থাৎ মন্ত্রিসভা জাতীয় নীতি নির্ধারণ ও পরিচালনা করবেন। এই প্রসঙ্গে পার্লামেন্টের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে ৪৯নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার সাথে আলোচনার পর প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় সভার নিকট সরকারের কর্মসূচী বা সাধারণ সরকারি নীতির দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করবেন। জাতীয় সভায় কোনও সরকারি প্রস্তাব পরাজিত হলে সমগ্র সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকে। দ্বিতীয়ত, জাতীয়সভা সেন্সর-ভোটের মাধ্যমেও সরকারকে পরাজিত করার সুযোগ পায়। সেন্সর-প্রস্তাব আনয়নের জন্য জাতীয় সভার এক-দশমাংশ সদস্যের সই চাই ও আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে ওই সেন্সর-প্রস্তাব অনুমোদিত হলে সরকার পদত্যাগ করে। কিন্তু ওই প্রস্তাব পরাস্ত হলে ওই একই অধিবেশনে একবার পরাস্ত-সেন্সর প্রস্তাবের স্বাক্ষরকারী-সদস্যগণ পুনরায় দ্বিতীয়বার কোনও সেন্সর-প্রস্তাব আনয়ন করতে পারেন না। তৃতীয়ত, মন্ত্রিসভায় আলোচনার পর

প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সভায় সরকারের প্রতি আস্থা-প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। এই ধরনের প্রস্তাবের উপর যদি কোনও সেন্সর-প্রস্তাব বিরোধী-পক্ষ হতে না আসে তা হলে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত আস্থাসূচক প্রস্তাব স্বাভাবিকভাবে অনুমোদিত হয়ে যায় বলে ধরা হয়। আর যদি সেন্সর-প্রস্তাব আসে, তা হলে সরকার-নীতির উপর সেন্সর-প্রস্তাব আনবার পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। অর্থাৎ আস্থাসূচক-ভোটের বেলাতেও সেন্সর প্রস্তাব আগের পদ্ধতিতে তোলা হয় ও অনুমোদিত হয়। এক্ষেত্রে, সেন্সর-প্রস্তাব পরাস্ত হলে প্রধানমন্ত্রীর আস্থাসূচক প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়ে যায়। এখানে প্রধানমন্ত্রীর আস্থাসূচক প্রস্তাবের উপর সেন্সর আনায় একজন সদস্য সেন্সর-প্রস্তাবে সই করতে পারেন সেই সম্পর্কে কোনও বাধানিষেধের উল্লেখ নেই। যখন জাতীয় সভায় কোনও সেন্সর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়ে যায় অথবা কোনও সরকারি নীতি বা কর্মসূচীকে প্রত্যাখান করে, ৫৪০ নং ধারা অনুযায়ী তখন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কাছে সরকারের পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

সংবিধানের মন্ত্রিসভার গঠন ও দায়িত্বশীলতা বা মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের যৌথ প্রকৃতি যাই হোক না কেন পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি জেনারেল দ্য গলের দাপটে মন্ত্রিসভার কার্যাবলী বাস্তবে নানাভাবে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। মন্ত্রিসভার ক্ষমতা হ্রাসের এরূপ অবস্থার জন্য কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত, সংবিধানের ২৩নং ধারা—যেখানে বলা আছে যে, সংসদের মন্ত্রিসভার সদস্যপদ কোনও বাদে, কোনও জাতীয় ব্যবসা ও বৃত্তি বা সরকারি চাকরিতে যুক্ত থাকার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। অবশ্য এই সমস্ত বাধানিষেধগুলি হতে রেহাই পেতে হলে নির্দিষ্ট মৌলিক আইন (organic law) প্রণয়ন করতে হয়। উপরোক্ত ব্যাপারগুলিতে জড়িত এমন কেউ যদি মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন এক্ষেত্রে ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ার পর কেউ সংসদের সদস্য থাকতে পারেন না। এইরকম অদ্ভুত ব্যবস্থার কারণ হিসেবে অতীত দিনে ফ্রান্সের সরকারের উত্থান-পতনের তিক্ত অভিজ্ঞতাকেই দায়ী করা যেতে পারে। জেনারেল দ্য গল পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান-রচয়িতাগণকে ২৫নং ধারাটি প্রবর্তনের জন্য বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। এই ২৫ নং ধারায় উপকার ফ্রান্সের রাজনীতিতে যাই হোক না কেন, এটা যে সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতিবিরুদ্ধ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার উদ্ভূত হয় প্রতিনিধিসভার সংখ্যগরিষ্ঠদের মধ্যে থেকে এবং সরকার ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকে যতক্ষণ সে জনপ্রতিনিধিসভার আস্থাভাজন থাকে। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টে মন্ত্রিগণ বসতে পারেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু কোনও প্রকার ভোট দানের অধিকার তাঁদের থাকে না। মন্ত্রিগণ কর্তৃক পার্লামেন্টের আলোচনায় অংশগ্রহণই সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে মন্ত্রী বা পার্লামেন্টের সদস্য কেউই পূর্ণ মর্যাদা পান না।

দ্য গল ফ্রান্সের সংসদীয় ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণকে দলাদলির বাইরে রেখে কেবলমাত্র রাষ্ট্রনেতা হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন, যদিও তা বাস্তবে কখনও সম্ভব হয়নি। কারণ তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই নিজস্ব দলীয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মন্ত্রিগণ পার্লামেন্টের দৈনন্দিন জীবনের রাজনৈতিক উত্তাপে নিজেদেরকে উত্তপ্ত করবার সুযোগ না পেলেও পার্লামেন্টের বাইরে তাঁর দলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তাঁদের পক্ষে দলের বাইরে থাকা কখনই সম্ভব হয় না।

ফরাসি মন্ত্রিসভা কেবলমাত্র সংসদের সভ্যগণ নিয়েই গঠিত নয়। ফ্রান্সে মন্ত্রিসভায় আমলা, কলাকুশলী, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি স্থান গ্রহণ করেন। তাঁরা কেউই পার্লামেন্টের সদস্য নন বা হতেও চান না। জেনারেল দ্য গল প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভাকে "অরাজনীতিক" (opolitical) করে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রনীতিকে রাজনীতি হতে পৃথক করতে চেয়েছিলেন। ফলে মন্ত্রিসভার কার্যাবলী পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সামান্য স্বতন্ত্র ধরনের হয়ে পড়েছে। এই ধরনের মন্ত্রিসভাকে অন্য কোন সংসদীয় মন্ত্রিসভার সঙ্গে তুলনা করা চলে না এবং একে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সচিবসভার মত দেখায়।

ফরাসি মন্ত্রিসভা শাসননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে স্বাধীন। জাতির সম্মুখে সমস্ত প্রকার দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ মন্ত্রিসভা আলোচনা করে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি নীতি নির্ধারণের জন্য মন্ত্রিসভা একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যৌথ দায়িত্বের ভিত্তিতে মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টের কাছে বিশ্বের দরবারে ভবিষ্যতের কর্মসূচী প্রকাশ করে। দ্য গলের আমলে মন্ত্রিসভার আলোচনা খুবই দীর্ঘ হত এবং সেই আলেচনার সমস্তটাই হত দ্য গলের প্রস্তাবিত নির্দেশকে কেন্দ্র করে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিসভা জাতীয়নীতি নির্ধারণের ব্যস্ত (সংবিধানের ১৯ নং ধারা)—এইরকম ঘটনা খুবই কমই দেখা যায়। বরং রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে বা এলিজিতে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রূপায়ণে মন্ত্রিসভার বিভিন্ন আন্তঃবিভাগ কমিটি গঠন করা হয়। বস্তুত ফরাসি মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির হাতের এক যন্ত্ররূপে কাজ কাজ করত এবং এখন তাই করে। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষত প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র নীতিতে মন্ত্রিসভাকে আদৌ আমল দেওয়া হয় না, এই সমস্ত ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সর্বময় কর্তৃত্ব প্রকাশ পায়।

এই সমস্ত কিছুর ফলে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থায় যে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটেছে, তা হল মন্ত্রিসভার স্থায়িত্ব। স্থায়ী মন্ত্রিসভা ফরাসিদের কাছে ছিল স্বপ্নমাত্র। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের মন্ত্রিসভাগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। শুধু তাই নয়, একজন ব্যক্তি একই মন্ত্রিদপ্তরে বহুদিন ধরে কাজও করেছেন। সরকারে এইরূপ দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে না হলেও অনেকাংশে আমেরিকা বা ব্রিটেনের সরকারি স্থায়িত্বের সাথে তুলনীয়।

সংসদ মন্ত্রিসভার কার্যাবলীকে মোটামুটি তিনটি উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমত, অধিবেশন চলাকালীন সময়ে মত বিনিময়, বিতর্ক, আলোচনা প্রভৃতি হয়। এই সময় বিরোধীদের সরকারের সমালোচনার সুযোগ পায়। দ্বিতীয়, উত্থাপিত বিলগুলি পরীক্ষার জন্য যে কমিশনগুলিতে পাঠানো হয় সেই সমস্ত কমিশন বিলগুলি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করে, জাতীয় সভায় বিতর্কিত বিল আলোচনা হবার আগে কমিশন তার বিবৃতি প্রকাশ করে। এই ধরনের কমিশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সরকারি আমলাদের ডেকে বিল সম্পর্কে তাঁদের কাছে ব্যাখ্যা যথার্থতা জিজ্ঞাসা করতে পারে। এই ধরনের স্থায়ী কমিশন ছাড়াও কিছু কিছু বিশেষ কমিশন গঠিত হতে পারে। এই রকম বিশেষ কমিশনগুলি ৩০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। এই ৩০ জনের মধ্যে ১৫ জন অবশ্যই স্থায়ি কমিশনের সদস্যদের মধ্যে থেকে নেওয়া হয়। কোন বিলকে

একটি স্থায়ী কমিশনের নিকট প্রেরণ না করে এই বিশেষ কমিশনে পাঠানোও হয়। তবে এই ব্যাপারে কি পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে তা নির্ধারণ করে প্রতিনিধিসভা নিজে। অবশ্য এই রকম ঘটনা সবসময় ঘটে না। ফলে এই নিয়ম অপেক্ষাকৃত ব্যতিক্রম বলে বিবেচিত হয়। এই কমিটিগুলি ছাড়া ব্রিটেনের সিলেক্ট কমিটির মতো ফ্রা রয়েছে তদন্ত কমিশন। রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ পরিচালনা ও আর্থিক তত্ত্বাবধান করবার জন্য পরিদর্শক কমিটি রয়েছে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেও সংসদীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিদিগের উপর ও প্রধানমন্ত্রীর উপর নিয়ন্ত্রণ রাখেন। সরকারের নিকট সংসদ সদস্যগণ যে সমস্ত প্রশ্ন লিখিত আকারে পেশ করেন, সেই প্রশ্নগুলি জার্নাল অফিসিয়ালে ছাপা হয়, মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এক মাসের মধ্যে দিয়ে দেন সেই উত্তরগুলিও জার্নাল অফিসিয়ালে প্রকাশিত হয়। তৃতীয়ত, জার্নাল অফিসিয়ালের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে সংসদ। জার্নাল অফিসিয়ালে ছাপা প্রশ্নের উত্তর দিতে মন্ত্রিরা একমাসেরও বেশি দেরী করতে পারেন। আবার জনস্বার্থের কোনও দিক যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইদিকে লক্ষ্য রেখে মন্ত্রি জার্নাল অফিসিয়েলের কোন প্রশ্নের উত্তর নাও দিতে পারেন। অথবা কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি প্রশ্নকারী সদস্যকে 'মৌখিক' উত্তর পেলে তিনি সন্তুষ্ট কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন। যদি মৌখিক উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হন, তা হলে, বিতর্ক বা বিতর্কহীন সভায় তিনি মন্ত্রির কাছ থেকে তাঁর প্রশ্নের উত্তর পান। বিতর্কহীন সভায় সংশ্লিষ্ট কক্ষের সভাপতি প্রশ্নাকরী সদস্যকে পাঁচ মিনিট সময় বক্তৃতা করতে দেন। তারপর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি উত্তর দেন। আর বিতর্ক সভায় আধঘণ্টার মধ্যে প্রশ্নকারীকে তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে হয়। তারপর মন্ত্রি উত্তর দেন। এরপর সভার অন্যান্য সদস্যরা যদি ইচ্ছা করেন তা হলে প্রত্যেক পনের মিনিট সময়ের মধ্যে নিজ নিজ বক্তব্য রাখতে পারেন। এর পরও যদি প্রয়োজন মনে হয় তা হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রি সমস্ত কিছু বক্তব্যের একটি সামগ্রিক উত্তর দেন।

পরিশেষে, মন্ত্রিসভাকে ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সংসদের প্রকৃত হাতিয়ার হল সেন্সস-প্রস্তাব। সেন্সর পাশ হলে সরকার সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করে। তবে, অন্যান্য সংসদীয় ব্যবস্থার মতো পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংসদে সেন্সর-প্রস্তাব ব্যাপারটি অত সহজ নয়, বরং বর্তমান সংসদে সেন্সর প্রস্তাব ব্যাপারটি অনেক ঘোলাটে, জোলো ও কড়া মেজাজের। তাই উপসংহারে বলা যায় যে, সরকারের উপর পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংসদের নিয়ন্ত্রণ ও তৎসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার সুযোগ কম।

অন্যান্য দেশের মন্ত্রিসভার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় বলা যায় যে, ফ্রান্সের মন্ত্রিসভার গঠন যুক্তরাজ্য বা ভারতবর্ষের মতো। কিন্তু ফরাসি মন্ত্রিসভার শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনটিই যুক্তরাজ্য বা ভারতের মতো নয়, বরং ফরাসি মন্ত্রিসভার কাঠামো মার্কিন রাষ্ট্রপতির সচিবসভা ও গণ-প্রজাতন্ত্রী চিনের মন্ত্রিসভার মতো। শেষোক্ত দুটি দেশে শাসনতন্ত্রের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির তুলনায় মন্ত্রিসভা অনেকখানি নিষ্প্রভ। ফরাসি রাষ্ট্রপতি যেভাবে প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, মন্ত্রিসভাও ততোধিক নিষ্প্রভ। অন্যদিকে, ভারতবর্ষে ও যুক্তরাজ্যের শাসন কাঠামোতে মন্ত্রিসভা এক সুপ্রতিভ স্থান লাভ করেছে। ভারত ও যুক্তরাজ্যের জনগণ মন্ত্রিসভার খবরাখবর সংগ্রহে সর্বদা উন্মুখ ও উদ্‌গ্রীব থাকে। কিন্তু

ফ্রান্সের জনগণ ফরাসি রাষ্ট্রপতির ব্যাপারে সর্বদা আগ্রহশীল থাকে। মার্কিন জনগণও রাষ্ট্রপতিকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দান করে। গণ-প্রজাতন্ত্রী চিনের জনগণের দৃষ্টি সর্বদা থাকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের উপর। এর কারণ হল যে, ভারতবর্ষে ও যুক্তরাজ্যে মন্ত্রিসভাই দেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক নেতা, তাই ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা আকৃতিতে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মতো হলেও প্রকৃতিতে মার্কিন সচিবসভা অথবা গণ-প্রজাতন্ত্রী চিনের মন্ত্রিসভার সঙ্গে তুলনীয়।

ফরাসি ক্যাবিটেনের সঙ্গে মার্কিন ক্যাবিনেটের সাদৃশ্য আছে। প্রত্যেক দেশেই মন্ত্রিসভা ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট। প্রত্যেক দেশে মন্ত্রিসভায় কারিগরিজ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের দেখা যায়। উভয় ক্যাবিনেটেই আমলাতন্ত্রের (civil servant) প্রধান্য দেখা যায়। তবে ফরাসি ক্যাবিনেট ও মার্কিন ক্যাবিনেটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বৈসাদৃশ্য হল যে, মার্কিন ক্যাবিনেট হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সচিবসভা। কিন্তু ফরাসি মন্ত্রিসভা হচ্ছে দেশের অন্য আর একটি শাসনবিভাগ (other executive)। ফ্রান্সে ক্যাবিটেনের গুরুত্ব সম্পর্কে ভিনসেন্ট রাইট বলেছেন যে, "It is the central coordinating and implementing instrument of executive domestic policy making on which both President and Prime Minister depend."

ফরাসি প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি, প্রশাসনিক কৌশলগত অবস্থান এবং ক্যাবিনেটের যোগ্যতা ও কাজকর্ম ছাড়াও আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। যেমন—প্রথমত, প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব রাজনৈতিক ভাবমূর্তি, দ্বিতীয়, দেশের সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং তৃতীয়ত, প্রধানমন্ত্রীর পেছনে রাষ্ট্রপতির সমর্থন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অধিকাংশ সময়েই শাসনবিভাগ কাজ করেছে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস তথা ব্যাপক মতৈক্যের ভিত্তিতে গঠিত সুমধুর সম্পর্কের উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক যন্ত্রণাদায়ক। কারণ হিসাবে ভিনসেন্ট রাইট যথার্থই বলেছেন—"The Prime Minister faces a number of dilemmas; if he succeeds and is popular he may be as rival but if he fails he will be considered in capable .....The Experience of Barre suggests that a President must know not only whom to appoint as Prime Minister but also when to dismiss him."

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের মন্ত্রিসভা সম্পর্কে দুটি গবেষণাপত্রে দেখা যায় যে, ফরাসি মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যই হলেন পুরুষ, বিবাহিত, মধ্যবয়স্ক এবং বুর্জোয়া (অভিজাত), উত্তর-ফ্রান্সের অধিবাসী এবং শিক্ষিত (আইনশাস্ত্র অথবা রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এবং প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবী, প্রশাসক, শিল্পপতি, আর্থিক পুঁজিপতিদের সঙ্গে যোগাযোগধন্য ব্যক্তি। ১৯৮১ সালের পর সমাজতন্ত্রী মন্ত্রিরাও প্রায় একইরকম। তবে তাঁরা কম সম্পত্তিবান এবং অধিকাংশই দক্ষিণ ফ্রান্সের অধিবাসী এবং শিল্পপতি ও আর্থিক পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগও কম।

উপসংহারে বলা যায় যে, ফ্রান্সের বিদ্যমান সমাজব্যবস্থার রক্ষক হিসেবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার মধ্যে মৌলিক কোনও মতপার্থক্য দীর্ঘস্থায়ীভাবে থাকতে পারে না। কারণ প্রত্যেকেই

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার রক্ষক হিসাবে ভূমিকা পালন করেন। এরা একই শাসনবিভাগের দুটি মুখ বা দুটি পিঠ। সুতরাং এদের মুখ্যগত পার্থক্য থাকলেও উদরগত কোন পার্থক্য নেই, এদের পদ সঞ্চালনের (সামাজিক ভিত্তি) কোন পার্থক্য নেই। তাই পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সম্পর্কে মধ্যে উত্তেজনা থাকলেও, সেই উত্তেজনার বিষয় থাকে দক্ষতার ক্ষেত্র (areas of competence) ও মাত্রা সম্পর্কে। এই উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হলে শাসনব্যবস্থার পক্ষে তা নিশ্চিত ক্ষতিকর। বিশেষত সরকারের সিদ্ধান্তসমূহের সমন্বয়ের ব্যাপারে ক্ষতি হয়। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হল সরকারি সিদ্ধান্ত সমূহের সমন্বয় সাধন। তাই এই সমন্বয় কাজই ফরাসি রাষ্ট্রপতি ও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী-সহ মন্ত্রিসভার সম্পর্কের মৌল আধার। ১৯৯৩ সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে সমাজতন্ত্রীদের পরাজয় প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি করেছিল। একই অবস্থা হয়েছে ২০০২ সালে ফরাসি রাষ্ট্রপতি পাত নির্বাচনের পরেও। কারণ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুই মেরু বাসিন্দা। পরবর্তী সংসদ নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চলতে হবে।

১০.১১ সংসদ

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, এই শাসনব্যবস্থায় ফরাসি পার্লামেন্টকে দুর্বল করা হয়েছে। ফ্রান্সে পার্লামেন্ট বা সংসদের ক্ষমতার ক্রমবিকাশকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়—(ক) রাজতন্ত্রের কাল ১৮১৪-১৮৮৮, (খ) পার্লামেন্ট এক অক্ষম, অপদার্থ দায়িত্বহীন, সময় অপচয়ের সংস্থা ছিল ১৮৭৭-১৯৯৪ সাল অবধি, (গ) ধীরগতিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতার অবমূল্যায়নের যুগ ১৯১৮-১৯৮৫ সাল, (ঘ) বর্তমান সংবিধানে ফরাসি পার্লামেন্টকে দুর্বল করা হলেও জনসাধারণের দীর্ঘদিনের অভ্যাস ফরাসি পার্লামেন্টকে এখনও সরকারি নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। এখনও ফ্রান্সের সরকার বা মন্ত্রিসভা ফ্রান্সের পার্লামেন্টের উপর নির্ভরশীল থাকে।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল—সরকারের অর্থাৎ শাসনবিভাগের ঐক্য, সংহতি ও সামঞ্জস্য বজায় রাখা। এইজন্য মন্ত্রিগণকে সংসদের পঙ্কিল ও কূপমণ্ডুক রাজনীতির বাইরে রাখার ব্যবস্থা সংবিধানে করা হয়েছে। পার্লামেন্টের অধিবেশনের সময়ও সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ফরাসি পার্লামেন্টে বছরে দুবার সাধারণ অধিবেশন বসে এবং সেই অধিবেশন দুটির মেয়াদ সাড়ে পাঁচ মাসের বেশ হয় না। পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমিত করা হয়েছে। পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে কার্যসূচী ও সময় সারণীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রথম কক্ষ জাতীয় সভার কমিটি ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। পার্লামেন্টের আর্থিক ক্ষমতাকে হ্রাস করা হয়েছে। মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার যে ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে সেই ক্ষমতাকেও হ্রাস করা হয়েছে। কোনও জরুরি বিলকে বাস করিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা পার্লামেন্টকে দেওয়া হয়েছে। এমনকি সরকারকে "অর্ডিন্যান্স" জারি করার ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি "সংবিধানিক সভা" পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে অনেকখানি সীমিত করেছে। এই সর্পিল সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়াও আরও কয়েকটি সংবিধান

বহির্ভূত ব্যবস্থা পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্টকে দুর্বল করেছে। যেমন—পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের প্রতি বিভিন্ন প্রধানমন্ত্রীর উদাসীন দৃষ্টিভঙ্গি ফরাসি পার্লামেন্টকে দুর্বল থেকে দুর্বলতর করেছে। এ ছাড়া বর্তমান যুগের আইনসমূহ সম্পর্কে পার্লামেন্টের সদস্যদের কারিগরী জ্ঞানের অভাব এবং সদস্যদের পক্ষে সরাসরি সকল বিষয়ে সম্যক অবহিত হতে না পারার ফলে পার্লামেন্টে দুর্বল হয়ে পড়েছে। পার্লামেন্টের সদস্যদের নিজেদের উদাসীনতা সরকারের উপর সংসদের নিয়ন্ত্রণকে শিথিল করেছে। আর্থিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ব্যবহৃত না হওয়ার ফলে সংসদ নিজেই দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে সকল উপায় ও কৌশল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংসদের রয়েছে সেইগুলিকেও ব্যবহার না করার ফলে পার্লামেন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। পার্লামেন্ট যে বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দান করে সেই বিষয়গুলিতে পার্লামেন্টের ক্ষমতা এতই ক্ষীণ যে তার ফলে পার্লামেন্টের দুর্বল চেহারাই প্রকাশিত হয়। পার্লামেন্টে যে বিষয়গুলিকে ভোটের জন্য উপস্থিত করা হয় সেই বিষয়গুলির উপর ভোটের ক্ষমতা ঠিকমতো প্রয়োগ করতে না পারার ফলে পার্লামেত্মট দুর্বল হয়ে পড়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্ট দুর্বল হওয়ার পিছনে সংবিধান বহির্ভুত যে বিষয়টি সর্বাধিক শক্তিশালীরূপে কাজ করেছে তা হল ১৯৫৯ সালে পার্লামেন্টে সরকার বিরোধীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায়। তাই বলা যায় যে, নানা কারণে (সংবিধান ও সংবিধান বহির্ভূত) পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পার্লামেন্ট দুর্বল হয়েছে। এই কারণগুলি হচ্ছে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা, সরকারের সদিচ্ছার অভাব, প্রশাসনের বাধা, পার্লামেন্টের সদস্যদের ঔদাসীন্য এবং পার্লামেন্টে প্রায় বারবার সরকার পক্ষের দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার অভাব। এই সব কারণে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্ট বা সংসদকে দুর্বল বা ক্ষমতাহীন বলা না হলেও "সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সংসদ" (Rationalised Parliament) বলা হয়ে থাকে।

পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে অনেকখানি সীমিত। সংবিধান ২নং ধারায় অভিব্যক্তি অনুসারে, জনগণের সার্বভৌমত্বের অর্থ সংসদের সার্বভৌমত্ব। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের অভিনবত্ব হল যে, পার্লামেন্টের কাজের পরিমাণ ও পরিধির সীমা নির্দেশ করা আছে। যে সমস্ত বিষয় স্পষ্টভাষায় পার্লামেন্টের আওতায় নেই সেগুলি শাসনবিভাগ দ্বারা পরিচালতি হয়। পার্লামেন্টের অনুমতি না নিয়ে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সরকার সংবিধান প্রদত্ত আইনসভার কোনও কাজ অধিগ্রহণ করতে পারে। শাসন বিভাগ ও আইনসভার মধ্যে ক্ষমতাগত বিষয় ভাগাভাগির ব্যাপারে কোন ভুল হলে তা বিচার করাবার দায়িত্ব সাংবিধানিক সভাকে (Constitutional Council) দেওয়া হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের পূর্বে যে সমস্ত আইন চালু ছিল, সেগুলি বর্তমানে শাসনবিভাগের আওতায় আসে কিনা সেই ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় সভার (State Council) পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যিক। সাংবিধানিক সভার অনুমতি ছাড়া সরকার কেবলমাত্র নিজের ধারণাবশে কোন বিষয়কে নিজের ক্ষমতার বশে আনতে পারে না বা সেক্ষেত্রে কোনও আদেশ জারি করতে পারে না। সংবিধানের ৪১নং অনুসারে সরকার "তা পার্লামেন্টের অন্তর্ভুক্ত নয়"—এই কারণে পার্লামেন্টের কোনও বিল বা সংশোধনী বিলকে আপত্তি করতে পারে। তা ছাড়া, পার্লামেন্টের কোনও কক্ষের সভাপতি সরকারের সাথে ভিন্ন মত পোষণ করলে বিষয়টি সাংবিধানিকসভার কাছে পাঠানো হয়। সংবিধানসম্মত হোক বা না হোক ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি বা পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যে কোন একজন সভাপতি কোন বিষয়ের উপর রুলিংয়ের জন্য বিষয়টি সাংবিধানিক সভার কাছে পেশ

করতে পারে। এরূপ সীমাবদ্ধতার পাশাপাশি সংবিধানে এমন কোনও ব্যবস্থা নেই যায় ফলে পার্লামেন্ট "ইহার শাসন বিভাগের নয়, আইন-বিভাগের কাজ"—এই বলে সরকারের কোনও আদেশকে বাধা দিতে পারে। কম-বেশি হলেও তৃতীয় এবং চতুর্থ সাধারণতন্ত্র এই ধরনের ব্যবস্থা ছিল। যদিও সেই সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ ঘটতো খুবই সাময়িক ও কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন মেটানোর জন্য। এতদ্‌সত্ত্বেও তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ছিল অক্ষুণ্ণ। কারণ সরকারের আইনসংক্রান্ত কোনও আদেশ কতখানি বা কতক্ষণ কার্যকরী থাকবে তার চূড়ান্ত বিচারক ছিল পার্লামেন্ট। কিন্তু পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার সীমা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা আছে। ঐ সীমার বাইরে সমস্ত বিষয়েই শাসনবিভাগের ক্ষমতা রয়েছে। পার্লামেন্টের অনুমতি নেওয়ার আগে পার্লামেন্টের কোন বিষয়ে শাসনবিভাগ আইন প্রনয়ন করতে পারে—এরূপ ব্যবস্থা সাধারণতন্ত্রে আছে। এ থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব কড়াকড়িভাবে সীমিত করা হয়েছে। ফলে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করার ক্ষমতা পার্লামেন্টের নেই। দ্বিতীয়ত, আর্থিক ব্যাপারেও সংসদের কোন ভূমিকা নেই। শাসনবিভাগ কর্তৃক বাজেট আনা হয় ও সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছা অনুসারেই সংসদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হয়। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সরকারের বাজেট হল সম্পূর্ণভাবে Executive Budgeg। তৃতীয়ত, সাংবিধানিক সভাও পার্লমেন্টের সার্বভৌমত্ব সীমিত করেছে। আগে পার্লামেন্টের কোন কাজ বিধিসম্মত কিনা তার বিচার পার্লামেন্ট নিজেই করত। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে পার্লামেন্টের সেই ক্ষমতা নেই। আগে, নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারসমূহ নিষ্পত্তি করার যে ক্ষমতা পার্লামেন্টের ছিল বর্তমানে তা নেই। সেই সব ক্ষমতা পার্লামেন্টের কাছে থেকে সাংবিধানিক সভার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে সংসদীয় কাঠামো থাকা সত্ত্বেও ফরাসি পার্লামেন্টের এই ধরনের সীমিত সার্বভৌমত্বের অবস্থা দেখে প্রকৃতই বিস্মিত হতে হয়। অবশ্য এই ধরনের নানা ব্যবস্থা পার্লামেন্টকে Rationalised ভাবে গঠন করবার জন্যই গ্রহণ করা হয়েছে। তাই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টকে সঠিকভাবে একটি Rationalised পার্লামেন্ট বলা হয়।

তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা লাভ করে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণেতাগণ পার্লামেন্টকে এমনভাবে গঠন করতে চেয়েছিলেন যাতে পার্লামেন্টের কার্যাবলীতে শাসনবিভাগকে সবসময় হেনস্তা হতে না হয়। আইনসভার খবরদারি থেকে শাসনবিভাগকে রক্ষা করাই ছিল পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান রচয়িতাগণের মূল উদ্দেশ্য।

১০.১২ সংসদের গঠন ও কার্যাবলী

সংবিধানের ২৪নং ধারা অনুযায়ী, জাতীয় সভা ও সিনেট—এই দুটি কক্ষ নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত। জাতীয় সভার প্রতিনিধিগণ জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন। ২১ বছর বয়স্ক যে কোনও ফরাসি নাগরিক ভোটদানের অধিকারী কিন্তু সিনেটের নির্বাচন পরোক্ষ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। ফ্রান্সের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব দ্বারা সিনেট গঠিত হয়। প্রবাসী ফরাসিগণও সিনেটে

প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেন। সিনেটসভার প্রতি ফ্রান্সের জনগণের বরাবরই একটা দুর্বলতা আছে। তাঁরা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার পক্ষপাতী। তাই ফরাসি সিনেটের ভূমিকা হল দ্বিতীয় সভার ভূমিকা। সিনেটের সদস্যগণ ৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। সিনেটের মোট সদস্যের এক-তৃতীয়াংশ প্রতি তিন বছর অন্তর অবসর গ্রহণ করেন। সিনেটের সদস্য হতে হলে ৩৫ বছর বয়স হওয়া চাই। এ ছাড়া, অন্যান্য শর্তাবলী জাতীয় সভার সদস্য হওয়ার মতো। সংবিধানের ২৫নং ধারায় বলা হয়েছে যে, দুটি সভাই একটি মৌলিক আইন (organic law), দ্বারা তাঁদের নিজ নিজকক্ষের সদস্য সংখ্যা, সদস্যপদের যোগ্যতা ও সদস্যগণের ভাতা-সুবিধাদি স্থির করবে। কোনও সদস্যপদ শূন্য হলে সংশ্লিষ্ট সভার পুর্ননির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত কিভাবে এ শূন্যপদ পূরণ করা হবে তা সংশ্লিষ্ট সভাই স্থির করবে।

অন্যান্য দেশের সংসদীয় ব্যবস্থার মত পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার আছে। সেই সঙ্গে তাঁদের কিছু বিশেষ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের কথাও বলা আছে। ২৬ নং ধারা অনুসারে, পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ করবার খাতিরে বা তাগিদে কোনও মতামত প্রকাশ বা ভোটদানের জন্য কোনও সংসদ সদস্যকে গ্রেপ্তার, আটক বা জবাবদিহি করা যায় না। যে সভার সদস্য সেই সভার অনুমতি ব্যতিরেকে সভার অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোনও সদস্যকে কোনও ফৌজাদরী বা তুচ্ছ অভিযোগে গ্রেপ্তার বা বিচার করা যাবে না। আবার পার্লামেন্টে যখন অধিবেশনে থাকে না তখনও কোন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট সভার সচিব দপ্তরের অনুমতি ছাড়া গ্রেপ্তার করা যায় না। যদি সংশ্লিষ্ট সভা দাবি করে যে, আটক সদস্যকে আটকে রাখা যাবে না তখন সংশ্লিষ্ট আটক সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার আদেশ স্থগিত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হল যখন আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত বিচার করে অথবা সংসদের পূর্ববর্তী অধিবেশনে যদি সংশ্লিষ্ট গ্রেপ্তারের আদেশ অনুমোদিত হয়ে থাকে ২৭নং ধারা অনুযায়ী সদস্যগণের ভোটদান বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত ব্যাপার। যে কোনও রকমের বাধ্যতামূলক ভোটদান বাতিল বলে ঘোষিত হয়।

অন্যদিকে, দায়িত্ব বা কর্তব্য বা বাধ্যবাধকতার মধ্যে আছে যে, সংসদের সদস্য থাকাকালীন কোনও ব্যক্তি অবশ্যই কয়েকটি ব্যাপারে নিজেকে জড়িত রাখতে পারবে না। এবিষয়ে সাংবিধানিক বিধিগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মতো। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের তালিকায় ঐ বিধিগুলি তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মতো। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের তালিকায় ঐ বিধিগুলির সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বর্ণিত ঐ বিধিগুলি হল যে, কোনও ব্যক্তি পার্লামেন্টের সদস্য হলে তিনি কোনও রাষ্ট্র পরিচালিত বা রাষ্ট্রকর্তৃক অনুদানের সাহায্যে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীতে থাকতে পারবেন না। যে সমস্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সরকারি উন্নয়নের কাজকর্ম গ্রহণ করে তাদের পরিচালকমণ্ডলীতেও তিনি থাকতে পারেন না। এছাড়া, রাষ্ট্রবিরোধী কোন কাজের আইন সংক্রান্ত ওকালতি থেকে তিনি অবশ্যই বিরত থাকবেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রে কোন সদস্য পদত্যাগ করলে পুনর্নির্বাচন হয়। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিধি হল যে, পার্লামেন্টের কোন সদস্যের ভোট প্রক্সি (proxy) দেওয়া যায় না (২৭নং ধারা)। একমাত্র বিশেষ কারণে, যেমন—অসুস্থতা, দুর্ঘটনা বা পারিবারিক কারণে কোনও সদস্য তাঁর ভোটদান ক্ষমতা

অন্য কোন সদস্যের মাধ্যমে প্রদান করতে পারেন। অথবা কোনও সরকারি মিশনে বা সকলে কিংবা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বাইরে থাকলে অথবা সিনেট বা জাতীয় সভায় প্রতিনিধি হিসেবে কোনও আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে গেলে তাঁর ভোট অন্য কোনও সংসদ সদস্য প্রদান করতে পারেন। কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই একজন সদস্য একটি প্রক্সি ভোটের বেশি প্রক্সি দিতে পারেন না। এ থেকে আশা করা হয় যে, সদস্যগণ পার্লামেন্টে নিয়মিত উপস্থিত থাকবেন। এই উদ্দেশ্যে, সংসদ-সদস্যগণের পাওয়া বেতন (salary) ও উপস্থিতি ভাতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

পার্লমেন্টের অধিবেশন বছরে মাত্র দুইবার বসে। সংবিধান-নির্দিষ্ট তারিখে অধিবেশনের শুরু হয় ও অধিবেশনের মেয়াদকাল মৌলিক আইন দ্বারা স্থির হয় (২৮ নং ধারা)। ২৯ নং ধারা অনুযায়ী কেবলমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ অথবা সংসদ-সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের অনুরোধে পার্লামেন্টের বিশেষ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ৪০ নং ধারা মতে, ঐ বিশেষ অধিবেশন বসবার ও শেষ হবার তারিখ রাষ্ট্রপতি স্থির করেন। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে পার্লামেন্টের কমিশনগুলির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে খুব সতর্কতার সঙ্গে কমিয়ে আনা হয়েছে (৪৩ নং ধারা)।

পার্লামেন্টের কার্যাবলীর নির্ঘন্ট বর্তমানে সরকার স্থির করেন (৪৮ নং ধারা)। সংবিধান বর্ণিত বিষয়গুলিতে পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে (৩৪ নং ধারা)। জাতীয় সভার সভাপতি পুরো মেয়াদের জন্য ও সিনেটের সভাপতি তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হওয়ায় তাঁরা অনেক বেশি স্বাধীনতা, নিরপেক্ষতা ও সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে পারেন। সংবিধানের ৪৪নং ধারা অনুযায়ী সরকার সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব নাকচ করে দিতে পারে। তখন পার্লামেন্ট কেবলমাত্র সরকার কর্তৃক গৃহীত সংশোধনীসমূহকে একবার ভোট দিতে পারে। পার্লামেন্টের কার্যাবলীর সমস্ত পদ্ধতিগত নিয়ম-কানুনগুলি সাংবিধানিক আইনে(constitutional law)। পরিবর্তিত হওয়ায় পার্লামেন্টের অনেক অভ্যন্তরীণ কলহ দূরীভূত হয়েছে এবং অনেক ধরনের বিতন্ডা ও বিতর্ক যুদ্ধের অবসান ঘটেছে। ৪৯নং ধারা দ্বারা সেন্সর প্রস্তাবের ব্যবহারকেও খুব সীমিত রাখা হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের চিরাচরিত প্রথায় পার্লামেন্ট কর্তৃক সরকারের কার্যে নিয়মিত হস্তক্ষেপের নীতিগুলিকে বিলোপ করা হয়েছে। সবশেষে, সাংবিধানিক সভায় নিয়ন্ত্রণই পার্লামেন্টকে একটি Rationalised প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

সংবিধানের বিভিন্ন ধারার জন্যও পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডিং আদেশের ফলে পার্লামেন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। পক্ষান্তরে, শাসন-বিভাগের প্রতিপত্তি ও মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধির অনুপাতে জাতীয় সভার ক্ষমতা অনেক কমে গেছে ও সিনেটের তুলনায় জাতীয় সভার সম্মানও অনেক কমে গেছে। ১৯৫৮ সালে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান সিনেটকে এক উজ্জ্বলতর অবস্থায় উন্নত করেছে। সরকারের ইচ্ছানুসারে সমস্ত বিলে সিনেটের ভেটো প্রয়োগ করবার ক্ষমতা সিনেটকে আগের তুলনায় অল্প শক্তিশালী করেছে। পার্লামেন্টের অধিবেশনে বছরে ৬ মাসেরও কম সময় অতিবাহিত হয়। অধিবেশনের প্রারম্ভে প্রত্যেকটি কক্ষ ব্যুরো (bureau) নির্বাচিত করে। সভাপতিসহ জাতীয় সভার অন্য ৬০ জন সহ-সভাপতি, সিনেট সভার জন্য ৪ জন সহ সভাপতি, জাতীয় সভার জন্য ১২ জন সচিব ও সিনেটের জন্যে ৮ জন সচিব এবং প্রতিটি কক্ষের জন্য ৩ জন করে কোয়েশ্চারস

বা তদারকি অধিকর্তা নিয়ে ব্যুরো গঠিত হয়। সচিবগণ সরকারি নথিপত্র দেখাশোনো করেন ও ভোট গণনা করেন। কোয়েশ্চারগণ সভার প্রশাসনে ও আর্থিক ব্যাপারে দায়ী থাকেন। সামগ্রিকভাবে, ব্যুরো সভার বিভিন্ন কাজ সংগঠিত করে ও তদারকি করে। প্রয়োজনবোধে, পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সভাপতিকে নিয়মশৃঙ্খলা ও বিল উত্থাপন প্রভৃতি নানা ব্যাপারে ব্যুরো সাহায্য করে থাকে।

সাধারণ নির্বাচনের পর নব-নির্বাচিত সভার সদস্যগণ দ্বারা প্রতিটি কক্ষের সভাপতি নির্বাচিত হন। সিনেটের সভাপতি প্রয়োজন বোধে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করতে পারেন। কিন্তু তাঁর এই কাজ রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির কাজের সঙ্গে তুলনীয় নয়। পার্লামেন্টের দুই কক্ষের সভাপতির কাজ ও মর্যাদা মোটামুটিভাবে সমান ও একইকরম। কিন্তু তাঁদের কাউকেই যুক্ত রাজ্যের সাধারণ সভার স্পীকারের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। বরং এক্ষেত্রে, মার্কিন জনপ্রতিনিধি সভার স্পীকারের সঙ্গে তাঁদের কিছু মিল আছে। ফ্রান্সে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সভাপতিগণ নিরপেক্ষভাবে সভার কাজ পরিচালনা করবেন—এটাই সাংবিধানিক রীতি। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হল যে, তাঁরা সংশ্লিষ্ট সভার বিভিন্ন সদস্যগণের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রভাবিত হয়ে থাকেন।

পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধান উভয়কক্ষকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। যেমন, ১৬ নং ধারা অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সময় রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই উভয় কক্ষের সভাপতির সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে হয়। কোনও বে-সরকারি বিল, প্রস্তাব বা সংশোধন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সভার সভাপতি ও সরকারের মধ্যে মতদ্বৈধতা হলে সংশিষ্ট সভাপতি বিতর্কিত বিষয়টিকে সাংবিধানিক সভার নিকট প্রেরণ করতে পারেন (৪১ নং ধারা)।

মোটামুটিভাবে দেখা যায় যে, তৃতীয় ও চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের স্পিকারদের তুলনায় পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সভাপতিগণ অধিক ক্ষমতা ভোগ করেন। বিশেষত সদস্যগণকে শৃঙ্খলাসম্মত ব্যবহারে পরিচালনা করার ব্যাপারেও বিতর্কের সমাপ্তি ঘোষণার ব্যাপারে তাঁদের ক্ষমতাই সর্বাধিক। পার্লামেন্টের বিভিন্ন সভায় কর্মসূচী বা নির্ঘন্ট প্রতি সপ্তাহে একটি সভায় স্থির হয়। ঐ সভায় উভয় সভার সভাপতিগণ ও সহ-সভাপতিগণ সভার সদস্যগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ, কমিশনের সভাপতিগণ ও অর্থকমিশনে প্রধান বিবৃতকার (Rapporteur-General) উপস্থিত থাকেন। এই সভার ভোটের গুরুত্ব দলগত অনুপাতে স্থির হয়। সভার নির্ঘন্ট রচনার ব্যাপারে সরকারেই অধিক নিয়ন্ত্রণ থাকে। কারণ সরকারি বিল ও সরকার সমর্থন করে এমন কোন বে-সরকারি বিলকে সভার কাছে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় (৪৮ নং ধারা)।

ফ্রান্সের বর্তমানে পার্লামেন্টে সদস্যদের মধ্যে বহু দল ও গোষ্ঠী সরকারপক্ষীয় শিবিরে বা বিরোধী পক্ষীয় শিবিরে বিভক্ত হয়ে আছে। বর্তমানে পার্লামেন্টের কাজের পদ্ধতিতে এই সব গোষ্ঠী ও দলগুলিকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ন্যূনপক্ষে, ৩০ জন সদস্যবিশিষ্ট গোষ্ঠীর নেতাকে সভার নির্ঘন্ট নির্ধারক সভপতিদের সভায় স্বীকৃতি জানানো হয়। পার্লমেন্টের বিভিন্ন কমিশনগুলিতে গোষ্ঠীগুলির প্রতিনিধিত্ব তাদের নিজ নিজ শক্তির অনুপাতে ঠিক হয়।

যদি কোন পদ শূন্য অবস্থায় থাকে তখন সংশ্লিষ্ট সভা সর্বসম্মতিক্রমে কোনও নির্দল সদস্যকে ঐ শূন্যপদে নির্বাচিত করতে পারেন।

কার্যাবলী ঃ

পার্লামেন্ট কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারে তা সংবিধানের ৩৪ নং ধারায় উল্লেখ আছে। এর বাইরে আইন প্রণয়ন করবার অধিকার পার্লামেন্টের নেই। এইরূপ সংকুচিত ক্ষমতা ইদানীংকালে আর কোনও দেশের আইনসভার নেই। যাই হোক ৩৪নং ধারায় উল্লিখিত বিষয়গুলি হল—নাগরিকগণের ব্যক্তিগত জীবনের ও সম্পত্তির উপর জাতীয় প্রতিরক্ষার স্বার্থে আরোপিত কর্তব্যগুলি নির্ধারণ করা, নাগরিকতা, ব্যক্তির আইনগত ক্ষমতা ও অবস্থা, বিবাহচুক্তি, উত্তরাধিকার দান, অপরাধজনিত ঘটনা ও দুর্ব্যবহার সংক্রান্ত ব্যাপারে শাস্তি প্রদান, ফৌজদারী পদ্ধতি, বিচার বিভাগের মর্যাদা ও নতুন এলাকা নির্ধারণ ও সন্ধিচুক্তি সম্পাদন।

দেশের মুদ্রাব্যবস্থা পরিচালনা, সমস্ত প্রকার করের হার, পরিমাণ ও সংগ্রহের নীতি নির্ধারণ, বৈদেশিক নীতি, প্রশাসন ও বিচারের ক্ষেত্রে নিয়মকানুন প্রবর্তন।

পার্লামেন্টের ও স্থানীয় আইনসভার নির্বাচন ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও কর্পোরেশন গঠন। রাষ্ট্রের সামরিক ও প্রশাসনিক কর্মীদের রক্ষা করা, ব্যবসার জাতীয়করণ, ব্যক্তিগত মালিকানার আওতা হতে সম্পদের মালিকানা সরকারি ক্ষেত্রে স্থানান্তর।

এছাড়া আরও কয়েকটি মূল নীতি পার্লামেন্ট নির্ধারণ করে থাকে। সেই বিষয়গুলি হল ঃ জাতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর গঠন, স্থানীয় এলাকার স্বায়ত্বশাসন ও তাদের কাজের এলাকা ও প্রয়োজনীয় আয়ের উৎস, শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, সামাজিক ও বাণিজ্যিক বাধ্যবাধকতা, চাকরি, সংঘ, সমিতি ও সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন আর্থিক ক্ষমতার ব্যাপারে পার্লামেন্টের কোনও উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা নেই। এমন কি কালবিলম্ব পদ্ধতি অবলম্বন করবার সুযোগটুকুও ফ্রান্সের বর্তমান পার্লামেন্টের নেই। সরকার যেমনভাবে আর্থিক বিল উত্থাপন করে পার্লামেন্টকে শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই বিলটি অনুমোদন করতে হয়। সংবিধানের ৪৬ নং ধারায় আর্থিক বিল অনুমোদন পদ্ধতির উল্লেখ আছে। জাতীয়সভা আর্থিক বিলের প্রথম পাঠ সম্পূর্ণ না করলে, সরকার বিলটিকে সিনেটের নিকট পাঠায়। সিনেটকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ঐ বিলটির পাঠ শেষ করতে হয়। যদি সিনেট তা না করে, তা হলে ৭০ দিন পর সরকার অর্ডিন্যান্স দ্বারা ঐ বিলটিকে আইন বলে ঘোষণা করে। যদি আর্থিক বছরের শুরুতে সরকার ঐ আইন কার্যকরী করতে না পারে তবে জাতীয় সভার অতীতের কোন নজিরের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যাতে অনুরূপ কর ধার্য করতে ও অর্থ ব্যয় করতে পারে তার সরকারি আদেশ পার্লামেন্টকে অনুমোদন করতে হয়। আর্থিক ব্যাপারে এই ধরনের সহায়তা পৃথিবীর অন্য কোনও জনপ্রতিনিধি সভায় নেই। সরকারি আর্থিক ব্যাপারে ফ্রান্সে শাসন বিভাগই সর্বেসর্বা।

৩৪ নং ধারায় উল্লিখিত বিষয়সমূহে আইন করার ক্ষমতা পার্লামেন্ট বিশেষ আইন প্রণয়নের সাহায্যে বৃদ্ধি করতে পারে। সংবিধানের ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের সরকারকে কোন বিষয়ে সরকার আইন প্রণয়ন করবার জন্য 'পার্লামেন্টকে সরকারকে অনুমতি দান করুক'—এই রকম অনুরোধ সরকার নিজের শাসন পরিচালনার প্রয়োজনে পার্লামেন্ট করতে পারেন। সংবিধানের ৩৪ নং ধারা অনুসারে সমস্ত আইনকে পার্লমেন্ট অনুমোদিত হতে হবে। ৩৫ নং ধারা অনুসারে, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সমস্ত সিদ্ধান্ত পার্লামেন্টে অনুমতির দ্বারা প্রযোজ্য হবে। ৩৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ঘোষিত সামরিক আইন ১২ দিনের বেশি সময় জারি রাখতে হলে অবশ্যই পার্লামেন্টে অনুমতি প্রয়োজন।

৩৮ নং ধারা অনুযায়ী অর্ডিন্যান্স মারফত নির্দিষ্ট কোন বিশেষ সময়ের জন্য আইনসংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণে পার্লামেন্টকে অনুমোদন দানের জন্য সরকার বলতে পারে। রাষ্ট্রীয় সভার স্বার্থে পরামর্শ করবার পর মন্ত্রিসভায় আলোচনা করে উক্ত অর্ডিন্যান্স কার্যকরী হয়। এই ধরনের অর্ডিন্যান্স সরকারি গেজেটে প্রকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট আইন উল্লিখিত তারিখের মধ্যে পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হলে তা বাতিল হয়ে যায়। সংশ্লিষ্ট আইন উল্লিখিত সময়সীমার মেয়াদ শেষ হলেও অর্ডিন্যান্সকে পুনরায় সংশোধিত আকারে চালু করা যায়। তখন আইনসংক্রান্ত বিষয়ের মধ্যে যে বিষয়গুলি সংশোধিত অর্ডিন্যান্স থেকে কেবলমাত্র সেগুলিতে সংশোধিত আইন কার্যকরী হয়। পরিশেষে, সংবিধান সংশোধন ব্যাপারে পার্লামেন্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা

৪৯ নং ধারা মতে, মন্ত্রিসভায় আলোচনা হবার পর সরকারের সমগ্র কর্মসূচির জন্য মন্ত্রিসভাকে জাতীয় সভার নিকট দায়িত্বশীল থাকতে হয়। যে কোনও সাধারণ নীতির প্রশ্নেও এই দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রি মন্ত্রিসভার উপর চাপিয়ে দিতে পারেন। জাতীয় সভার সদস্যগণের এক দশমাংশের সই প্রয়োজন হয়। ঐ প্রস্তাব পার্লামেন্টে আসার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে কোন ভোটাভূটি চলে না। ৪৮ ঘন্টা পরেই ভোট গ্রহণ হতে পারে। ভোট-গণনার সময় কেবলমাত্র নিন্দা প্রস্তাবের পক্ষের ভোটগুলিকেই গণনা করা হয়। জাতীয়-সভার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নিন্দাপ্রস্তাব গৃহীত হয়। নিন্দাপ্রস্তাব ভোটে পরাজিত হলে ঐ নিন্দা-প্রস্তাবে স্বাক্ষরকারী সদস্যগণ চলতি অধিবেশনে নুতন কোনও নিন্দা প্রস্তাবে সই করতে পারেন না, মন্ত্রিসভার আলোচনা হবার পর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত কোনও প্রস্তাবের জন্য প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভাকে জাতীয়সভার নিকট দায়ত্বিশীল করতে পারেন। এই অবস্থায় সরকারি প্রস্তাবটি যদি নিন্দা-প্রস্তাবের সম্মুখীন না হয় তা হলে প্রস্তাবটি গৃহীত হল বলে ধরা হয়। কোন সাধারণ নীতি ঘোষণাতে সম্মতি দানের জন্য প্রধানমন্ত্রী সিনেটকে অনুরোধ করার ক্ষমতা রাখেন।

৫০ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, জাতীয় সভায় সরকারের বিরুদ্ধে কোন নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হলে বা কোনও সরকারী কর্মসূচী বা কোনও সাধারণ সরকারি নীতির ঘোষণা প্রত্যাখ্যাত হবার পর সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্রপতির নিকট প্রধানমন্ত্রীসহ সমগ্র মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

১০.১৩ উভয় কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক

আর্থিক বিল প্রথমে জাতীয় সভায় উত্থাপিত হওয়া ছাড়া অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারেই পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের মত পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে জাতীয় সভা কখনোই সিনেটকে ক্ষমতায় অতিক্রম করতে পারে না। একমাত্র সরকার যদি প্রয়োজনবোধে জাতীয় সভার পক্ষে দাঁড়ায় তখনই সিনেটকে জাতীয় সভা ক্ষমতার দ্বারা অতিক্রম করতে পারে। এই রকম সরকারি হস্তক্ষেপ উদাসীনভাবে বা সক্রিয়ভাবে দুইভাবে হতে পারে। প্রথম পর্যায়ে সভায় বিলটি দু'বার পাঠ হবার পর প্রধানমন্ত্রি উভয় সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে একটি যুক্ত কমিটি গঠন করতে পারেন। যুক্ত কমিটি যদি মতৈক্যে পৌঁছায়, তখন তার সিদ্ধান্ত সরকার কর্তৃক উভয় সভায় অনুমোদনের জন্য আনা হয়। সরকারের অনুমতি ছাড়া আর কোন সংশোধন এই অবস্থায় গ্রহণ করা হয় না। অন্যদিকে যদি যুক্ত কমিটি পার্লামেন্টের উভয় সভাকে সংশ্লিষ্ট বিলের ব্যাপারে সহমত হতে হয় অথবা বিলটিকে একেবারে ত্যাগ করতে হয় অথবা মুলতুবি রাখতে হয়। কিন্তু যদি সরকার সক্রিয় হন তা হলে জাতীয় সভার পক্ষে সরকার অগ্রসর হয়ে সিনেটের ক্ষমতাকে অতিক্রম করে বিতর্কমূলক বিলটি পাশ করে দেন তখন জাতীয় সভাকে বিলটি পাশের ব্যাপারে নির্দিষ্ট আদেশ দিতে হয় এবং বিলটি মৌলিক আইনের (organic law) সঙ্গে সম্পর্কিত না হলে একে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই পাশ করতে হয়। সমগ্র ব্যাপারটা বিশ্লেষণের ফলে এই দাঁড়ায় যে, যদি সরকার আদৌ আগ্রহ না দেখায় তা হলে সিনেট আইন প্রণয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। সুতরাং এক্ষেত্রে, উভয় কক্ষের সম্পর্কের প্রকৃতি প্রায় তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের কাছে উভয় কক্ষের সম্পর্কের মতই দেখা যায়। তখনও বর্তমানের মত উভয় কক্ষের সম্পর্ক বলতে প্রত্যেকেই সক্ষমতাসম্পন্ন, স্বাধীন ও সমান মর্যাদার অধিকারী ছিল।

বর্তমান উভয় সভার ক্ষমতার পার্থক্য হল যে, সিনেট শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে না। জাতীয় সভার নিটকই সরকার দায়িত্বশীল থাকেন। তা সত্ত্বেও ১৯৫৮ সালের সংবিধান অনুসারে (দ্বিতীয় কক্ষ হলেও) সিনেটের আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা জাতীয় সভার মতই সমান এবং ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকার ফলে সিনেটের মর্যাদা এখন উন্নত।

কোন রাষ্ট্রপতি অক্ষম হয়ে পড়লে বা কোনও কারণে রাষ্ট্রপতির পদ হঠাৎ শূন্য হলে, যতক্ষণ না নূতন নির্বাচন হয়, সিনেটের সভাপতির সাথে রাষ্ট্রপতির পরামর্শ করা একটি সাংবিধানিক বাধ্যবাধ্যকতা। সাংবিধানিক সভাতে কোন বিল পাঠানোর অধিকার সিনেটের সভাপতির কাছে এবং জাতীয় সভার সভাপতির মত তিনিও সাংবিধানিক সভাতে তিনজন সদস্য মনোনীত করেন। মহাধর্মাধিকরণে প্রতিনিধিত্বের অধিকার জাতীয় সভার সঙ্গে সিনেটেরও আছে। কোনও গণভোটের ব্যবস্থা করতে হলেও জাতীয় সভার সঙ্গে সিনেটের সম্মতি প্রয়োজন। এছাড়া রাষ্ট্রপতির বাণী নেওয়ার অধিকার সিনেটের আছে। পরিশেষে উল্লেখযোগ্য, ফরাসি শাসনব্যবস্থায় সংসদের উচ্চ পরিষদ হিসেবে সিনেট আগের তুলনায় নিম্নকক্ষ অর্থাৎ জাতীয় সভা থেকে বেশি ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানে জাতীয় সভার আধিপত্যকে কিছুটা কমিয়ে সিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে বাড়ানো হয়েছে।

১০.১৪ তুলনা

মার্কিন যুক্তরাজ্য, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশের পার্লামেন্টের সঙ্গে ফরাসি পার্লামেন্টের তুলনায় দেখা যায় যে, এদের মধ্যে ফ্রান্সের পার্লামেন্ট সবচেয়ে অসহায়। ফ্রান্সে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী পার্লামেন্টের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতা আছে অথচ সংসদীয় সার্বভৌমত্ব নেই। তাই শাসনব্যবস্থার রীতিনীতির দিক থেকে বৃটিশ ও ভারতীয় পার্লামেন্টের সঙ্গে ফরাসি পার্লামেন্টের মিল থাকলেও কার্যক্ষেত্রে আমেরিকার কংগ্রেসের চাইতেও ফরাসি পার্লামেন্ট অনেক দুর্বল ও অসহায়। কংগ্রেস অর্থব্যয়-বরাদ্দের ক্ষমতা মারফত রাষ্ট্রপতি বা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ফরাসি পার্লামেন্টের সেই ক্ষমতা একেবারে শূন্য। তাছাড়া, মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে Senatorial courtesy মেনে চলতে হয়। ফ্রান্সে ঐ ধরনের courtesy-র কোনও প্রয়োজন নেই। আমেরিকার কংগ্রেস সম্পর্কে বলা হয় যে কংগ্রেস হল Leviathan in chains কিন্তু ফরাসি পার্লামেন্ট Leviathan না হয়েও অসংখ্য শৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। শাসন বিভাগ তথা প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল। তাছাড়া ব্রিটেন বিচার বিভাগ পার্লামেন্টের আইন তৈরি করার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না। তবে বর্তমানের রাজনৈতিক বাস্তবতায় ক্যাবিনেট এখন ক্ষমতার মূলকেন্দ্র হিসাবে আছে—পার্লামেন্ট নয়।

১০.১৫ সারাংশ

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক শাসন কাঠামো ও রাষ্ট্রপতি ব্যবস্থার মিশ্রিত রূপ হলেও এই শাসনকাঠামোতে রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য দেখা যায়। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ফ্রান্সের সংসদের নিম্নকক্ষ জাতীয় সভায় কোন দল নিরঙ্কুশ গরিষ্ঠতা না পাওয়ায় সরকারে বিশেষত মন্ত্রিসভায় যে অস্থিশীলতা দেখা যায় তার মধ্যে সরকারের স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা বজায় রাখেন রাষ্ট্রপতি। সম্প্রতি একটি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি যেভাবে উদ্ভূত হয়েছে তার ফলে সাধারণভাবে বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে রাষ্ট্রপতি প্রধান ভূমিকা পালন করেন, অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। আইনবিভাগ হিসাবে সংসদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নাই। কারণ ফরাসি সংসদ বর্তমানে হচ্ছে সীমিত সম্পন্ন সংসদ বা Rationalised Parliament.।

১০.১৬ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন

১। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে কিভাবে সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি সংমিশ্রণ ঘটানো হয়েছে তাহা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করুন (১০.২ ও ১০.৩ দেখুন)।

২। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলীর আলোচনা করুন (১০.৫ দেখুন)।

৩। রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিত্ব নীতির উপর ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি পদের গুরুত্ব ক্ষমতা ও কার্যাবলীর পরিধি ও মাত্রা কিভাবে নির্ভর করে তাহা দেখান (১০.৬ দেখুন)।

৪। প্রধানমন্ত্রীর কার্যাবলী ও পদমর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখ করে ফরাসি মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন (১০.৯ দেখুন)।

৫। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সংসদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন (১০.১২ দেখুন)।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন-পদ্ধতি বর্ণনা করুন। (১০.৪ দেখুন)

২। ফ্রান্সের সংসদের ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়টি বর্ণনা করুন (১০.১২ অনুসরণ করুন)।

৩। মার্কিন ও ভারতের রাষ্ট্রপতির সাথে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির তুলনা করুন (১০.৭ দেখুন)।

৪। ব্রিটিশ, মার্কিন ও ভারতের সংসদের সাথে পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সংসদের তুলনা করুন (১০.১৪ দেখুন)।

১০.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। Dorothy Pickles — *The Government and Politics of France vol. I and vol. II.*

২। Vincent Wright — *The Government and Politics of France.*

৩। D. H. Hanley, A. P. Kerr and N. H. Waites—*Contemporary France.*

৪। Alan R. Ball — *Modern Politics and Government.*

৫। J. Denis Derbyshire & Law Derbyshire —*Political systems of the world.*

একক ১১ ❑ পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থা ও সাংবিধানিক সভা

গঠন

১১.১ উদ্দেশ্য

১১.২ প্রস্তাবনা

১১.৩ ভূমিকা

১১.৪ বিচার প্রশাসনিক আইন ও আদালত

১১.৫ ফ্রান্সের প্রশাসনিক আইন ও আদালত

১১.৬ রাষ্ট্রীয় সভা

১১.৭ উপসংহার—প্রশাসনিক আদালতের গুরুত্ব

১১.৮ সাংবিধানিক সভা

১১.৯ সারাংশ

১১.১০ অনুশীলনী

১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফ্রান্সে বিচার-ব্যবস্থার গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে সম্যক পরিচয় দেওয়া। ফ্রান্সে সরকারের প্রশাসনিক কাজকর্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ সংক্রান্ত নালিশের বিচার প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত দ্বারা। এই ধরনের স্বতন্ত্র আইন ও আদালত সম্পর্কে আলোচনা করাও এই এককের উদ্দেশ্য।

১১.২ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সের পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের বিচার ব্যবস্থা ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের নেপোলিয়ন যে 'আইন-সংহিতা' রচনা করেছিলেন ও যে বিচার ব্যবস্থা ও আদালত গড়ে তুলেছিলেন সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্র-কাঠামো এককেন্দ্রিক হওয়ায় ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থাও হয়েছে এককেন্দ্রিক অর্থাৎ সারা দেশে একই আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রচলিত। তবে ফ্রান্সে প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে।

১১.৩ ভূমিকা

ফ্রান্সে বর্তমান বিচার ব্যবস্থার উপর রোমক আইন ব্যবস্থার প্রভাব যথেষ্টই রয়েছে। মধ্যযুগীয় ফ্রান্সে বিচার ব্যবস্থা বলে কিছু ছিল না। সেই সময় দেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন ধরনের আইন ও বিচারের রূপ দেখা যেত। এই সময়ে ভলতেয়ায়ের উক্তি ছিল " একজন পরিব্রাজক ফ্রান্সে যতবার ঘোড়া পরিবর্তন করেন তত প্রকারের আইন ও বিচার ব্যবস্থা তিনি দেখতে পান"। বিচার ব্যবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের ফলে দেশের ঐক্য ও সংহতি যে বিনষ্ট হয় এই সত্যটি প্রথম ফরাসি বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছিলেন। ফলে, ফরাসি বিপ্লবের নায়কগণ ফ্রান্সে একটি নতুন অখন্ড বিধিবদ্ধ বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট সর্বপ্রথম ফ্রান্সের আইন ব্যবস্থাকে এক বিধিবদ্ধ অবস্থায় সুসংহত রূপ দান করেন। বর্তমানে পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক ফ্রান্সে যে আইন ও বিচরব্যবস্থা দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে নেপোলিয়নের বিচারব্যবস্থার এক সংশোধিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

১১.৪ ফরাসি বিচার ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১। সারা দেশের জন্য একটিমাত্র বিচারব্যবস্থা প্রচলিত।

২। বিচার পদ্ধতির সমস্ত আইনকানুন লিখিত ও বিধিবদ্ধ।

৩। ফরাসি বিচার প্রণালীর নিয়মকানুন বিধিবদ্ধ অবস্থায় থাকে।

৪। প্রতিটি মামলাকে স্বতন্ত্রভাবে বিচারকগণ বিচার করেন। একই মামলার বিচার একই নিয়ম, নীতি বা সিদ্ধান্তে পরিচালিত হবে এমন কোন কথা নেই। মামলা পরিচালনায় অতীতের কোন প্রসঙ্গ গুরুত্বপূর্ণ নয়। নিজস্ব গুণাগুণের ভিত্তিতে প্রতিটি মামলার বিচার হয়।

৫। ফ্রান্সে দুই ধরনের বিচারব্যবস্থা চালু আছে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলাগুলি সাধারণ বিচারালয়ে সম্পন্ন হয়। আর প্রশাসন বা সরকার সম্পর্কিত মামলাগুলির বিচার প্রশাসনিক আদালতে (administrative tribunal) সম্পন্ন হয়। এই ধরনের আদালত নিজেদের ক্ষমতাসম্পর্কগত প্রশ্নে বিরোধে লিপ্ত হলে Tribunal of conflicts মীমাংসা করেন।

৬। বিচারের আইনসংহিতা (code) এবং মামলা-আইন (case-laws) উভয়ের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য আছে। ফ্রান্সে আইনসংহিতাকে অনুসরণ করে বিচার করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে ও ভারতবর্ষে মামলা-আইনের নজির বিচারকার্য সম্পাদনে গুরুত্ব পায়।

৭। যুক্তরাজ্য ও ভারতের বিচার ব্যবস্থা থেকে ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থার পার্থক্যের আর একটি ক্ষেত্র হল যে— যুক্তরাজ্যে ও ভারতে আইনজীবীদের মধ্য থেকেই অনেক ক্ষেত্রে বিচারক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ফ্রান্সে বিচারক

হওয়ার অর্থ একজন সাধারন সরকারি কর্মচারী হওয়া মাত্র। বিচার-বিভাগীয় মন্ত্রীর অধীনে তিনি চাকরি করেন ও তাঁর উচ্চতর ম্যাজিস্ট্রেটগণের কাউন্সিলের সুপারিশের উপর তাঁর চাকুরি ও পদোন্নতি নির্ভর করে। আইনজীবী হবেন অথবা বিচারক হবেন—এই পছন্দ একজন ব্যক্তিকে প্রথমেই করে নিতে হয়। কারণ একটিতে যোগদান করলে ফ্রান্সে অপরটিতে যোগ দেওয়া যায় না। ফলে অতি অল্পবয়স্ক যুবকেরা ফ্রান্স 'বিচার-কার্য' নামক চাকরিতে যোগদান করেন ও পরবর্তীকালে তাঁর চাকরির মেয়াদ যত বাড়ে পদোন্নতিও তদনুরূপ হতে থাকে। যুক্তরাজ্য ও ভারতের বিচারপতিদের মতো ফরাসি বিচারপতিগণের দায়িত্ববোধের মাত্রা অধিক নয়। তাদের বিচারের রায় দেশের সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে ভারত ও যুক্তরাজ্যের মতো প্রভাবিত করে না।

৮। ফ্রান্সে মামলার বিচার সাধারণত ৩ জন বিচারপতি দ্বারা একটি বেঞ্চ সম্পন্ন করেন। ফ্রান্সে এই ধরনের একটি রেওয়াজ আছে যে, একজন বিচারকের অর্থ হচ্ছে অবিচার। একাধিক বিচারকগণের সিদ্ধান্ত যথার্থই ন্যায়নীতিসম্মত হতে পারে বলে ফরাসি জনমনে একটা ধারণা প্রচলিত আছে। তাই ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা যৌথ-বিচার ব্যবস্থা নীতিতে পরিচালিত হয়।

৯। আর্থিক সুযোগ সুবিধার দিক থেকে ফ্রান্সের বিচারকগণ খুব একটা ভালো অবস্থায় থাকেন না। যাঁরা অর্থের চেয়ে সামাজিক মর্যাদাকে অধিক পছন্দ করেন তাঁরাই বিচারকপদে যোগদান করেন।

১০। সাধারণ বিচারালয় ও প্রশাসনিক আদালত ছাড়া আরও কয়েকটি বিভিন্ন ধরনের আদালত ফ্রান্সে দেখা যায়; যেমন শিল্প-বিরোধ মিমাংসা কাউন্সিল, বাণিজ্যিক ট্রাইব্যুনাল, জাস্টিস অফ পীস্ এবং পারকোত (parquet)।

১১। বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ বা Habeas Corpus বা ওই জাতীয় কোনও কিছু নীতি ফ্রান্সে দেখা যায় না। কেবল সংবিধানের ৬৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে স্বৈরাচারিভাবে গ্রেপ্তার করা যাবে না। বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ বিষয়ে সংবিধানে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই।

১২। ফরাসি বিচার ব্যবস্থায় একই আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচার করা হয়। যুক্ত রাজ্য বা ভারতবর্ষের মত ফ্রান্সে পৃথক ধরনের মামলার জন্য কোনও পৃথকীকরণ ব্যবস্থা নেই। তবে কোনও কোনও সময়ে উচ্চতর আদালতগুলিতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী দুইটি বিভাগ খোলা হয়।

১৩। যুক্তরাজ্য ও আমেরিকার মতো ফ্রান্সে কোনও ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় নেই।

১৪। বিচারপদ্ধতি যৌথ ব্যবস্থাতে চলবার ফলে ফ্রান্সে কোনও জুরী ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না। যদি কোথাও জুরীবোর্ড দেখা যায়, সেখানে ১২ জন সদস্য নিয়ে জুরী বেঞ্চ গঠিত হয়। দেশের বিশিষ্ট নাগরিকগণের এক দীর্ঘ তালিকার মধ্যে থেকে ১৩ জনকে এই বোর্ডে নেওয়া হয়। সংখ্যাধিক্য ভোটে জুরী বেঞ্চে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় জুরী বেঞ্চে ৬-৭ কিংবা ৭-৫ ভোটে দেখা দিয়ে সংশ্লিষ্ট আদালতের ৩ জন বিচারপতিকে একমত হয়ে রায় দিতে হয়।

সংবিধানের ৫৪ নং ধারা অনুসারে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থার রক্ষক। বিচারবিভাগের একটি উচ্চতম সভা এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবেন। এই উচ্চতম সভার নাম Higher Council of Judiciary। ৫৫ নং ধারা অনুযায়ী এই উচ্চতম সভার সভাপতি হলেন ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি। পদাধিকার বলে তিনিই ফ্রান্সের বিচারদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। তিনি ছাড়া, তাঁর দ্বারা নিযুক্ত ৯ জন সদস্য নিয়ে বিচার বিভাগের উচ্চতম সভা গঠিত হয়। এই সভা বিচারকগণের পদোন্নতির ব্যাপারে সুপারিশ করেন এবং বিচারসংক্রান্ত নানা ব্যাপারে সুপারিশ করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন।

ফ্রান্সে বিচারকগণের পদমার্যাদা ও ক্ষমতা এবং তাঁদের পদোন্নতির সম্ভাবনা আমলাতান্ত্রিক নীতিতে বাঁধাধরা অবস্থায় থাকে। 'বিচার-প্রশিক্ষণের জাতীয় কেন্দ্র' নামক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা শিক্ষার্থী-বিচারকগণকে বিচার করবার শিক্ষা দেওয়া হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্ত ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কেবল তাঁরাই এই শিক্ষাকেন্দ্রে ভর্তি হবার সুযোগ পান।

ফ্রান্সে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সম্পর্কে Ogg এবং Zink বলেন, ''By and large French Courts and Judges compare favourably in capacity, integrity, independence and inpartiality with those of any other country.

সংবিধানের ৬৪ নং ধারা অনুযায়ী বিচারকগণ কখনই বদলি হন না। কেবলমাত্র চূড়ান্ত রকমের দুর্ব্যবহারের (misdemeanour) অভিযোগ এবং বিচার বিভাগীয় উচ্চতর সভার সুপারিশে কোনও বিচারককে পদচ্যুত করা যায়। বিচারকগণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দায়িত্ব বিচার-বিভাগীয় উচ্চতম সভার (Higher Council of Judiciary) উপর থাকে।

ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে, বিচারকের কাছে কোনও মামলা আসবার আগে ভারপ্রাপ্ত একজন বিচারক ঐ মামলা সম্পর্কে নিজেই তদন্ত করেন। তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত বিচারক সংশ্লিষ্ট মামলাতে লিপ্ত সন্দেহজনক কাউকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিতে পারেন ও তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে আটক রাখতে পারেন। এই ধরনের ভারপ্রাপ্ত বিচারকগণ কেবলমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ের সঙ্গেই যুক্ত থাকেন ও পারকোত্ (Parquet) বা সরকারি উকিলের (Public prosecutor) অধীনে কাজ করেন।

আমেরিকা, ভারতবর্ষ ও যুক্তরাজ্যের বিচার পদ্ধতিতে বিচারপতিগণ সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ থাকেন। বিবদমান উভয়পক্ষের মধ্যে সরকার পক্ষের একজন উকিল মামলা চালাবার জন্য থাকেন। সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সাহায্যকারী উকিলের দ্বারাও কোনও ব্যক্তি তাই নিজের মামলা চালাতে পারেন অথবা মামলায় জড়িত উভয়পক্ষ নিজেদের পছন্দ মত উকিল নিযুক্ত করেন। অন্যদেশে মামলা চলাকালে বিচারপতি মধ্যে মধ্যে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিচারকার্যে নিজের রায়দানের পথ পরিষ্কারের চেষ্টা করেন মাত্র। তিনি নিজে কখনই আসামী, সাক্ষী বা উকিল প্রভৃতিকে ক্রমাগত জেরা করেন না। কিন্তু ফ্রান্সের বিচার পদ্ধতিতে বিচারকগণের ভূমিকা ঠিক বিপরীত। এই প্রসঙ্গে ফাইনার বলেন, ''the judge is more than the English judge, a kind party to the issue, he seeks the facts, whether there is jury or not.'' তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত বিচারকের তদন্তে কাউকে

গ্রেপ্তার ও আটকের সম্ভাবনা জড়িত থাকার ফলে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলা বাহুল্য যে তদন্তকারী ভারপ্রাপ্ত বিচারকগণ নিজেদের পদোন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তদন্তকার্য পরিচালনা করেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে, বিচার তদন্ত সম্পর্কিত বিবরণ দাখিলের ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা গভীর অভিনিবেশের বিষয়।

পারকোত (parquet) ফরাসি বিচার বিভাগের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। তিনি জনসাধারণের সুবিধা দেখার নিমিত্ত সরকারি উকিল নামেও পরিচিত। প্রতিটি আদালতে একজন সরকারি এ্যাটর্নির অধীনে কিছু সরকারি কর্মচারি সহ একজন করে পারকোত থাকতেন। এঁরা প্রাথমিক আদালতে সাবস্টিটাস (Substitus) নামে এবং আপিল আদালত সাবস্টিটাস জেনারেল (Substitus General) নামে পরিচিত। তাঁর কাজকর্ম পরিচালনার জন্য সরকারি গোয়েন্দা দপ্তরের সাহায্য নিতে পারেন। পারকোত্গণকে অপসারণ করা যায় না। তাঁরা ক্রমে ক্রমে পদোন্নতির দিকে অগ্রসর হন। তাঁদের কাজকর্ম প্রধান ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারেই জড়িয়ে থাকে। তবে রাষ্ট্রের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দেওয়ানী মামলাতেও তাঁরা অংশ নেন। বিচার বিভাগের বিভিন্ন আদেশ ও ঘোষণা কার্যকর হচ্ছে কিনা তা দেখাও পারকোত্গণের দায়িত্ব।

১১.৫ ফ্রান্সের প্রশাসনিক আইন ও আদালত

প্রশাসনিক আইন বা Administrative Law বা Droit Administratiff (দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফ) ফরাসি সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য। ফ্রান্সে সাধারণ বিচার আদালতগুলি নাগরিকগণের বিবাদ বিসংবাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং বিভিন্ন আইনসমূহকে নাগরিকগণ কিভাবে মেনে চলছে তার বিচার করে। অন্যদিকে প্রশাসনিক আদালতগুলি সরকারি প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক দ্বন্দু, অন্তর্বিভাগীয় বিরোধ এবং প্রশাসনিক বিভাগের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ক্ষোভ বা অভিযোগ সম্পর্কে বিচার করে।

ফরাসি বিপ্লবের উদগাতাদের মতে প্রশাসনিক ব্যাপারে বিচার-বিভাগের যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ অকাম্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। তাই প্রশাসনিক আদালতের জন্য Droit Administratiff নামে আইনের প্রবর্তন করা হয়। এই ধরনের প্রশাসনিক আদালত ১৭৯৯ সালের সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের আমল থেকে চলে আসছে। প্রশাসনিক আদালতের আইন বা Droit Administratiff সম্পর্কে নানা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। যেমন—ওয়েড্-এর মতে, ''Administrative Law is primarily concerned not with judicial control nor even legislation by delegation.'' ড.জেনিংসের মতে ''Administrative law is the law relating to the administration. It determines the organization powers and duties of administrative authorities.''

অধ্যাপক ডাইসি বলেন, ''Droit Administratif as it exists in France is not the sum of powers porcessed or of the functions discharged by the administration. it is rather the sum of the principles which govern the relation between French citizens as individuals and the administration as the representative of the State.''

তিনি আরও বলেন যে, ''Driot Administratif is the portion of French law which determines : (i) The position and liabilities of all state officials, (ii) the civil rights and liabilities of private individuals in their dealings with officials as representatives of the States and (iii) the procedure by which these rights and liabilities are enforced.''

অন্যত্র অধ্যাপক ডাইসির প্রদত্ত সংজ্ঞা হল—''that body of rules which regulate the relations of administration of the administrative authority towards private citizens.

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাইসি দুইটি নীতির কথা বলেন। প্রথমত, দ্রয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সরকার ও সরকারি কর্মচারীবৃন্দকে এক বিশেষ ধরনের অধিকার, সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। একজন নাগরিক অন্য একজন নাগরিকের সঙ্গে আইননগতভাবে যে অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতির উপর সরকারি কর্মচারীগণ বিশেষ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের সঙ্গে একজন সরকারি কর্মচারীর ব্যবহার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যবহার, দুই-এর মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। দ্বিতীয়, কার্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অধিকতর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার জন্য সরকারের আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ যাতে একে অন্যের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে তার ব্যবস্থা দ্রয় এ্যাডমিনিস্ট্রেটিফ করেছে। যেমন, সাধারণ আদালতে বিচারকগণ শাসনবিভাগ থেকে স্বাধীন ও সহজে অপসারিত হন না, তাছাড়া, সরকার ও সরকারি কর্মচারীগণ নিজ নিজ ক্ষমতার এলকায় স্বাধীন ও বিচার বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

❑ ১১.৬ রাষ্ট্রীয় সভা

কাউন্সিল অফ স্টেট বা রাষ্ট্রীয় সভা হল উচ্চস্তরের প্রশাসনিক আদালত। রাষ্ট্রীয় সভা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরাসরি বিচার করে। প্রশাসন-শিক্ষণ কেন্দ্র (School of Administration) থেকে নিযুক্ত হয়েছেন এমন ১৫০ জন সদস্য নিয়ে কাউন্সিল অফ স্টেট বা রাষ্ট্রীয় সভা গঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় সভা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়ে কাজ করে। এই সমস্ত বিভাগগুলির মধ্যে আছে চারটি পরামর্শদান বিভাগ ও একটি বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগ আবার বিভিন্ন কক্ষে বিভক্ত রয়েছে।

পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এই কক্ষগুলি বিভিন্ন অধস্তন সদস্যগণের রিপোর্টের বিচার করেন। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মামলার বিচার যত সম্ভব বেশি সংখ্যক বিচারক দ্বারা সম্পাদিত হয়। এমনকি ১৫ সদস্য দ্বারা গঠিত কোন কক্ষেও বিচারকার্য চলে। রাষ্ট্রীয় সভার এলাকাই কেবল ব্যাপক নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে সে ক্যাসেশন আদালত এবং আপীল আদালতের সক্ষমতার বিচারকার্য করে।

এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী বিভিন্ন ত্রুটিগুলি হ্রাস করবার জন্য রাষ্ট্রীয় সভা চেষ্টা করে ও সাধারণ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। বিশেষত নাগরিকগণ যেখানে সাধারণ বিচার আদালতে তাদের

অভিযোগের ক্ষোভ নিরসন করতে অসমর্থ হন, সেখানে রাষ্ট্রীয় সভা বা সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত নাগরিকের অভিযোগ যথাযথ বিচার করে।

সবশেষে, প্রশাসনিক আদালতগুলির সুযোগ গ্রহণ করা নাগরিকদের পক্ষে অনেক সহজ। রাষ্ট্রীয় সভার নিকট প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ অভিযোগ দরখাস্তে আবেদন করে ডাকযোগে পাঠালেও মামলার বিচার চলতে পারে। যে সামান্য আদালত ফি জমা দিয়ে মামলা হয় নাগরিকপক্ষ মামলায় জয়লাভ করলে সেই সামান্য টাকাও তাঁকে ফেরত দেওয়া হয়।

সমালোচকগণ, বিশেষত এ্যাংলো আমেরিকান আইনব্যবস্থার সমর্থকগণ ফ্রান্সের দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রশাসনিক আদালত হচ্ছে প্রশাসন বিভাগেরই বিভাগীয় আদালত, সুতরাং প্রশাসনিক গলদের বিচার প্রশাসনিক আদালত দ্বারা সম্ভব নয়। কারণ, এখানে অপরাধী বা আসামী হচ্ছে প্রশাসন বিভাগের কর্মচারী আবার বিচারক হচ্ছেন প্রশাসন বিভাগের বর্তমান বা অতীতের কোনও কর্মচারী। সুতরাং এখানে স্বাধীন নিরপেক্ষ ও ন্যায় বিচার সম্ভব নয়। বিচার প্রশাসনিক-পক্ষপাতদোষে দুষ্ট হবার সম্ভাবনাই সর্বাধিক থাকে। কারণ প্রশাসনিক আদালত কর্তৃক প্রশাসনিক ত্রুটির বিচার কার্যত আত্মসমীক্ষার তুল্য হয়ে একটা লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফের অর্থ বিভাগীয় বিচার। স্বাধীন, নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র একটি আদালতে বিচার যতটা সুষ্ঠু ন্যায়পরায়ণ ও যথার্থ হওয়া সম্ভব, বিভাগীয় আদলতে তা হয় না। ফলে, এখানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা সততই ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সাধারণ আদালতের বিচারের মত প্রশাসনিক ত্রুটির বিচার হলে সরকারি কর্মচারীগণ তাঁদের কাজে অনেক বেশি দায়িত্বশীল হতে পারেন এবং দেশের সামগ্রিক মৌল আইনকে যথাযথাভবে মেনে চলা উচিত বলে ভাবতে পারেন।

অ্যাংলো-স্যাক্সন আইনবিদ্‌গণ বলেন যে, ইংলন্ড আমেরিকায় সরকারের আদেশের উপরে কাজ হলেও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের উপর অনেক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফলে প্রতিটি সরকারি কর্মচারী নিজ দায়িত্ব কখনও "ওপরওয়ালার" ঘাড়ে চাপাতে পারে না। 'হুকুম' অনুযায়ী কাজ হওয়াই যথেষ্ট নয়, দায়িত্বসহ কাজ হয়েছে কিনা, ইংলন্ড ও আমেরিকায় সরকারি কর্মচারীদের ত্রুটি বিচারে তাই দেখা হয়। কিন্তু ফ্রান্সে ঠিক বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রশাসনিক আদালতগুলি বিচারকার্য সম্পাদন করে।

এই সমস্ত সমালোচনা থাকলেও ফ্রান্সের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে, Droit Administratiff বা প্রশাসনিক আইন থাকার ফলে নাগরিকগণের অধিকার বা স্বাধীনতা কোনভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়নি। বরং রাষ্ট্রীয় সভা দ্বারা পরিচালিত প্রশাসনিক আইন রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ত্রুটির বিরুদ্ধে জনগণকে যথার্থভাবে রক্ষা করে।

অধ্যাপক গার্নার তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ "French Administrative Law" প্রসঙ্গে যথার্থই মন্তব্য করেছেন ঃ "Without fear of contradiction in no other country of the world are the right of individuals so well protected against administrative abuses and the people so sure of receiving reparation for injuries sustained from such abuses."

রাষ্ট্রীয় সভা সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত হিসেবে নিরপেক্ষতার খ্যাতি অর্জন করেছে। প্রশাসনিক আদালতের বিচারকগণ সম্বন্ধে ফাইনারের মন্তব্য হল, ''They are not bureaucratic tyrants but men of just and comprehending mind.''

১১.৭ ❑ উপসংহার

বর্তমান যুগে রাষ্ট্র কল্যাণকর হওয়ায় রাষ্ট্রের কার্যাবলী ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে প্রশাসনিক আধিকারিকগণের কাজকর্মের জটিলতাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য হরেক রকম বিরোধের উদ্ভব হচ্ছে। এই সমস্ত বিরোধের প্রকৃত সত্য সাধারণ আদালতের আইনজীবী ও বিচারকদের দ্বারা সম্যকভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক আদালতের প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞরা বিচারকের পদে থাকার ফলে প্রশাসনিক বিষয়ে খুঁটিনাটি ভালোভাবে বিচার করতে পারেন ও সমস্ত বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনা করে বিভিন্ন বিরোধের মীমাংসা করেন। সারা দেশে ২৬টি আঞ্চলিক প্রশাসনিক আদালত থাকার ফলে নাগরিকগণ অতি সহজেই এবং দ্রুততার সঙ্গে আদালতের বিচার লাভ করেন।

সর্বোপরি, প্রশাসনিক আদালতগুলি সরকারি কর্মচারিগণকে অনেক বেশি স্বাধীনতা ও সরকারি সিদ্ধান্ত কার্যকর করবার ক্ষমতা দান করে। এর ফলে, ফ্রান্সে সরকারি কর্মচারীগণ নিজেদেরকে অনেক দৃঢ় ও স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রের সেবায় নিয়োজিত রাখেন। এই প্রসঙ্গে বার্থ লেমাই-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, ''Let one be gruarded against considering administrative justice as exceptional' justice.....Administrative justice is not a dismemberments of the justice of the law courts. It is judicial organ by which the executive power imposes on the active administration the respect for law. The administrative courts have not taken their role from the judicial authority. They are one of the forms by which the administrative authority is exercised to put the matter even more precisely, it may be said that the administrative tribunals are toward the acts the decisions of administration what the courts of appeal are to decisions of inferior courts.''

উপসংহারে বলা যায় যে, প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত নাগরিকদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে না। উপরন্তু তা প্রশাসনের উপর যথাযথভাবে কার্যকরী নিয়ন্ত্রণের প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষত রাষ্ট্রীয় সভা সম্পর্কে একথা বলা হয় যে, ''All Frenchmen look with high approval as their arguseyed defender against official arbitrariness and oppression. ফ্রান্সের প্রশাসনিক আইনের সমালোচকগণের মধ্যে বিশেষত ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের দেশে অনেকেই ফ্রান্সের দ্রয় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিফকে সুনজরেই দেখেন। বলা বাহুল্য যে, যেখানেই প্রশাসন আছে সেখানে অবশ্যই কোনও না কোনও ধরনের প্রশাসনিক বিচারালয় আছে।

যুক্তরাজ্য এবং ভারতবর্ষেও এই ধরনের বিচারালয় দেখা যায়। যুক্তরাজ্যের Parlimentary commissioner এবং ভারতের লোকপাল (Lok Pal) ও লোক আয়ুত (Lok Ayuta) এই ধরনের প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

১১.৮ ❑ সারাংশ

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফ্রান্সে বিচারব্যবস্থায় দুই ধরনের আদালত দেখা যায়—সাধারণ আইন আদালত এবং প্রশাসনিক আইন আলাদলত। প্রশাসনিক আদালত ফ্রান্সের বিচার ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক। ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। ফ্রান্সে সরকারের আস্থিকশীলতা থাকলেও ফ্রান্সের বিচার-ব্যবস্থা ইঙ্গ-মার্কিন বিচারব্যবস্থা থেকে ভিন্ন। এখানে বিচার-বিভাগীয় পর্যালোচনার (Judicial Review) কাজ করে সাংবিধানিক সভা।

১১.৯ ❑ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ফ্রান্সে বর্তমানে বিচার ব্যবস্থায় বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন। (১১.৪ দেখুন)

২। ফ্রান্সে বর্তমানে বিচার ব্যবস্থার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা ও মূল্যায়ন করুন। (১১.৪ দেখুন)

৩। ফ্রান্সে প্রশাসনিক আইন ও প্রশাসনিক আদালত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন। (১১.৫ দেখুন)

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ঃ

১। ফ্রান্সে প্রশাসনিক আদালত হিসাবে রাষ্ট্রীয় সভার গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করুন। (১১.৬ দেখুন)

২। ফ্রান্সে প্রশাসনিক আদালতের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। (১১.৫ দেখুন)

৩। ফরাসি বিচার-ব্যবস্থার সাথে অন্যান্য দেশের বিচার-ব্যবস্থার তুলনা করুন। (১১.৪ অনুসরণ করুন)

৪। প্রশাসনিক আইনের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন। (১১.৫ দেখুন)

একক-১২ ❑ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

গঠন :

১২.১ **উদ্দেশ্য**

১২.২ **প্রস্তাবনা**

১২.৩ নির্বাচনী রাজনীতি ও বহুদলীয়-ব্যবস্থা

১২.৪ বর্তমান ফ্রান্সের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল

১২.৫ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

১২.৬ সারাংশ

১২.৭ অনুশীলনী

১২.১ ❑ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হ'ল ফ্রান্সের বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিচয় দেওয়া। ফ্রান্সে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, বহুদলীয়-ব্যবস্থা এবং চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কিভাবে কাজ করে এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি তা ব্যাখ্যা করা।

১২.২ ❑ প্রস্তাবনা

ফ্রান্সের বহুদলীয় ব্যবস্থা রাজনীতির ছাত্রছাত্রীদের কাছে গভীর আগ্রহের বিষয়। কারণ দলীয়-ব্যবস্থার ইঙ্গ-মার্কিন ধাঁচের বাইরে ফ্রান্সেই প্রথম বহুদলীয় ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে এবং শত ঝড়ঝঞ্ঝা সত্ত্বেও বহুদলীয়-ব্যবস্থা আজও ভালোভাবে কাজ করে চলেছে। এই বহুদলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ এবং বহুদলীয় ব্যবস্থার সাথে যুদ্ধ রাজনৈতিক দলসমূহ যার মধ্যে দক্ষিণ, মধ্য ও বাম সকলেই রয়েছে এবং চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ বর্তমান পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক-ব্যবস্থাতে আজো গতিশীল রয়েছে। সুতরাং, ফ্রান্সের দলসমূহ ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহের গুরুত্ব পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে সর্বাধিক—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১২.৩ ❑ নির্বাচনী রাজনীতি ও বহুদলীয় ব্যবস্থা

ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নির্বাচন পরবর্তকীকালে রাষ্ট্রপতি তাঁর নির্বাচন-সমর্থন-ভিত্তিতে অটুট রাখার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে ঠিক মতো নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন।

অধ্যাপক ভিন্‌সেন্ট রাইট এই প্রসঙ্গে বলেন যে, ''Yet no President can simply manufacture support, he has to exploit the mechanisms at his disposal and the circumstances that are favourable.''

বিপ্লবী রাজনীতি থেকে নির্বাচনী রাজনীতিতে ফরাসি সাধারণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটেছে ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার বিকাশের ক্রমরূপান্তরের ফলে। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে দলীয় রাজনীতিতে নানা জটিলতার ও ধূসরতা থাকা সত্ত্বেও এক বিশেষ রূপান্তর ঘটেছে।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ফ্রান্সের দল-রাজনীতিতে ধীরে ধীরে দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। বহুদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ হিসেবে ফ্রান্স-এর বিশেষ পরিচিতি ছিল। কিন্তু ফ্রান্সেও এখন বহুদলীয় ব্যস্থবার দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে এমনভাবে যাতে একে দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার কাঠামোর একটি দেশি হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে নির্বাচকগণের প্রবণতা হল দুটি শক্তিশিবিরের মধ্যে নিজেদের মতামত প্রদানকে সীমিত রাখা। এর ফলে ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়েছে দ্বি-মেরুকরণ (Bi-polarisation)। স্থানীয় স্তরের নির্বাচনে, সংসদের নির্বাচনে এবং শাসনবিভাগের প্রধান অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। দলীয়-ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়ার ফলে ফ্রান্সে এখন দুটি জোট (coalition)-এর উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু এই দুটি জোটের আকৃতি, প্রকৃতি ও গতিপ্রকৃতির কোন সুনির্দিষ্ট ধারা এখনও লক্ষ্য করা যায় না।

ফ্রান্সের তথা পঞ্চ সাধারণতন্ত্রের রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় রূপান্তর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই ঘটনা আধুনিক রাজনীতি প্রবাহের সাথে ফ্রান্সকে যুক্ত করেছে। কারণ দলীয়-ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ হওয়ায় ফ্রান্স এখন স্থিতিশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থার (stable political system) বিশিষ্ট উদাহরণ (Model) হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। গতিশীল পৃথিবীতে অস্থিতিশীল বহুদলীয় ব্যবস্থার উদাহরণ হতে 'স্থিতিশীল দলীয় জোট ব্যবস্থায়' ফ্রান্সের উত্তরণ ফ্রান্সকে বর্তমান পৃথিবীতে একটি মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মর্যদা দান করেছে।

ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ দলীয়-ব্যবস্থার রূপান্তর (অস্থিতিশীল বহু-দলীয় ব্যবস্থা থেকে স্থিতিশীল জোট রাজনীতি দ্বি-মেরুকরণ ব্যবস্থা) হওয়ার কয়েকটি বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য হল (১) প্রাতিষ্ঠানিক (institutional) (২) নির্বাচনিক (electoral) (৩) সামাজিক সাংস্কৃতিক (Social and cultural) রাষ্ট্রপতি এবং দলীয় কৌশলগত কারণ (Presidential and Party Strategies)।

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রে প্রাতিষ্ঠানিক কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রাষ্ট্রপতি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব বৃদ্ধি। এর ফলে রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। দ্বিতীয়ত সংসদের (Parliament) ক্ষমতা ও মর্যাদার লঘুকরণ ঘটেছে। তৃতীয়ত, সংসদের (Parliament) ক্ষমতা ও মর্যাদার লঘুকরণ হওয়ায় সংসদের সদস্যদের ভূমিকা গুরুত্বহীন হয়েছে। এর ফলে জোট রাজনীতির প্রক্রিয়াকরণের সূত্রপাত ঘটে এবং তা ক্রমশ দ্বি-মেরুকরণ স্তরে পৌছায়। কারণ ফ্রান্সের নির্বাচকদের কাছে সংসদের মধ্যে একজন প্রতিনিধির ব্যক্তিগত ভূমিকার গুরুত্ব থেকে সেই প্রতিনিধি ফ্রান্সের সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে কি এবং কতখানি ভূমিকা পালন করে তাই

গুরুত্বপূর্ণ হয়। এর ফলে সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে (pro-government of anti-government) এই দুই দিক থেকে জনপ্রতিনিধির ভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ হওয়ায় ব্যক্তিগত ভূমিকার পরিবর্তে সরকার কেন্দ্রিক অবস্থান বা ভূমিকার গুরুত্বই নির্বাচকদের কাছে বিচার্য হয়ে থাকে। সরকার পক্ষের জোট অথবা সরকার বিরোধী পক্ষের জোটের সরল বিভাজনের মধ্যে নির্বাচকগণ তাঁদের প্রতিনিধিকে দেখতে চান। এর ফলে সরকার পক্ষের অথবা বিরোধী পক্ষের এই দ্বি-মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় দলীয় রাজনীতি বিভক্ত হয়।

১৯৬৯ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় থেকেই ফ্রান্সের নির্বাচনী রাজনীতিতে দুটি শক্তিশালী রাজনৈতিক জোটের উদ্ভব ঘটতে শুরু করে। দ্বিতীয় ব্যালট নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচক দ্বিতীয় ব্যালটে ভোট দেবার সময় দুজন প্রার্থীর মধ্যে একজনকে নির্বাচিত করে। এই দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতিই শেষ পর্যন্ত দেশের রাজনীতিতে দল ব্যবস্থার দ্বিমেরুকরণ ঘটায়। এছাড়া, জোট বেঁধে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে নির্বাচকদের কাছে অনেক আশাপ্রদ বলে একটি রাজনৈতিক দল নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। ফলে জোট রাজনীতির ধারা শেষ পর্যন্ত দ্বি-মেরুকরণ স্তরে পর্যবসিত হয়। ফ্রান্সের জোট রাজনীতির ধারার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে রাইট-এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য—''Viable political coalitions can be rooted only in a deeper economic, social and political reality no form on electoral system is likely to induce firendly and enduring cooperation between rural cattloic conservation and urban atheist communists.''

সামাজিক সাংস্কৃতিক কারণেও আজ ফ্রান্সের দলীয় ব্যবস্থার দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য ফ্রান্সের সমাজকে বর্ণনা করা হত fragmented conflictual society হিসাবে। এ ধরনের সংস্কৃতি ছিল ইংলিশ চ্যালেনের অপর পারে ইংলন্ডের রাজনীতিক সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এর কারণ ছিল ফ্রান্সের শাসক (regime) ফরাসি সমাজকে খন্ডিত করে রাখত এবং তার ফলে বিবাদ বিসংবাদ (conflict) ছিল ফরাসি সমাজের সংস্কৃতি। রাজতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ এবং সাম্যবাদ ফ্রান্সের তৃতীয় সাধারণতন্ত্রের আমলে ফ্রান্সকে বিবদমান রাজনৈতিক সংস্কৃতির জোয়ারে নিমজ্জিত করেছিল। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সংসদীয় গণতন্ত্রও চরম দক্ষিণপন্থা ও চরম বামপন্থার বিবাদের আঘাতে ছিল জর্জরিত। চতুর্থ সাধারণতন্ত্রের সময়ে ফ্রান্সের সমাজ ছিল বহুজাতীয় বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত (heterogenous, fvragmented and divided) ভিনসেন্ট রাইটের মতে, ''France was pictured, therefore, as a country divided into warring and irrecnocilable political camps, each conforming its own party'' কিন্তু পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ফ্রান্সের সমাজে শিল্পায়ন, নগরায়ন ও আধুনিকীকরণ ঘটে। এর ফলে স্থানান্তর, নারীশ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ধর্মের প্রভাব হ্রাস প্রভৃতি ঘটে। ১৯৬৮ সালে প্যারিসে বেন্দিতের নেতৃত্বে বিখ্যাত ছাত্র আন্দোলন ফরাসি সমাজ ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে উন্মোচিত করে। এই সময় থেকে ফ্রান্সের রাজনৈতিক শক্তিগুলির নতুন পুনর্বিন্যাস ঘটতে থাকে। নির্বাচনী-আবরণের কাঠিন্যহীনতা তথা তরলতার ফল ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি বিশেষ আসক্তি কারো না থাকায় ফ্রান্সের দলীয় রাজনীতি ক্রমশ জোট-রাজনীতির রূপ গ্রহণ করে। নির্বাচকদের দলীয় আনুগত্য

দুর্বল প্রকৃতির হওয়ায় এই জোট রাজনীতিরও দ্বি-মেরুকরণ ঘটেছে। এই উত্তরণের জন্য অবশ্য দলীয় নেতৃত্ব এবং ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতিদের প্রচেষ্টায় সাফল্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ ঃ

ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ হিসাবে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত, অধ্যাপক লাওয়েলের ভাষায় বলা যায়, ''The multi-party system in France was due to the political immaturity of the French people''. তাই বহু দলপ্রথার প্রাথমিক কারণ হল ফরাসি রাজনীতির ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতার অভাব।

বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতন ফ্রান্সে বহু দলীয় প্রথা উদ্ভবের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। প্রতিটি সরকারের উত্থান-পতনে, একদল করে সমর্থক গোষ্ঠী ও বিরোধী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছিল। তারা একে অন্যের সাথে কখনই একযোগে কিছু করবার মানসিকতার ধারে কাছে থাকতেন না। ফলে ফ্রান্সে বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, ফরাসি রাজনীতিবিদ্‌গণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাত্ত্বিক। তাঁদের অধিকাংশই বাস্তব কর্মপন্থার লোক নন। সিজ্‌ফ্রেডের মতে, ''French politics are often both unrealistic and passionately ideological, একজন ফরাসি তাঁর স্বভাব অনুযায়ী একজন স্বতঃসিদ্ধ জীবনধর্মী দার্শনিক। নাৎসীদের উক্তি অনুযায়ী বলা যায় যে, ''ফ্রান্সের পথেঘাটে যে সমস্ত লোকজন দেখা যায় তাঁদের অধিকাংশ হয় কবি, নয় রাজনীতিবিদ্, নয় মাতাল, নয়তো বারবণিতা।'' বাস্তবতার থেকে আদর্শগত ভাবনাই একজন ফরাসির নিকট অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নিজের মতে কার্যকারিতার বাস্তব পরিণাম যাই হোক না কেন, নিজের মতান্ধতা ফরাসি ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে লাওয়েল বলেন, ''a Frenchman is inclined to persue an ideal, striving to realise his conception of a perfect form of society and is reluctant to give up any part of it for the sake of attaining so much as his within lines reach. such a tendency naturlly gives rise to a number of groups, each with a separate ideal, and each unwilling to make the sacrifice that is necessary for a fusion into a great party.''

তৃতীয়ত, এই ভাবপ্রবণতা ফরাসি রাজনীতিবিদ্‌গণকে আবেগ সর্বস্ব করে তুলেছে। তাঁদের পছন্দ ও অপছন্দের মাত্রার তারতম্য সাংঘাতিক ভাবে চরম বৈপরীত্যে বিরাজ করে। ফলে তাঁদের নিকট রাজনীতি 'এক ধরনের খেলার' (game) পরিবর্তে 'এক রকম যুদ্ধে' (war) পরিণত হয়েছে, যার ফলে বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অনিবার্যভাবে ঘটেছে। ফ্রান্সে বিরোধী দলগুলি সরকারি দলের নিকট থেকে কোনও সুব্যবহারের আশা করে না।

যে রাজনৈতিক দল যখন সরকারি ক্ষমতায় থাকে তখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে অত্যাচারমূলক আচরণ করে।

চতুর্থত, ফরাসি দেশের রাজনীতির মানুষ (Political man) ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও একগুঁয়ে। অপরকে অনুসরণ করার পরিবর্তে নিজের মতান্ধতাকে শ্রেয় বলে মনে করেন। তাঁদের ধারণা হল যে, অন্য কারও প্রভাবের সংস্পর্শের অর্থ নিজের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়া। সমস্ত নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ফরাসি ব্যক্তির মহত্ত বলে বিবেচিত হয়। এতে, বহু রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়েছে।

পঞ্চমত, ফরাসি মানুষ আবার অত্যধিক ধর্মপ্রাণ ও ধর্মভীরু। ফলে গীর্জার ভূমিকাও ফ্রান্সের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করেছে। গীর্জা বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে এমন ধরনের মতামত প্রকাশ করে যা দেশে রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি করে। ফলে অনেক রাজনৈতিক দলের ভাঙন ঘটে ও নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়।

ষষ্ঠত, ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বহুদলীয় ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। ফ্রান্সের চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হল ক্ষুদ্রায়তন কৃষি ও শিল্প। ফ্রান্সে ছোট ছোট শহর ও গ্রামের অর্থনীতি মূলত এক ব্যক্তি বা এক পরিবার-মালিকানায় পরিচালিত হত। এই ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির অর্থনীতি ফ্রান্সে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণতাবাদী রাজনীতির প্রসার করেছে। অতীতে সরকার বা জাতীয় সভার কার্যাবলীতে তাঁদের উৎসাহ ছিল কম। অন্যদিকে নিজেদের ব্যবসার মুনাফা অর্জনের দিকে উৎসাহ ছিল প্রখর। সুতরাং তাঁদের কাছে রাজনীতি কোন নীতি বলে বিবেচিত হওয়ার পরিবর্তে কেবল একটি মন্ত্র স্বার্থ চরিতার্থ করা যায়-এ ধারণাই ফরাসি জনমানসে বদ্ধমূল ছিল। একজন মানুষের নিকট রাজনীতি ছিল 'দ্রব্যসামগ্রী'-বিশেষ যার বিনিময়ে নিজ সুখসুবিধা ভোগ করা যেত। ফলে একই মানুষ একই সময়ে বা স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন দলের সমর্থক হয়ে দশ দিক থেকে নিজ স্বার্থসিদ্ধির সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে থাকত। এতে বহু রাজনৈতিক দল অনিবার্য হয়ে পড়েছে।

ফরাসি জনগণ দেশের রাজনীতিবিদগণকে তাঁদের 'দূত' বলে মনে করে। তাঁদের মতে, এই 'জনপ্রতিনিধি' নামক 'দূতের কাজ হল জনতার বিভিন্ন দাবিগুলির জন্য সরকারকে চাপ দেওয়া ও ব্যক্তির বা কোন জনতাবিশেষের পছন্দসই দাবিটি পূরণ করে দেওয়া। এই সমস্ত মানসিকতা ও আচরণ পদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতি যা হয়, ফ্রান্সে বহুদলীয় ব্যবস্থার প্রসারে তাই ঘটেছে। সুতরাং অর্থনৈতিক স্বার্থ নিজস্ব প্রয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলিকে গড়েছে এবং ভেঙেছে। যে কোন ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর পক্ষে অতি অল্প প্রয়াসেই জাতীয় সভায় কিছু আসন সংগ্রহ করা সম্ভব বলে ফ্রান্সে সহজেই ক্ষুদ্র রাজনৈতিক দলের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়।

সবশেষে ফ্রান্সের বর্তমান সংসদীয় ব্যবস্থার রীতিনীতিগুলিও বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে, যেমন দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি, পার্লামেন্টের কমিটি গঠন রীতি, রাপোর্তার দ্বারা সরকারি কমিটির বিবৃতি ব্যাখ্যা এবং পার্লামেন্ট বাতিলের সম্ভাবনা বাস্তবে না থাকা।

এছাড়া, সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি থাকার ফলে ফ্রান্সে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।

১২.৪ ❑ বর্তমান ফ্রান্সের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল

ফ্রান্সের প্রথম সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কালে এই বহুদলীয় ব্যবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। কোন কোন দল ইতিমধ্যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষুদ্র দল অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধানত চারটি রাজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। রাজনৈতিক দলের সংখ্যা প্রায় এক ডজনের অধিক থেকে মাত্র চারটি দলে হ্রাস পাওয়ার কয়েকটি কারণ হিসেবে বলা যায় যে, দ্য গলপন্থী বা গ্যালিস্ট (Gaullist) দল বিভিন্ন রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী দলগুলিকে হজম না করগলেও গলাধঃকরণ করেছে। অন্যদিকে জেনারেল দ্য গলের নেতৃত্বে দ্য গলপন্থীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অন্যান্য ছোট ছোট বামপন্থী দলগুলিকে যুথবদ্ধ হতে ও পারস্পরিক সহযোগিতা করতে বাধ্য করেছে। যেমন পুরানো সোস্যালিস্ট ও র‍্যাডিকাল দল দুটি একত্রিত হয়ে ফেডারেশন অফ দি সোস্যালিস্ট এবং ডেমোক্র্যাটিক লেফ্‌ট দল গঠন করেছে। চার পাঁচটি ছোট ছোট গোষ্ঠী মিলে গঠন করেছে ডেমোক্রাটিক সেন্টার। এ ছাড়া দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি যেখানে কেবলমাত্র প্রথম দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে পারস্পরিক সমঝোতায় আসতে বাধ্য করেছে। বিশেষত দ্য-গল এর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের পরিবর্তে (alternate) গঠন করবার জন্য বিভিন্ন দল একত্রিত হয়েছে। পঞ্চম সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের রাষ্ট্রপতির পার্লামেন্ট বাতিল করার ক্ষমতা বিরোধী দলগুলিকে দমনে সরকারের হাতে অন্তত একটি প্রদর্শনী-চাবুকের কাজ করেছে। এছাড়া ৩০ জন ডেপুটির সংগঠিত গোষ্ঠী ছাড়া পার্লামেন্টের কমিটিতে কারও প্রতিনিধি পাঠানো যাবে না-এই নীতি ছোট ছোট দলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। নতুন নির্বাচনী আইন যেখানে শতকরা ৫ ভাগ ভোট না পেলে আমানত বাজেয়াপ্ত হয় বা শতকরা ১০ ভাগ ভোট না পেলে দ্বিতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবার ফলেও বহু ছোট ছোট দল রাজনীতি থেকে সরে গেছে। সর্বশেষ ফ্রান্সের গ্রামগুলির আধুনিকীকরণ হওয়ায় কৃষিমানসিকসতার উপর প্রভাব কমছে ও স্থানীয় আঞ্চলিকতাবোধ ক্রমশই হ্রাস পেয়ে ফ্রান্সের রাজনৈতিক জনমানসে জাতীয়তাবোধ প্রসারিত হয়েছে। এই সমস্ত কিছু সমষ্টিগত ফল হিসাবে ফ্রান্সের বহুদলীয় রাজনীতির জটিল আবর্তের অনেক সরলীকরণ ঘটেছে। এ যাবৎ যে সহযোগিতা ও ঐক্যের ঝোঁক রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে লক্ষিত হয়েছে, তাহা দীর্ঘস্থায়ী রূপে চলবে বলে আশা করা অত্যুক্তি হবে না। কারণ দ্য গলের মৃত্যুর পরেও দ্য গলীয় রাজনীতির ধারাবাহিকতা আজও ফ্রান্সে অক্ষুণ্ণভাবে বজায় আছে। ফলে ফ্রান্সে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন চতুর্দলীয় বা পঞ্চদলীয় ব্যবস্থার প্রাধান্যের সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির পদে জ্যাক সিরাকের দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা ফ্রান্সকে এক ধরনের দুই ধরনের জোটের (Bipolar coalition) রাজনৈতিক দলব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১২.৫ ❑ ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি — (PCF)

ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টি শুধু ফ্রান্সের একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলই নয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ফরাসি পার্টির প্রভাব অনস্বীকার্য। ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ইউরোপে কমিউনিস্ট আন্দোলনে বরাবর নিজস্বতা বজায় রেখে চলেছে। ফলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ধ্বংসের পরেও ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্বগণ ভিত্তি এবং নিজস্ব কর্মসূচী বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের বহু পূর্বেই ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি "সর্বহারার একনায়কত্ব'র তত্ত্ব পরিত্যাগ করেছিল এবং রাজনৈতিক বহুত্ববাদের পথ গ্রহণ করেছিল। মার্কসবাদ লেনিনবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে নতুন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছে। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নতি, সংবাদ ও গণমাধ্যমের কৃৎকৌশলগত বিপ্লব কিছুদিন পূর্ব অবধি প্রচলিত সমস্ত ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। কিন্তু শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মালিক-শ্রমিক শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্ক যে বৈরী (antagonistic) সে সত্য আজও অভ্রান্ত। তাই নানা পরিবর্তনের মাঝেও মার্কসবাদ সত্য ও প্রাসঙ্গিক। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব ফ্রান্সে ও সারা পৃথিবীতেই রয়েছে। ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের তুলনায় ফরাসি কমিউনিস্টি পার্টির গুরুত্ব ফ্রান্সে ও বিশ্বে আজও লক্ষ্য করা যায়।

সমাজতন্ত্রী দল (PS)

বর্তমানে সমাজতন্ত্রী দলের সমস্যা হল যে, প্রথমত, এই দলের কোন সামাজিক গণভিত্তি নেই (Weak link in civil society)। দ্বিতীয়ত, এই দলের অভ্যন্তরীণ ঐক্যের বড় অভাব। তৃতীয়ত, দলের বিভিন্ন কাজকর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের অভাব। চতুর্থত নির্বাচনী ফলাফল বিপর্যয় ও দলের নির্বাচনী সমঝোতা সম্পর্কিত সমস্যা। এত সব সমস্যা সত্ত্বেও সমাজতন্ত্রী দল নিজের প্রভাব এখনও বজায় রেখে চলেছে। এই দল ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মতই ফ্রান্সের ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেই সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করার পক্ষপাতী। তাই সমাজতন্ত্রী দলকে মধ্যপন্থী দল বা Centre of the left বলা হয়। গত ২২.৪.৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ফরাসি নির্বাচনে সমাজতান্ত্রিক দলের (Socialist Party) প্রার্থী Francois Hollande রাষ্ট্রপতি পদে জয়লাভ করেছেন Nichloas Sarkozy-কে পরাজিত করে।

১২.৬ ❑ সারাংশ

পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও বহুদলীয় ব্যবস্থা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলেছে। ফ্রান্সে বর্তমানে অতি-দক্ষিণ, দক্ষিণ, মধ্য, বাম এবং অতিবাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব রয়েছে। এ ছাড়া রয়েছে ফ্রান্সে অসংখ্য পেশাদারী সংঘ এবং একটি বিষয়ভিত্তিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ। উদারগণতন্ত্র হওয়ায় ফ্রান্সে অসংখ্য দল ও গোষ্ঠীর স্বাধীন বিকাশ যেভাবে ঘটে তা ইউরোপের অন্য কোন দেশে দেখা যায় না বললেই চলে। তবে সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী যে জাতীয় স্বার্থ দ্বারাই পরিচালিত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

১২.৭ ❑ অনুশীলনী

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ফ্রান্সের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার আলোচনা ও মূল্যায়ন করুন। (পাতা ১৯৭-২০১)

২। ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান কর্মসূচি আলোচনা করুন। সমাজতান্ত্রিক দলের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির পার্থক্য উল্লেখ করুন। (১২.৫-এ প্রথম দুই অনুচ্ছেদ)

৩। ফ্রান্সের বহুদলীয় ব্যবস্থার কারণ বর্ণনা করুন। (পাতা ২০০)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সহায়ক পাঠক্রম

দ্বিতীয় পত্র

(SPS-II)

পর্যায়

০৪

একক ১৩ ❑ বিবর্তন ও মূলনীতি

গঠন

১৩.১ উদ্দেশ্য
১৩.২ প্রস্তাবনা
১৩.৩ ঐতিহাসিক বিবর্তন
১৩.৪ আধুনিক জার্মানির জন্ম
১৩.৫ হাইমার প্রজাতন্ত্র
১৩.৬ নাৎসী-শাসিত জার্মানি
১৩.৭ জার্মানির বিভক্তিকরণ
১৩.৮ দুই জার্মান রাষ্ট্রের পুনর্মিলন
১৩.৯ জার্মান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি
১৩.১০ সারাংশ
১৩.১১ প্রশ্নাবলী
১৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১৩.১ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন জার্মান রাষ্ট্রের বিবর্তন ও তার মূলনীতিগুলি এবং আপনি জানতে পারবেন ঃ

- জার্মানির রাষ্ট্রিক ইতিহাসের স্বরূপ কী?
- কোন্ বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে জার্মান রাষ্ট্রের জন্ম হয়?
- বর্তমান জার্মান রাষ্ট্রের বিবর্তনের মূল পর্যায়গুলি কী কী?
- আধুনিক জার্মান রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার মূলনীতিগুলি কী কী?

১৩.২ প্রস্তাবনা

পশ্চিম ইউরোপের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র জার্মানি। বর্তমানে এর আয়তন 137803 বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা 82.10 মিলিয়ন। আধুনিককালের জার্মানির জন্ম হয় 1871 সালে এবং এর বর্তমান সংবিধান রচিত হয় 1949 সালে।

ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির তুলনায় জার্মানির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ভিন্ন ধরনের এবং খুবই চিত্তাকর্ষক। যে সামাজিক ও রাষ্ট্রনীতিক শক্তিগুলি ইউরোপের আধুনিকতার যুগ নিয়ে এসেছিল সেগুলি জার্মানির ক্ষেত্রে অনেক পরে এসেছে। ঊনবিংশ শতকের মধ্যে যখন অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি তাদের সীমানা নির্ধারিত করে নিতে পেরেছিল তখনও জার্মানির নিজস্ব নির্ধারিত কোনো সীমানা ছিল না। তখন জার্মানি বলতে ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি রাষ্ট্রিক একককে বোঝাত মাত্র। আঞ্চলিকতার কারণে, ধর্মীয় কারণে এবং অর্থনীতিক কারণে জার্মান ভাষাভাষী লোকেরা বিভক্ত ছিল এবং তাদের কোনো জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠেনি। যে শিল্প বিপ্লব ইউরোপে আধুনিকতার জন্ম দেয় সেই শিল্প বিপ্লব জার্মানিতে আসে অনেক পরে। যখন শিল্পায়নের প্রক্রিয়া জার্মনিতে শুরু হল তখনও কিন্তু তা জার্মানির পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক এবং অভিজাত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে পারেনি। জার্মানিতে জাতিগঠনের জন্য এক দীর্ঘ ও সমস্যাসঙ্কুল পথ ধরে এগিয়ে যেতে হয়।

১৩.৩ ঐতিহাসিক বিবর্তন

ইতিহাসে জার্মানিকে প্রথম দেখা যায় রোমানদের সঙ্গে সংস্পর্শে আসার পর থেকে। খ্রিস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরদিকের সীমানা নির্দেশ করে জার্মানি। প্রধানত রাইন নদী ও দানিউব নদীর মধ্যস্থল জার্মানি নামে পরিচিত ছিল। চতুর্থ শতকে হুণরা এই অঞ্চলে প্রবেশ করার পর ইউরোপের বিভিন্ন অংশে জার্মান শাসকরা তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। জার্মানির পূর্ব অংশে স্লাভ জাতিগোষ্ঠীর লোকেদের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। জার্মান বা ডয়েশ (Deutsch) কোনো জনগোষ্ঠীর নাম নয়। আনুমানিক সপ্তম শতকে ল্যাটিন ভাষার পরিবর্তে যে 'হাই জার্মান' আঞ্চলিক ভাষার (Deutsch) প্রচলন হতে আরম্ভ করে তাকে কেন্দ্র করেই জার্মানির জাতিসত্তা বিকশিত হতে আরম্ভ করে। ইউরোপে মধ্যযুগের রমরমা অবস্থায় নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে "জার্মান সাম্রাজ্য" নামে মধ্য-ইউরোপে আলপস্ পর্বতের উত্তরদিকে একটি রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে যখন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও স্পেন তাদের নিজস্ব রাজার অধীনে পৃথক এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে লাগল তখন এই তথাকথিত জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাটকে সাতজন আঞ্চলিক শাসক (Elecltor) নির্বাচিত করতেন। পরবর্তীকালে তুর্কীদের আক্রমণ, ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ, মার্টিন লুথারের সংস্কার আন্দোলন (Rdormation) এবং সংস্কার-বিরোধী (Counter-reformation) আন্দোলনের ফলে ধীরে ধীরে এই আঞ্চলিক শাসকের ক্ষমতাবৃদ্ধি ঘটে। ষোড়শ শতকের শেষ দিকে ধর্মীয় যুদ্ধ হলে জার্মান সাম্রাজ্য (Reich) দুর্বল হয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতকে নেদারল্যান্ড এই সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে যায়, সুইজারল্যান্ড নিজস্ব রাষ্ট্রিক মর্যাদা লাভ করে। ওয়েস্টফালিয়া চুক্তির (1648) ফলে পশ্চিম ইউরোপে আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সীমানা নির্ধারিত হয়। তথাকথিত জার্মান সাম্রাজ্য বলতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রিক এককের (political units) দুর্বল অস্তিত্বকেই বোঝায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে পোল্যান্ড ও সুইডেনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ব্রান্ডেনবুর্গের শাসক (Elector of Brandenburg) "প্রাশিয়ার রাজা" হিসেবে পরিচিত

হন এবং প্রাশিয়া একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর প্রায় একশ বছর ধরে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর সবকিছুকেই ছাড়িয়ে যায়। এই সুযোগে রাশিয়া পশ্চিম ইউরোপের ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং পোল্যান্ডের বিভাজন করে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে। প্রাশিয়ার রাজা মাহামতি ফ্রেজরিকের (দ্বিতীয় ফ্রেজরিক) রাজত্বকালেই (1740–1786) রাজনীতির দ্বন্দ্বের মধ্যে জার্মানির সাহিত্য, দর্শন ও চিত্রকলায় অসাধারণ সৃষ্টিশীলতার যুগ শুরু হয়।

ফরাসি বিপ্লবের (1789) পর জাতীয় রাষ্ট্রের (Nation State) যুগ শুরু হয়। সম্রাট ও সাম্রাজ্যের দিন শেষ হতে আরম্ভ করে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আক্রমণে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। কিন্তু নেপোলিয়নের পতন হলে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জার্মানির রাষ্ট্রিক ঐক্য ফিরে আসেনি। জার্মানিতে 1815 সালে প্রায় পঁয়ত্রিশজন আঞ্চলিক শাসক (Princes) এবং চারটি 'স্বাধীন শহর' (Free Cities) নিয়ে একটি দুর্বল "কনফেডারেশন" তৈরি হয়। জার্মানির ঐক্যসাধনে এখন থেকে জার্মানির মধ্যবিত্ত শ্রেণি নেতৃত্ব দিতে থাকে। ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে 1448 সালে "জার্মানি পার্লামেন্টের" অধিবেশন বসে। এখানে অষ্ট্রিয়াসহ "বৃহত্তর জার্মানি" ও শুধু প্রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন "ক্ষুদ্রতর জার্মানির" পক্ষে জার্মানির নেতৃবৃন্দ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। পরে 1866 সালে অষ্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং তার ফলে অষ্ট্রিয়া জার্মানি থেকে পৃথক হয়ে যায়।

১৩.৪ আধুনিক জার্মানির জন্ম

প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 1867 সালে উত্তর জার্মান কনফেডারেশন (North German Confederation) গঠিত হয় এবং এই কনফেডারেশনের সঙ্গে দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলির রাজনৈতিক মোর্চা তৈরি হয়। যখন 1870 সালে ফ্রান্সের সঙ্গে উত্তর জার্মানির কনফেডারেশনের যুদ্ধ হয় তখন দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলি প্রাশিয়ার নেতৃত্বে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফ্রান্সের পরাজয় হলে প্রাশিয়ার ক্ষমতাশালী চ্যান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী) অটো ফন বিসমার্কের নেতৃত্বে দ্বিতীয় জার্মান সাম্রাজ্য (Second German Reich) গঠিত হয় এবং প্রাশিয়ার রাজাকে 'জার্মানির সম্রাট" হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এরপর প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে জার্মানিতে সাংস্কৃতিক বিকাশ তরান্বিত হয়। বিসমার্কের প্রশাসনই পৃথিবীতে প্রথম সামাজিক বিকাশের জন্য আইন প্রণয়ন করে সাধারণ মানুষের সামাজিক-আর্থনীতিক স্বার্থ সুরক্ষিত করা শুরু করে এবং কল্যাণব্রতী রাষ্ট্রের (Welfare State) ধারণা জন্ম নেয়।

১৩.৫ হাইমার প্রজাতন্ত্র

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (1914–18) জার্মানিকে ইউরোপীয় রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে নিয়ে আসে। এই যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় হয় এবং ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে পরাজিত জার্মানির ওপর কিছু অপমানজনক শর্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। জার্মানির হাত থেকে অনেক জমি কেড়ে নেওয়া হয়। যুদ্ধোত্তর জার্মানিকে একটি

প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (Republic) রূপান্তরিত করা হয় হাইমার (Weimar) সংবিধানের মাধ্যমে 1919 সালের আগস্ট মাসে। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন "জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার" ঘোষণা করেন।

প্রথম থেকেই হাইমার প্রজাতন্ত্রের (Weimar Republic) সঙ্গে জার্মান জনগণের কোনো গভীর প্রত্যয়ের সম্পর্ক ছিল না, কারণ মনে করা হত যে, এই প্রজাতন্ত্র পরাজিত জার্মানির ওপর চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে জার্মানিকে বৃহৎ অঙ্কের অর্থ, বিজয়ী মিত্রশক্তিকে দিতে বাধ্য করা হয়—যা দেবার আর্থিক ক্ষমতা জার্মানির ছিল না। জার্মানির শিল্পসমৃদ্ধ রুর (Ruhr) এলাকা ফ্রান্সের অধিকারে চলে যাওয়ায় জার্মানির পুর্নগঠন বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেকারি ও মুদ্রাস্ফীতি বাড়তে থাকে এবং শ্রমিক অসন্তোষ দ্রুত বেড়ে যায়। এসব লক্ষণকে 'গণতন্ত্রের ত্রুটি' বলে জনমনে প্রচার চালানো হয়। হাইমার সংবিধান জার্মানিতে যে-ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন করে তার পক্ষে জনসমর্থন কমতে থাকে। যখন 1929 সাল থেকে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতিক মন্দা শুরু হয়ে যায়, তার প্রভাব দ্রুত পড়তে থাকে জার্মান গণতন্ত্রের ওপর, প্রজাতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। প্রায় ত্রিশটির অধিকসংখ্যক রাজনৈতিক দল জনগণের সমর্থন পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় নামে। সে সময় ছয় মিলিয়নের অধিক ব্যক্তি বেকার হয়ে পড়ে এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে জন-অসন্তোষ বাড়তে থাকে। ক্রমশ দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দলগুলির প্রতি জনসমর্থন চলে যেতে থাকে এবং মধ্যপন্থী দলগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

১৩.৬ নাৎসী-শাসিত জার্মানি

এই রকম পরিস্থিতির মধ্যে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতা অ্যাডলফ্ হিটলার জনগণের আর্থিক দুর্গতির সুযোগ নিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকেন। জার্মান পার্লামেন্টের 1933 সালের নির্বাচনে হিটলারের নেতৃত্বে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্টরা সংখ্যাধিক্য লাভ করে এবং সাংবিধানিক পথেই হিটলার চান্সেলর নিযুক্ত হন। মাত্র চার-পাঁচ বছরের মধ্যেই দেখা যায় যে, হিটলার ও তাঁর নাৎসীবাহিনী একে একে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে খর্ব ও ধ্বংস করতে সক্ষম হয় এবং একচ্ছত্র নেতা (Fuhner) হিসেবে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব অর্জন করেন। হাইমার প্রজাতন্ত্র শেষ পর্যন্ত হিটলারের একনায়কত্বে রূপান্তরিত হল। জার্মানিতে গণতন্ত্রের পরিবেশ ও গণতান্ত্রিক আশা-ভরসা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায়। হিটলারের নাৎসীবাদী মতাদর্শকে আপাতত জনগণের বড়ো অংশের কাছে জোরজবরদস্তির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়। উগ্র জাতীয়তার উস্কানি দিয়ে হিটলার শেষমেশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দেন 1939 সালের সেপ্টেম্বরে। প্রথমে সাফল্য লাভ করলেও 1945 সালের মধ্যেই নাৎসী জার্মনিকে ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত আঘাতের সামনে পরাজয় স্বীকার করে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং হিটলার আত্মহত্যা করেন।

১৩.৭ জার্মানির বিভক্তিকরণ

যুদ্ধ শেষে 1945 সালের জুন মাসে জার্মানির নিজস্ব (1937 সালের যে এলাকা জার্মানির অন্তর্ভুক্ত ছিল) এলাকাকে চারটি "অধিকৃত এলাকায়" (Occupied Zones) বিভক্ত করা হয় এবং চার মিত্রশক্তির (ব্রিটেন, আমেরিকা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্স) প্রত্যেকে এক-একটি অধিকৃত এলাকার শাসনভার গ্রহণ করে। জার্মানির ইতিহাসে "তৃতীয় সাম্রাজ্যের" (Third Reich) অবসান ঘটে। চার বিজয়ী শক্তি 'মিত্রশক্তির নিয়ন্ত্রণী সংস্থা' (Allied Control Council) গঠন করে জার্মানির শাসনক্ষমতা ব্যবহার করতে আরম্ভ করে।

বিজয়ী শক্তিগোষ্ঠী প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধিকৃত এলাকায় গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামো গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ করে। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে সামরিক শাসন গণতন্ত্রী জার্মান জনগণের সহযোগিতা নিয়েই যুদ্ধোত্তর ধ্বংসপ্রাপ্ত জার্মানির রাজনীতিক-আর্থনীতিক পুনর্গঠনে কাজ শুরু করে। কিন্তু 1947 সালের মধ্যেই দেখা যায় আমেরিকা, ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাদের অধিকৃত এলাকায় যেভাবে গণতন্ত্রের কাজ শুরু করেছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন তার অধিকৃত এলাকায় সেভাবে কাজ করছে না; সেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত এলাকা বাদে অন্যান্য এলাকার প্রদেশগুলিতে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় এবং ধীরে ধীরে জার্মান রাজনৈতিক দলগুলিও ট্রেড-ইউনিয়গুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের অসহযোগিতার দরুন তিন পশ্চিমী শক্তি তাদের নিয়িন্ত্রণাধীন জার্মানিকে নিয়েই একটি স্বশাসিত গণতান্ত্রিক জার্মান রাষ্ট্রের পত্তন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বেশ কিছু আলোচনার পর 1948 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিম জার্মানির বন শহরে বিভিন্ন প্রদেশগুলির প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে একটি সংসদীয় পরিষদ (parliamentary Council) গঠন করে এবং কোনরাড অ্যাডেন্যুর (Konarad Adeneur) এই পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। নিজেদের মধ্যে এবং মিত্রশক্তির সামরিক গভর্নরদের সঙ্গে অনেক আলোচনা চালিয়ে সংসদীয় পরিষদ 1949 সালের মে মাসে একটি সংবিধান গ্রহণ করে যার নাম 'Basic Law for the Federal Republic of Germany' এবং একটি প্রদেশগুলি আইনসভা ও সামরিক গভর্নরদের অনুমোদন পেলে 23 মে 1949 তারিখে বলবৎ হয়। পশ্চিম জার্মানির সংসদীয় নির্বাচন হয় 14 আগস্ট 1949 এবং সেপ্টেম্বর মাসে ফেডেরাল প্রেসিডেন্ট ও ফেডারেল চান্সেলর নির্বাচিত হন। এইভাবে যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় পশ্চিম জার্মানিতে। জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র (Federal Republic of Germany) নামে নতুন জার্মান রাষ্ট্র পরিচিত হয়। তিনি মিত্রশক্তির সঙ্গে আরো বিশদ আলোচনা করে জার্মানিতে মিত্রশক্তিত্রয়ের অধিকারের (Occupation) অবসান ঘটে 1955 সালের মে মাসে। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন 1949 সালের অক্টোবর মাসে তাদের নিজস্ব ঢঙে পূর্ব জার্মানিকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (German Democratic Republic) নামে একটি নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে এবং 1955 সালে তাকে ওয়ারশ চুক্তির (Warsaw Pact) কারণে সোভিয়েত

ইউনিয়নের প্রভাববাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কাজ করতে দেয়। পশ্চিম জার্মানির পার্লামেন্ট সঙ্গে-সঙ্গেই প্রস্তাব গ্রহণ করে ঘোষণা করে যে, জার্মানি জাতি কোনোদিনই জার্মানির এই বিভাগ এবং দুইটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম জার্মানি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব মেনে নেবে না। স্বাধীন জনমতের ও নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত FRG প্রকৃত জার্মন রাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সামরিক শক্তির মদতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন GDR কখনই জার্মন জাতির প্রতিনিধি রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

যুদ্ধশেষে বার্লিন শহর পশ্চিমী সামরিক বাহিনী ও সোভিয়েত সামরিক বাহিনী উভয়ের অধিকারে আসে এবং পরে বার্লিন শহর "পশ্চিম বার্লিন" ও "পূর্ব বার্লিন" নামে দ্বিধাবিভক্ত হয়। পশ্চিম বার্লিন FRG-র অন্তর্ভুক্ত একটি 'প্রদেশ' (Land) বলে গণ্য হয় এবং পূর্ব বার্লিন সোভিয়েত অধিকারে থাকে। পশ্চিম জার্মানির জন্য যে Basic Law বা সংবিধান গৃহীত হয় তাতে স্পষ্ট করে বলা হয় যে যুদ্ধোত্তর জার্মানির রাজনৈতিক জীবনে একটি "transitional period"-এর জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য। পশ্চিমী তিন রাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে মতৈক্য না হওয়ার দরুন কোনো শান্তি চুক্তি হয়নি এবং জার্মানিকে দ্বিধাবিভক্ত হয়েই তার যুদ্ধোত্তর যাত্রা শুরু করতে হয়। পশ্চিম জার্মানিকে জার্মান "রাইখের" (Reich) আইনত উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। অবিভক্ত জার্মানির মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ পশ্চিম জার্মানি বা FRG-র অধিবাসী।

FRF প্রতিষ্ঠা হওয়ার চার দশক পরে দেখা যায় যে, পশ্চিম জার্মানি অভাবনীয় দ্রুতগতিতে অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করেছে। দেখা যায় 1970-এর মধ্যে পশ্চিম জার্মানির মানুষের আর্থনীতিক উন্নতি এত বেশি হয়েছে যা জার্মান-ইতিহাসে আগে কখনই দেখা যায়নি। এই ব্যাপারটি পশ্চিম জার্মানির "আর্থনীতিক বিস্ময়" ("Economic Miracle") বলে পরিচিত। পূর্ব জার্মানিও শিল্প জাতীয়করণ করে কৃষিতে সামগ্রিকীকরণ (collectivisation) ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং কেন্দ্রায়িত যোজনার পন্থা গ্রহণ করে বেশ কিছু আর্থনীতিক উন্নয়ন লাভ করে। কিন্তু পশ্চিম জার্মানির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পূর্ব জার্মানির তুলনায় অনেক বেশি। পশ্চিম জার্মানির চান্সেলর অ্যাডেন্যুর প্রথম থেকেই FRG-কে পশ্চিমী জোটের শরিক রাষ্ট্রের অবস্থানে নিয়ে যান এবং ধীরে ধীরে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করেন। পশ্চিম জার্মানি ইউরোপীয় আর্থিক জোট (European Economic Community) এবং উত্তর আতলান্তিক সামরিক জোটের (North Atlantic Treaty Organisation) শরিক হয়। অন্যদিকে পূর্ব জার্মানি আর্থনীতিক দিক থেকে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রিত কাউন্সিল ফর মিউচুয়াল ইকনমিক অ্যাসিস্টান্সের (COMECON)-এর সদস্য হয় এবং সামরিক দিক থেকে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন ওয়ারশ চুক্তির (Warsaw Pact) শরিক হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব জার্মানিকে সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেয় এবং সেই সঙ্গে সোভিয়েত প্রভাবিত দেশগুলিও একই স্বীকৃতি দেয়। যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথামতো 1961 সালে "বার্লিন প্রাচীর" তৈরি হয়, তখনই দুই জার্মানির পৃথক অস্তিত্ব চূড়ান্ত রূপ নেয়।

১৩.৮ দুই জার্মান রাষ্ট্রের পুনর্মিলন

FRG-র চান্সেলর ভিলি ব্রান্ট 1969 সালে তাঁর পূর্ব জার্মান নীতি (Ostopolitik) গ্রহণ করার পর থেকে দুই জার্মানির সম্পর্কে পরিবর্তন আসতে আরম্ভ করে। ব্রান্ট GDR-সহ পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতার নীতি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সমস্যা সমাধানের জন্য FRG সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ডের সঙ্গে চুক্তি করে। এর ফলে দুই জার্মানির মধ্যে আর্থনীতিক আদানপ্রদান শুরু হয় এবং পূর্ব জার্মানির সাধারণ মানুষ পশ্চিম জার্মানির আর্থনীতিক অগ্রগতির খবরাখবর জানতে পারে। এই প্রক্রিয়াই শেষ পর্যন্ত GDR-এর জনগণকে 1989 সালে "বার্লিন প্রাচীর" ভেঙ্গে ফেলার উৎসাহ জোগায় এবং দুই জার্মান রাষ্ট্রের একীকরণ সম্ভব করে তোলে। আশির দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক সঙ্কট দেখা দিলে সোভিয়েত নেতা গোরবাচভ GDR-এর আর্থিক দায়দায়িত্ব থেকে মুক্তি চান। রাজনৈতিক ও আর্থিক উভয় কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়ন শেষ পর্যন্ত দুই জার্মানির একীকরণের ব্যাপারে সম্মতি জানায়। ইতিমধ্যে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভের জন্য গণ-আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। পূর্ব জার্মানির সরকার 1990 সালে মার্চ মাসে প্রকৃত স্বাধীন নির্বাচনের মাধ্যমে জনমত যাচাই করে এবং দেখা যায় যে, GDR-এর অধিকাংশ মানুষ দুই জার্মানির একীকরণের পক্ষেই মত দেন। GDR-এর আইনানুগ পদ্ধতি মেনেই 1990 সালের অক্টোবর মাসে দুই জার্মান রাষ্ট্র পুনর্মিলিত হয় এবং পশ্চিম জার্মানির Basic Law বা সংবিধান অনুসারে পূর্বতন GDR রাষ্ট্র FRG রাষ্ট্রের সঙ্গে সুংযুক্ত হয়ে যায়। মোটামুটি FRF-র শর্তেই এই সংযুক্তি ঘটে এবং পশ্চিম জার্মনি পূর্ব জার্মানির আর্থনীতিক পুনর্বাসন ও উন্নয়নের বেশ কিছু দায়িত্ব গ্রহণ করবে। FRG-র চান্সেলর হেলমুট কোল জার্মান একীকরণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব দেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংবিধানিক ও আইনগতভাবে পূর্ব জার্মানি ও পশ্চিম জার্মানির পুনর্মিলন বা একীকরণ ঘটে।

১৩.৯ জার্মান রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি

জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থা যে সংবিধানকে (1949) ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তার মূলনীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গণতান্ত্রিকতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, সংসদীয় শাসনব্যবস্থা, স্থানীয় শাসনের সাংবিধানিক স্বীকৃতি, স্বকীয় নির্বাচন ব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা, যৌথ বা মিলিজুলি রাজনীতিক সংস্কৃতি।

(ক) গণতান্ত্রিকতা

জার্মানির দীর্ঘ ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরই দেখা গেল গণতান্ত্রিক মানসিকতার পূর্ণ বিকাশ। এর আগে দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে হুইমার প্রজাতন্ত্রের সময় গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা যে রাজনীতিক সংস্কৃতির ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার মূলনীতি হল গণতান্ত্রিকতা—যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সংখ্যাধিক্যের শাসন (Majority rule), সংখ্যালঘুর অধিকার (Minority rights)

ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Individual liberties) এবং বহুত্ববাদী রাজনীতি (Pluralistic politics)। নাৎসী রাজত্বের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে বর্জন করে যুদ্ধোত্তর জার্মানি উদারনীতিক গণতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করে। এই গণতন্ত্র স্বাধীন ও প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যখনই কোনো সঙ্কট দেখা দিয়েছে তখনই বিকৃত জাতীয়তাবাদী আবেগের মাধ্যমে বা কোনো রাজনীতিক মতাদর্শের অন্ধ অনুসরণ করে রাজনীতিক সমস্যার সমাধান খোঁজা হয় না। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আজ একটি মৌলিক নীতি। প্রতিনিধিমূলক শাসন ও সংখ্যালঘুর মর্যাদা রক্ষা করার ব্যাপারে জাতীয় মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

মাঝেমধ্যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠী গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে চ্যালেঞ্জ জানালেও সেই চেষ্টা কখনই জনসমর্থন পায়নি। হিংসার পথে রাজনীতির প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টাও বিফল হয়েছে 1970 এবং 1980-র দশকে। রাজনৈতিক চরমপন্থীদের পেছনে জনসমর্থন দেখা যায়নি। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করেই সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে জার্মান রাষ্ট্র বদ্ধপরিকর। ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে 1990 সালের একটি জনমত সমীক্ষায় দেখা যায় যে, পশ্চিম জার্মানি ও পূর্ব জার্মানি উভয়স্থানেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ও সমর্থন রয়েছে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা গত পঞ্চাশ বছরে যথেষ্ট বেড়েছে। দেশশাসনে জনগণের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা প্রসারিত হয়েছে। শাসনব্যবস্থা প্রজাতান্ত্রিক এবং জার্মান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত পদে অধিষ্ঠিত।

(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিকতার পর গুরুত্বপূর্ণ নীতি হল যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) ব্যবস্থা। ইউরোপে খুব কম দেশেই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা আছে। যেসব দেশে তা আছে তাদের মধ্যে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পশ্চিম জার্মানিতে এগারোটি প্রদেশ (Land) এবং পূর্ব জার্মানিতে পাঁচটি প্রদেশ (Land) নিয়ে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ষোলটি প্রদেশ (Land) নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Bund Government) এবং প্রাদেশিক সরকারের (Land Governments) মধ্যে সংবিধান অনুযায়ী ভাগ করা আছে। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজধানী বার্লিন শহরে।

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রদেশগুলি যথেষ্ট স্বাধীনতা ও ক্ষমতা ভোগ করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে সংসদের দ্বিতীয় কক্ষকে বলা হয়, Bundesrat অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিষদ। এই পরিষদের মাধ্যমে প্রদেশগুলি যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনে অংশগ্রহণ করে (Basic Law, Art, 50)। প্রদেশগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা (Minister President) পদাধিকারবলে এই পরিষদের সদস্য। তাছাড়া প্রদেশগুলির সরকারের একাধিক মন্ত্রী এই পরিষদের সদস্য হন। প্রদেশগুলি জনসংখ্যার বিচারে তিন থেকে ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে, কিন্তু প্রদেশের প্রতিনিধিরা Bundesrat-এর অধিবেশনে ব্যক্তিগতভাবে ভোট দেন না, তাঁর প্রদেশগতভাবে যৌথ ভোট (Block vote) দেন। জার্মান রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার কাজে Bundesrat-এর মাধ্যমে প্রদেশগুলি যথেষ্ট ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং দায়িত্ব পালন করে। প্রদেশগুলির মাধ্যমে আঞ্চলিক সংখ্যালঘুরা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম।

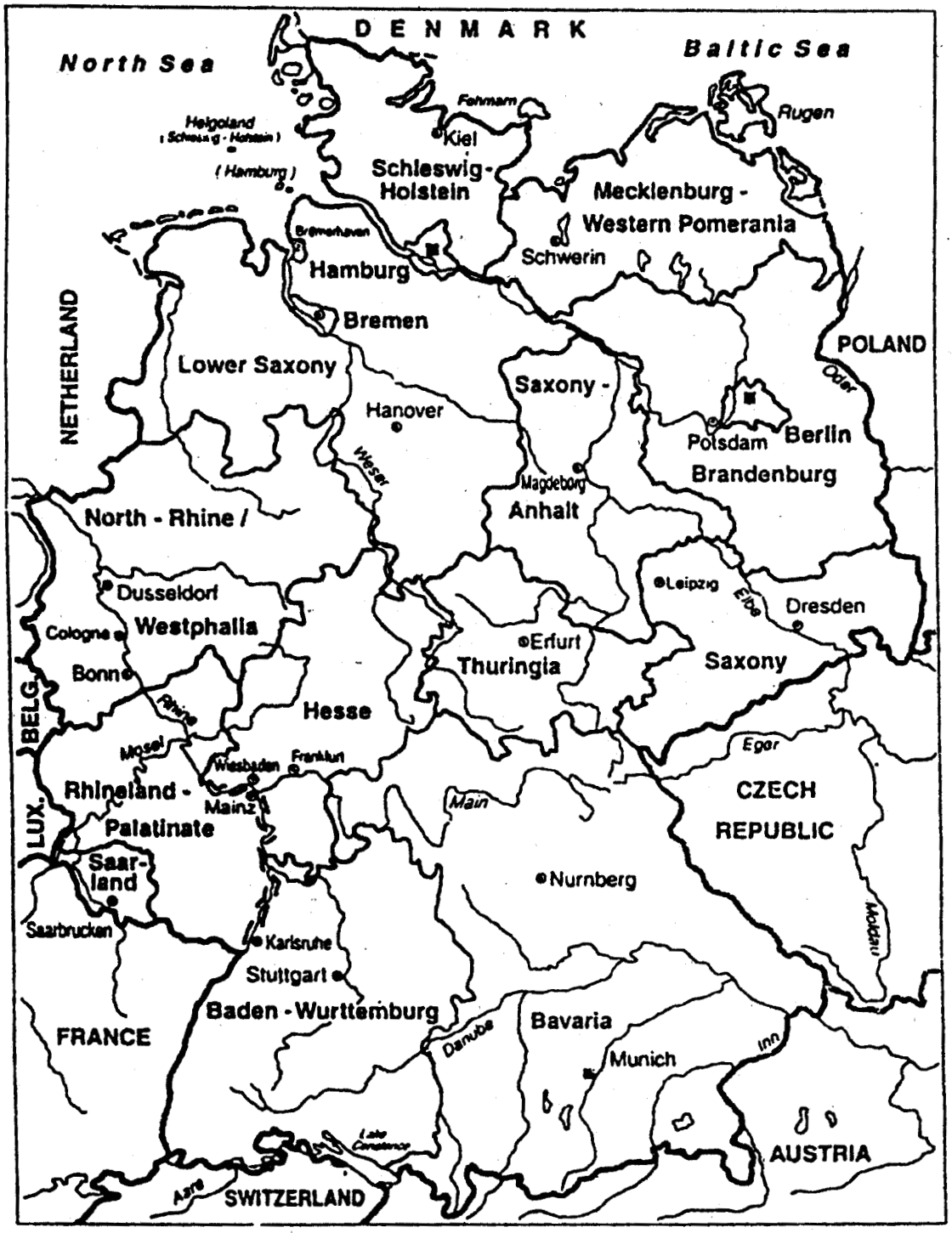

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির প্রদেশসমূহ

সংবিধান স্পষ্টভাবে প্রদেশগুলির ক্ষমতা ও প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে Bund এবং Land যুগ্ম ক্ষমতা (Concurrent powers) ব্যবহার করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে ক্ষমতাবন্টন পরিবর্তিত করে এমন কোনো সংবিধান সংশোধন সংবিধানের 20 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী গ্রাহ্য হয় না।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদে উভয়সভার মধ্যে কোনো আইনের প্রস্তাব (Bill) নিয়ে মতানৈক্য ঘটলে, উভয়সভার সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত সালিশী কমিটিতে (Arbitration Committee) মীমাংসা করা হয়। জার্মানির সংবিধানে এবং প্রাদেশিক সংবিধানে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কমিউনগুলির (পৌরসভা) নিজস্ব নির্বাচিত স্থানিক সংসদ আছে। প্রাদেশিক সরকার স্থানীয় সরকারের ওপর ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে। এই জার্মান শাসনব্যবস্থায় কোনো একটি স্তরে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ যাতে না হতে পারে তার ব্যবস্থা সুরক্ষিত করা হয়েছে।

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাম্প্রতিক সঙ্কট ও প্রয়োজনীয়ত সংস্কার ঃ

জার্মানির ইতিহাসে "দ্বিতীয় গণতন্ত্রে"র আমলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যথেষ্ট সফল হয়েছে বলা চলে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তার মধ্যে কিছু সঙ্কটও দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৮০-র দশকের শেষদিক থেকে সঙ্কটগুলি স্পষ্ট হতে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে দুই জার্মানির একীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবেই। পাঁচটি নতুন প্রদেশ পশ্চিম জার্মানির অর্ন্তভুক্ত হয়েছে এবং পশ্চিম জার্মানির শাসনতান্ত্রিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ণ জার্মানিতে প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে একীকরণ প্রক্রিয়া অগ্রগতি লাভ করছে কিন্তু এখনো তা অসম্পূর্ণ রয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া আগামী কয়েক দশক ধরে জার্মান রাজনীতিতে দেখা যাবে।

এই সঙ্কটগুলি কাটিয়ে ওঠার জন্য জার্মানি কিন্তু পুরাপুরি প্রস্তুত নয়। কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং কিছু মৌলিক পরিবর্তন বোধ হয় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। গত পাঁচ দশক ধরে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে সেই সাফল্যই এখন নতুন সংস্কারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সংস্কারের বিরুদ্ধে যে বাধা আসছে তাদের মোকাবিলা করার যথেষ্ট শক্তি জার্মান রাজনীতিতে সাম্প্রতিকালে দেখা যাচ্ছে না। এর কারণ শুধু যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বা কর্মপদ্ধতি নয়। এর পেছনে আরও কিছু কারণ রয়েছে। যেমন—জার্মানির ভোটদাতাদের মধ্যে যা আছে তাকেই রেখে দেওয়ার (status quo) পক্ষে একধরনের মানসিকতা, রাজনীতিতে প্রায় সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সহমত (consensus) খোঁজার রাজনীতিক সংস্কৃতি এবং নতুন কিছু গ্রহণ করার বিরুদ্ধে জার্মান রাজনৈতিক দলগুলির ও তাদের নেতাদের মানসিকতা।

প্রথমাবধি জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে চারটি কাঠামোগত সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, পশ্চিম জার্মানির কেন্দ্রায়িত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা দুটি পরস্পরবিরোধী রাজনীতিক নীতির ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। একদিকে শহর থেকে প্রদেশ এবং প্রদেশ থেকে জাতীয় কেন্দ্রের রাজনীতি সহমত ও আপসের পথ

ধরে গড়ে উঠেছে। অন্যদিকে, প্রদেশগুলির মধ্যে এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলি পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং বাজারের নীতি অনুসরণ করেছে।

দ্বিতীয়ত, জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে জৈবিক (organic) ঐক্য সাধন করে যে ধরনের শাসন বিভাগীয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (executive federalism) গড়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে যথেষ্ট স্বচ্ছতার অভাব দেখা গেছে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈধতার অভাবও চোখে পড়েছে। ফলে জাতীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক আইনসভা উভয়েরই প্রভাব ক্ষুণ্ণ হতে দেখা গেছে।

তৃতীয়ত, একাধিক সিদ্ধান্তকারীর হাতে 'ভিটো' ক্ষমতা দেওয়া আছে। এর ফলে আলাপ-আলোচনার (negotiations) দীর্ঘায়িত হয়েছে, কিন্তু সমস্যাকে নতুনভাবে দেখার পথে বাধার সৃষ্টি হয়েছে, এবং নিম্নতম সহমতের ভিত্তিতেই নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

চতুর্থত, যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে নীতিগ্রহণ এবং প্রাদেশিক ও স্থানিক স্তরে সেই নীতির প্রশাসনিক রূপায়ন করার দায়িত্ব দেওয়া ব্যবস্থায় একধরনের "যৌথ সিদ্ধান্তের ফাঁদ" সৃষ্ট হয়েছে যার হাত থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ায় মাঝে মাঝে অচলাবস্থা দেখা দিয়েছে।

বর্তমানে যে ষোলটি প্রদেশ (Lander) রয়েছে তাদের মধ্যে আয়তন ও সামর্থ্যের দিক থেকে যথেষ্ট অসমতা আছে। এর ফলে সিদ্ধান্তকারী, 'ভিটো' ক্ষমতার প্রয়োগ এবং যৌথ রাজনৈতিক মঞ্চ সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেছে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যে একধরনের কাঠামোগত অসমতা (asymmetries) যা পশ্চিম জার্মানিতে অনেক কম ছিল তা ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে অনেক বেড়ে গেছে। এই ধরনের অসমতা দেখা গেছে পশ্চিমের ও পূর্বের প্রদেশগুলির আর্থিক সামর্থ্যের ক্ষেত্রে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং রাজনীতিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে। বর্তমানে কোনো রাজনৈতিক দলেরই উভয় জার্মানিতে সমান প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই। প্রধান দুই দল CDU/CSU এবং SPD কারুরই নেই। রাজনৈতিক দলগুলির কাছে জার্মানির একীকরণ যে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে তা হল পূর্ব জার্মানির সঙ্গে সংহতি গড়ে তোলা এবং সমগ্র জার্মানির সম্পদ এমনভাবে বন্টন করা যার ফলে জার্মানির দুই অংশে অন্তত জীবনযাত্রার মান সমান হতে পারে। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল করণীয় কাজ এখন আর পঞ্চাশ বছর আগের মতো নেই। নতুন শাসনব্যবস্থা বলবৎ হওয়ার পর প্রথম দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে Checks and balances ঠিক ঠিক করা হচ্ছে কিনা সেদিকেই নজর দেওয়া হতো। কিন্তু গত এক দশকের প্রধান করণীয় কাজ হচ্ছে প্রতিযোগিতা (competition) এবং বৈচিত্র্য (diversity) বজায় রাখা।

ইউরোপীয় সংহতি স্থাপনের প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকার ফলে জাতীয় সরকারের সার্বভৌমিকতা অনেক ক্ষেত্রে সঙ্কুচিত হতে আরম্ভ করেছে। এর ফলে জাতীয় রাষ্ট্রের করণীয় অনেক কাজই এখন ব্রাসেলস ভিত্তিক ইউরোপীয় শাসন ব্যবস্থার এক্তিয়ারে চলে যাচ্ছে। ইউরোপীয় কমিশন, ইউরোপীয় কাউন্সিল অব মিনিস্টারস্, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, ইউরোপীয় কোর্ট অব্ জাস্টিস প্রভৃতি

প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক ধরনের কাজ করছে যার ফলে জাতীয় সরকারগুলির কিছু কিছু ক্ষমতা তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। সুতরাং জাতীয় স্তরে এবং প্রাদেশিক স্তরে আইনসভাগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সীমায়িত হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি শাসন নীতি তৈরি করা ও তার রূপায়ণে একাধিক সংস্থা কার্যকরী ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছে। এইভাবে ইউরোপীয়, জাতীয়, প্রাদেশিক ও স্থানিক চারস্তরের শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে।

এর সঙ্গে এসেছে মুক্ত বাজার নীতি ও তজ্জনিতে প্রতিযোগিতা। ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাজার ও উদারনীতির সমস্যা মোকাবিলায় মুখ্য ভূমিকা নিতে আরম্ভ করেছে। আভ্যন্তরীণ বাজার সংগঠিত করা এবং মুদ্রা ব্যস্থবার একীকরণ এই প্রক্রিয়ার সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু একই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য নীতি নির্ধারণের কাজটি জাতীয় সরকারকেই করতে হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতে পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও আর্থনীতিক উন্নয়নের দায়িত্ব থাকা উচিত প্রাদেশিক ও স্থানিক সরকারগুলির ওপর। আর বৃহৎ আর্থনীতিক নীতি (Macroeconomic policy), বিশেষত কর নির্ধারণ নীতি এবং সামাজিক নিরাপত্তার নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব থাকা উচিত জাতীয় সরকারের হাতে।

কিন্তু জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় Bundesrat-এর মাধ্যমে জাতীয় সরকারের নীতিনির্ধারণের কাজে প্রদেশগুলি (Lander) যথেষ্ট ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রভাব বিস্তার করে আসছে। এর ফলে একে অন্যের এক্তিয়ারে ঢুকে পড়ছে এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা কমে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক শাসনকে কার্যকরী ও ফলবর্তী করার কাজে এই ব্যবস্থা কিছু ধন্দের সৃষ্টি করে।

বর্তমান অবস্থায় প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বেশ কিছু বাধার সৃষ্টি করছে। একদিকে দলীয় রাজনীতি প্রতিযোগিতা, অন্যদিকে আপসের রাজনীতি এক ধরনের রাজনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি করছে। দলীয় রাজনীতির কৌশলগত কারণে Bundesrat কখনো জাতীয় সরকারের নীতি নির্ধারণের বাধার সৃষ্টি করছে, আবার কখনো আপসের মঞ্চ হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কাজ করে। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 1990-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে চান্সেলর হেলমুট কোহ্ল-এর বেশ কিছু সংস্কার নীতি SPD দলের বিরোধিতায় Bundesrat-এ গ্রহণ করা যায়নি। একইভাবে 2001-02 সালে চ্যান্সেলর শ্রোয়েভার-এর কর নীতি ও অভিবাসন নীতি সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাব CDU/CSU দলের বিরোধিতার ফলে রূপায়ণ করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং জার্মানির শাসন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এক অচলাবস্থায় সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কারের প্রয়োজন প্রায় সবাই স্বীকার করছে। কিন্তু রাজনৈতিক ইচ্ছাকে সফল সংস্কারের রূপ দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক architecture-এর পরিবর্তন আনা প্রয়োজন যার ফলে অধিক স্বাধীনতা, প্রতিযোগিতা ও Sudsidiarty-র সুফল পাওয়া যাবে। এজন্য যা প্রয়োজন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

- সুস্পষ্টভাবে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া;

● সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সরল ও স্বচ্ছ করা;

● রেফারেন্ডাম (referendum)-এর মতো নতুন কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা; এবং

● ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে সহ্য করা এবং প্রয়োজন হলে তাকে উৎসাহ দেওয়া এবং একই সঙ্গে প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক (স্থানিক) সরকারগুলির মধ্যে অবাঞ্ছিত রেষারেষি বন্ধ করার জন্য সংবিধানিক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা।

এই উদ্দেশ্যে যে ধরনের সাংবিধানিক সংস্কারের প্রয়োজন হবে সেগুলি হল ঃ

(১) আইনগত এক্তিয়ার পরিষ্কার করে চিহ্নিত করা। কার্যক্রমের মানদন্ডে প্রদেশগুলির আইন প্রণয়নের যোগ্যতা পুনর্নির্ধারণ করা।

(২) কর বসানো, কর আদায় করা এবং কর থেকে আয় ভোগ করার ব্যাপারে প্রদেশগুলিকে আরও বেশি ক্ষমতা দেওয়া।

(৩) Bundesrat-এর ক্ষমতা পরিবর্তন করা এবং প্রদেশগুলির নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা;

(৪) অনেক জার্মান বিশেষজ্ঞের মতে, জার্মানির প্রদেশগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা, এবং সেইভাবে এদের সংখ্যা কমিয়ে আনা। এর ফলে অনেক প্রদেশের (Land) হাতে বেশি সম্পদ আসবে যাতে তারা ইউরোপীয় মানদণ্ডে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, জার্মান রাজনীতির বিবর্তন ও ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হল যে, এই ধরনের সাংবিধানিক পরিবর্তন সাধন করা খুবই দুরূহ কাজ।

(ঙ) সংসদীয় শাসনব্যবস্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে হাইমার প্রজাতন্ত্র (Weimer Republic) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় জার্মানিতে প্রকৃত অর্থে সংসদীয় শাসনব্যবস্থা (Parlimentary Government) পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও খুব শীঘ্রই এই সংসদীয় ব্যবস্থা হিটলার ও তাঁর দলের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং 1930-এর শেষ দিকে ভেঙ্গে পড়ে, তবুও জার্মান সংসদীয় রীতিনীতি ও আদবকায়দা সম্বন্ধে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে নতুন শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় সেখানেও সংসদীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় জার্মানিতে দুইকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের (Bundestage এবং Bundesrat) হাতে শাসনক্ষমতা দেওয়া আছে। পার্লামেন্ট নির্বাচিত করে চান্সেলরকে। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ফেডারেল প্রেসিডেন্টের নির্বাচনেও পার্লামেন্টের আংশিক ভূমিকা আছে। চান্সেলর এবং তাঁর মন্ত্রীসভা পার্লামেন্টের কাছে সাংবিধানিক অর্থে দায়বদ্ধ থাকেন। সরকারের প্রস্তাব অনুমোদন করা এবং প্রয়োজনে পরিবর্তন করার অধিকার পার্লামেন্টের আছে।

(চ) স্বকীয় নির্বাচনব্যবস্থা

জার্মানির বর্তমান শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ Bundestag নির্বাচিত হয় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে। মোট সদস্যসংখ্যার অর্ধেক নির্বাচিত হন ভোটদাতাদের ভোটে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক নির্বাচন কেন্দ্র থেকে। বাকি অর্ধেকসংখ্যক সদস্য আসেন সমানুপাতিক ভোটদান পদ্ধতিতে List System অনুযায়ী। এই পদ্ধতিতে ভোটদাতাগণ ব্যক্তি-প্রার্থীর পরিবর্তে রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয় এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটের আগেই দলীয় প্রার্থীদের নামের তালিকা প্রকাশ করতে হয়। যে দল যে অনুপাতে ভোট পাবে সেই অনুপাতে ওই পূর্ব প্রকাশিত তালিকা থেকে সদস্য নির্বাচিত হন। গত পঞ্চাশ বছরের ওপর এই দুই ধরনের নির্বাচনব্যবস্থা সুস্থভাবেই চলছে। দ্বিতীয় কক্ষ Bundesrat যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গ-রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি।

(ছ) যৌথ মন্ত্রীসভা (Coalition Government)

যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে আজ পর্যন্ত যতগুলি মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় এসেছে সেগুলি সংযুক্ত বা মিলিজুলি (coalition) মন্ত্রীসভা। যদিও জার্মান রাজনীতিতে প্রধান দুটি দল রয়েছে, উভয়দলই তাদের সহযোগী দলগুলিকে নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠন করে। এটাই জার্মান রাজনীতির বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৩.১০ সারাংশ

মোটামুটি অষ্টাদশ শতক থেকে আধুনিক জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থার শুরু। পর্যায়ক্রমে প্রথম রাইখ (Reich), দ্বিতীয় রাইখ এবং তৃতীয় রাইখের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে নতুন পরিবেশ 1949 সালে পশ্চিম জার্মানিতে Federal Republic of Germany (FRG) নামে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। FRF-র ভূখণ্ড ছিল আমেরিকান, ব্রিটিশ ও ফরাসিদের অধিকৃত জার্মানি। যুদ্ধ শেষে জার্মানিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জার্মান রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করে এবং অবাঞ্ছিত অঞ্চলের সামরিক অধিকর্তাদের সম্মতি নিয়ে নতুন সংবিধান (Basic Law of 1949) গৃহীত হয়। আর সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিকৃত পূর্ব জার্মানিতে German Democratic Republic (GDR) নামে নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি করা হয়। FRG পুরোপুরি সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা পায় 1955 সালে।

1980-র দশকের শেষে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজের আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার দরুণ GDR-কে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দেওয়ার মতো অবস্থায় ছিল না। সুতরাং পূর্ব জার্মানির জনগণ 1989 সালে অধিক স্বাধীনতা ও উন্নত মানের জীবনযাপনের দাবিতে "বার্লিন প্রাচীর" ভেঙে ফেলে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে মিলিত হতে চাইলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কোন বাধার সৃষ্টি করেনি। সব পক্ষের সম্মতি নিয়েই 1990 সালে GDR আইনত মিশে যায় FRG-র সঙ্গে। পুনর্মিলিত জার্মানিতে 1991 সালে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জার্মান রাষ্ট্রের জন্ম হয় না যা FRG নামে পরিচিত হয়।

জার্মান রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলি গণতান্ত্রিকতা, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্র, স্বকীয় নির্বাচন পদ্ধতি এবং যৌথ সরকারের রাজনৈতিক সংস্কৃতি।

১৩.১১ প্রশ্নাবলী

1. জার্মান রাষ্ট্রের বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন। (২০৮-২১৩ পাতা দেখুন)

2. জার্মানিতে সংসদীয় গণতন্ত্র কখন প্রথম প্রচলিত হয়? (২১৯-২২০ পাতা দেখুন)

3. জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূল্যায়ন করুন। (২১৪-২১৯ পাতা দেখুন)

4. জার্মানির বর্তমান সংবিধান কবে প্রচলিত হয়? (পাতা ২১৩; ১৩.৯ পড়ুন)

5. বর্তমান জার্মানির রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলনীতিগুলি বর্ণনা করুন। (১৩.৯ পড়ুন)

১৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

1. Harold A. Turner, *Germany from partition to Unification*, 1992.

2. Russell Dalton. *Politics if Germany* (2nd edition), 1993.

3. Gordon Smith *et. at. Developments in German Politics* (3rd edition), 1996.

4. Almond, Powell, Strom, Dalton (eds.), *Comparative Politics Today* (7th edition), 2000.

5. Peter Pulzer, *German Politics*, 1995.

6. William E. Paterson and David Southern. *Governing Germany*, 1991.

7. Volker Berghahn, Modern Germany : *Society, Economy and Politics in the Twentieth Century* (2nd edition), 1987.

একক ১৪ ❑ শাসনবিভাগ ও সংসদ

গঠন

১৪.১ উদ্দেশ্য

১৪.২ প্রস্তাবনা

১৪.৩ ফেডারেল প্রেসিডেন্ট

১৪.৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ ঃ চান্সেলর

১৪.৫ জার্মান সংসদ

১৪.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের কার্যাবলি

১৪.৭ সারাংশ

১৪.৮ প্রশ্নাবলি

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে জার্মান রাষ্ট্রব্যবস্থায় শাসনবিভাগ ও সংসদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পাঠ করল আপনি জানতে পারবেন ঃ

- জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের স্বরূপ ও তার প্রধান প্রধান অংশের পরিচয়।
- জার্মান ফেডারেল প্রেসিডেন্ট ঃ তাঁর নির্বাচন ও ভূমিকা।
- জার্মান চান্সেলর ঃ নির্বাচন, ক্ষমতা ও ভূমিকা।
- জার্মান মন্ত্রীসভা ঃ গঠন ও ক্ষমতা।
- জার্মান সংসদ ঃ বুন্দেসটাগ ও বুন্দেসরাট ঃ গঠন ও ক্ষমতা।

১৪.২ প্রস্তাবনা

নাৎসীদের আমলে হিটলার ক্ষমতার এসেছিলেন সাংবিধানিক পথেই এমন একটা দাবি নাৎসীদের পক্ষ থেকে করা হতো, যদিও এমন দাবির পক্ষে যুক্তি খুব জোরালো নয়। গণতান্ত্রিক শাসনের মূল কথা স্বাধীনতা—স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ এবং স্বাধীন চিন্তা ও কাজকর্মের পরিবেশ। নাৎসীরা এসবের কিছুই রক্ষা করেনি এবং হাইমার প্রজাতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটায়। এইরকম সম্ভাবনা যাতে ভবিষ্যতে আর কখনো না আসতে পারে সে ব্যাপারে বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন যুদ্ধোত্তর জার্মানির শাসনতন্ত্র-প্রণেতারা।

জার্মান সংবিধানেব (Basic Law) মূল কথাই হল শাসনক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ যেন কোনোভাবেই না হতে পারে। সংবিধানের 20 সংখ্যক ধারায় স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছে।

হাইমার সংবিধানে "রাইখের রাষ্ট্রপতি"-র হাতে যথেষ্ট ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করা ছিল। তিনি জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। রাইখের চান্সেলরকে নিযুক্ত ও বরখাস্ত করার এবং রাইখ পার্লামেন্টকে (Reichstag) ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর হাতে ছিল, তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন; এবং জরুরি অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারতেন। বর্তমানে Basic Law (1949) এই ধরনের সকল সম্ভাবনার পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

১৪.০৩ ফেডারেল প্রেসিডেন্ট

জার্মানির রাষ্ট্রপ্রধানকে বলা হয় "ফেডারেল প্রেসিডেন্ট"। সংবিধানের 54 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী তিনি " ফেডারেল কনভেনশন" দ্বারা নির্বাচিত হন। যাতে তিনি কোনো রকম আসল ক্ষমতা দাবি করতে না পারেন সেজন্যই এই পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হওয়ার ব্যবস্থা করা হয়নি। জার্মানির যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের (Bundestag) সদস্যগণ এবং 16 টি প্রদেশের(Land) সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত সমসংখ্যক প্রতিনিধিদের নিয়ে ফেডারেল কনভেনশন গঠন করা হয় ফেডারেল প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন করার উদ্দেশ্যে। এই ভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদের ও রাজ্য প্রতিনিধিদের মধ্যে সংখ্যার ভারসাম্য রাখা হয়েছে।

হাইমার প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের তুলনায় বর্তমানের ফেডারেল প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা অনেক কম। ফেডারেল প্রেসিডেন্টের প্রধান প্রধান কর্তব্য হল বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের শুভেচ্ছা সফরের সময় তাঁদের স্বাগত জানানো, সরকারের আনুষ্ঠানিক সভায় যোগদান করা, অন্য রাষ্ট্রে শুভেচ্ছা সফরে যাওয়া, জার্মানিতে অলিম্পিক গেমস্-এর মতো অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কাজ করা। আশা করা হয় তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক দলাদলির উর্ধ্বে থেকে তাঁর সাংবিধানিক কর্তব্য করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই এমন ধারণা করা ঠিক হবে না। Basic Law ফেডারেল প্রেসিডেন্টকে কতকগুলি আইনসম্মত কর্তব্য সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছে। যেমন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের এবং সামরিক বাহিনীর অধিকারিকদের নিযুক্ত করেন, Bundestag এবং Bundestrat-এ অনুমোদিত আইনের প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন, অন্যদেশের সঙ্গে জার্মানির চুক্তিতে (Treaties) সাক্ষর করা এবং দন্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের আইনসিদ্ধ উপায়ে ক্ষমাপ্রদর্শন করা। অবশ্য এই সফল কাজেই চান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী) সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করার পরই প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর করেন।

যদি কখনো সংসদীয় নিম্নকক্ষে 'বুন্দেসটাগে'(Bundestag) সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত কোনো আইনের প্রস্তাব সমর্থিত না হয়, তাহলে ফেডারেল প্রেসিডেন্ট একজন নতুন চ্যান্সেলর মনোনীত করে সংসদকে (Bundestag) জানাতে পারেন এবং সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। অবশ্য এই দুটি কাজ তিনি Basic Law-এর নির্দেশিত ধারা মেনেই করবেন এবং কখনই তাঁর স্বেচ্ছাধীন সিদ্ধান্ত নেবেন না।

কিন্তু সরকারের পক্ষে চান্সেলরের কোনো অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করতে পারেন কিনা সে-ব্যাপারে Basic Law খুব স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। প্রেসিডেন্টের হাতে আইন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভেটো (veto) ক্ষমতা আছে কিনা, চান্সেলরের পরামর্শে মন্ত্রীসভার সম্প্রসারণে তিনি মত দিতে বাধ্য কিনা, এমনকি নির্বাচিত সংসদ (Budnestag) ভেঙ্গে দেওয়ার পরামর্শ চান্সেলরের কাছ থেকে এলে তিনি তা গ্রহণ করতে বাধ্য কিনা এসব বিষয়েও সংবিধানে (Basic Law) স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই। বোধহয় সংবিধানে ইচ্ছে করেই এই ধরনের বিষয়ে স্পষ্টভাষায় কোনো ধারা যোগ করা হয়নি, কেননা এই বিষয়ে কিছু অস্পষ্টতা থাকলে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য যে 'check and balance' নিয়ন্ত্রণ এবং ভারসাম্যতা রক্ষা করা সহজ হবে।

ফেডারেল প্রেসিডেন্টের যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্ব ও মর্যাদা আছে, যদিও তাঁর প্রত্যক্ষ ও নিজস্ব ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফেডারেল প্রেসিডেন্ট যদি একজন অভিজ্ঞ ও সক্রিয় রাজনীতিবিদ হন তাহলে তাঁর পক্ষে জার্মান জাতির রাজনৈতিক পরিবেশকে সুপারিচালিত করার কাজে সাহায্য করার সুযোগ আছে তাঁর কাজকর্মের ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে। চান্সেলরকে ব্যক্তিগত পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই। যেহেতু তিনি দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকেন সেহেতু তাঁর কথা সমগ্র জাতি শ্রদ্ধাসহকারে শুনবে, কেননা দৈনন্দিন দলীয় রাজনীতির প্রয়োজনকে অতিক্রম করে সমগ্র জাতির স্বার্থের কথা বলার মতো পদমর্যাদায় তিনি অধিষ্ঠিত। বর্তমানে ফেডারেল প্রেসিডেন্ট জোহানেম রাউ 1999 সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার আগে তিনি নর্থ রাইন-ওয়েস্টফালিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (Minister-President) ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব রাজনৈতিক মর্যাদা যথেষ্ট।

পার্লামেন্টের যে কোনো কক্ষ (Bundestag অথবা Bundesrat) যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক কোর্টের (Federal Constitutional Court) কাছে ফেডারেল প্রেসিডেন্টকে সংবিধান বা কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ইচ্ছাকৃতভাবে না মেনে চলার কারণে Impeach করতে পারে (Art. 61)। এই ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য যে-কোনো কক্ষের অন্তত এক-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজন। যদি ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট অভিযোগ খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হন যে, ফেডারেল প্রেসিডেন্ট সংবিধান বা কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করেছেন তাহলে কোর্ট আদেশবলে প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করতে পারেন।

১৪.৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ ঃ চান্সেলর

ফেডারেল চান্সেলর ও ফেডারেল মন্ত্রীদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ গঠিত। সংবিধানের 63 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী সংসদের নির্বাচিত কক্ষ Bundestag-কে ফেডারেল প্রেসিডেন্ট একজন চ্যান্সেলর নির্বাচন করার প্রস্তাব দেওয়ার পর ওই সভা চান্সেলরকে নির্বাচন করে। যিনি Bundestag-এর মোট সদস্যসংখ্যার সংখ্যাধিক্য সমর্থন পান তিনি চ্যান্সেলর হিসাবে নির্বাচিত হন এবং তাঁকে নির্বাচনের সাতদিনের মধ্যে চান্সেলর পদে নিযুক্ত করতে ফেডারেল প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকেন।

জার্মানির চ্যান্সেলর পদটি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদের সমতুল্য। লক্ষ্য করার বিষয়, জার্মান শাসনব্যবস্থায় চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন সংসদের সকল সদস্যদের সামগ্রিক ভোটাভুটিতে, কিন্তু ব্রিটেনে বা ভারতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং এই নেতানির্বাচন ব্যাপারটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। প্রধানমন্ত্রীকে সংসদের আস্থা অর্জন করতে হয় কিন্তু কে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা স্থির করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। জার্মানিতে (Bundestage) চ্যান্সেলরের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করলে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয় কিন্তু অনাস্থা প্রস্তাবের মধ্যেই বিকল্প চান্সেলরের নাম ঘোষণা করতে হয় যার ফলে Bundertag জানতে পারে, কে পরবর্তী চান্সেলর হচ্ছেন। ব্রিটেনে বা ভারতে এই ধরনের ব্যবস্থা নেই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে হাইমার প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হয় সেখানে শাসনবিভগীয় ক্ষমতা (Executive Powers) ফেডারেল প্রেসিডেন্ট এবং চ্যান্সেলরের মধ্যে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে যে সংবিধান (Basic Law) গৃহীত হয় সেখানে এই ক্ষমতাবিভাজন রদ করে চান্সেলরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। প্রথমাবধি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর জার্মানির চান্সেলর পদে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের প্রকৃত শাসক হিসেবেই চিহ্নিত হয়েছেন। রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় তাঁরা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সে-কারণে কেই কেউ বর্তমান জার্মান গণতন্ত্রকে "চান্সেলর গণতন্ত্র" বলে বর্ণনা করেছেন। সাধারণত চান্সেলর নিজের দলের নেতা এবং দলীয় নীতি নির্ধারণে যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করেন।

যেহেতু চান্সেলর বুন্দেসটাগের (Bundestag) নেতা, সেজন্য তিনি সংসদের আইন প্রণয়ন কাজে নেতৃত্ব দেন। তিনি সংসদের মধ্যে এবং বাইরে নিজের দলের নেতা এবং তিনি সংসদের সমর্থনেই শাসনবিভাগের নেতা। সুতরাং জার্মান শাসনব্যবস্থায় চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও গুরুত্ব খুবই বেশি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আজ পর্যন্ত যাঁরা চ্যান্সেলরের পদ অলঙ্কৃত করেছেন তাঁরা হলেন অ্যাডিন্যুয়ের (1949—63) এরহার্ড (1963—65), কিসিঙ্গার (1966—68), ব্রান্ডট্ (1969—74), স্মিড্ট্ (1975—82) কোহ্ল্ (1982—97) এবং শ্রোয়েডার (1908—)। এঁদের মধ্যে অ্যাডিন্যুয়ের, এরহার্ড, ব্রান্ডট্ এবং কেহ্ল তাঁদের রাজনীতিক যোগ্যতার মাধ্যমে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক জার্মানি গড়ে তুলতে বিশেষ অবদান রেখে গেছেন। বর্তমানে চ্যান্সেলর পদে আসিন আছেন একজন মহিলা Angela Markel প্রথম মহিলা চ্যান্সেলর হিসেবে দ্বিতীয়বারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

Basic Law-এর 65 সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে ঃ "The Federal Chancellor shall determine and be resposible for, the general policy guidelines." সুতরাং জার্মান শাসনবিভাগকে, জার্মান সরকারকে এবং জার্মান জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার কাজটি ফেডারেল চ্যান্সেলরকেই পালন করতে হয়। চ্যান্সেলরের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের আর একটি উৎস হল মন্ত্রীসভার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা। জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগে প্রায় কুড়িটির মতো মন্ত্রক (Ministry) আছে যেগুলির শীর্ষে থাকেন একজন মন্ত্রী। এই মন্ত্রীদের ফেডারেল প্রেসিডেন্ট

নিযুক্ত করেন চ্যান্সেলরের প্রস্তাব অনুসারে এবং তাঁদের পদচ্যুত করতে পারেন চান্সেলরের প্রস্তাব মতো (64 সংখ্যক ধারা)। মন্ত্রীদের বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে চ্যান্সেলরকে বুন্দেসটাগের সমর্থন চাইতে হয় না। মন্ত্রীদের কাজকর্মের পরিধি স্থির করে দেন চ্যান্সেলর এবং তাঁর প্রস্তাবিত নীতির মধ্যে থেকেই মন্ত্রীরা নিজ নিজ দপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তবে মন্ত্রী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে মন্ত্রীরা কাজকর্মের স্বাধীনতা ভোগ করেন এবং নিজের দায়িত্বেই সে কাজ করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে মতবিরোধ ঘটলে মন্ত্রীসভা সেই মতবিরোধ দূর করার জন্য ক্ষমতা ও প্রভাব ব্যবহার করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে থেকে একজন মন্ত্রীকে চ্যান্সেলর তাঁর সহকারী হিসেবে নিযুক্ত করতে পারেন। অন্যান্য সংসদীয় ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনায় জার্মানির চ্যান্সেলরের ক্ষমতা একটি ব্যাপারে সীমাবদ্ধ। বুন্দেসটাগ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করার ক্ষমতা চ্যান্সেলরের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নয়। এক্ষেত্রে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা যথেষ্ট বেশি।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে জার্মান চ্যান্সেলরের ক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণভাবে তাঁর নীতিনির্দেশক প্রস্তাব অন্যান্য মন্ত্রীদের মেনে নিতে হয়। এক্ষেত্রে চ্যান্সেলরের নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ ব্রিটেনের বা ভারতের মতো হওয়ায় জার্মান মন্ত্রীসভার "যৌথ দায়িত্ব" (Collective Responsibility) জার্মান শাসনব্যবস্থায় দেখা যায় না। সুতরাং জার্মানিতে মন্ত্রীসভার সদস্যগণ নিজ নিজ মন্ত্রকের নীতিগ্রহণের ব্যাপারে মন্ত্রীসভার সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল নন। মন্ত্রকের সব নীতিবিষয়ক প্রস্তাব মন্ত্রীসভার দ্বারা অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না; চান্সেলরের নির্দেশাত্মক নীতির বিরুদ্ধে না গেলে মন্ত্রীগণ স্বাধীনভাবেই কাজ করতে পারেন এবং নিজ নিজ দপ্তর পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেন। দুই জার্মানির একীকরণের পর সংগঠিত স্বার্থগোষ্ঠী অনেক বেশি ক্ষমতাশালী হয়েছে এবং Bundesrat এখন অধিকাংশ আইনের ওপর তার ক্ষমতা অর্জন করেছে। ফলে, বর্তমানে চ্যান্সেলরের ভূমিকা এখন নীতি নির্ধারণে উদ্যোগী হওয়ার থেকে Negotiator ও Conciliator বা বোঝাপড়া এবং আপস-মীমাংসা করার ভূমিকায় অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১৪.৫ জার্মান সংসদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর গণতান্ত্রিক জার্মান শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক স্তম্ভ তার সংসদ (Parliament)। জার্মান সংসদ দুইকক্ষবিশিষ্ট। সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত Bundestag এবং যুক্তরাষ্ট্রের অংশীদার রাজ্যগুলির (Land) প্রতিনিধিস্থানীয় কক্ষ Bundestrat নামে পরিচিত। Bundestag -এর মোট সদস্যসংখ্যা পূর্বেকার 656 থেকে কমিয়ে 598 করা হয়েছে। এঁরা জার্মান জনগনের প্রতিনিধি। Bundesrat-এর মোট সদস্যসংখ্যা 69 যাঁরা রাজ্যগুলির সরকারের প্রতিনিধি।

Bundestag-এর সদস্যগণ চার বৎসরের জন্য নির্বাচিত হন (Art. 39)। Basic Law-এর 38 সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে ঃ "The deputies to the German Bundestag shall be elected in general, direct, free, equal and secret elections. They shall be representatives of the whole people

not bound by orders and instructions, and shall be subject only to their conscience,'' নাৎসী রাজত্বের সঙ্গে তুলনায় সংবিধানের পার্থক্য প্রথমেই এইভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক জার্মানিতে সংসদের নির্বচন হবে প্রত্যক্ষ, স্বাধীন এবং গোপন ভোটদান পদ্ধতির মাধ্যমে। সংসদে নির্বাচিত সদস্যগণ সমগ্র জার্মান জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবেন। তাঁরা কোনো শক্তির নির্দেশ মেনে কাজ করেন না এবং একমাত্র নিজেদের বিবেক অনুসারেই তাঁদের সংসদীয় ভূমিকা পালন করবেন।

জার্মানিতে আঠারো বছর বয়স হলেই ভোটদানের অধিকার পাওয়া যায়। এখানে বুন্দেসটাগ নির্বাচনের জন্য আমেরিকার মতো কোনো " প্রাথমিক নির্বাচনের" (Primary Elections) ব্যবস্থা নেই। সব নির্বাচনে প্রার্থীদেরই তাদের রাজনৈতিক দল মনোনীত করেন এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জার্মানিতে নির্বাচনব্যবস্থায় একইসঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি (Majority Voting System) এবং আনুপাতিক ভোটদান নীতি (Proportional Respresentation system) গৃহীত হয়েছে। বুন্দেসটাগের নির্বাচনে প্রতিটি ভোটারকে দুইটি ভোটপত্র (Ballot Paper) দেওয়া হয়। একটি ভোটপত্রে প্রার্থীদের নাম লেখা থাকে—এটির নাম প্রথম ভোট (First Vote) এবং অন্যটিতে রাজনৈতিক দলগুলির নাম লেখা থাকে যার নাম দ্বিতীয় ভোট (Second Vote)। প্রথম ভোটের মাধ্যমে কোন ক্ষেত্রীয় নির্বাচন কেন্দ্র (Territorial Constituency) থেকে কে নির্বাচিত হচ্ছেন তা স্থির হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ভোট অধিক গুরুত্বপূর্ণ; কারণ যে দল যে অনুপাতে ভোট পাবে সেই দল সেই অনুপাতে তাদের পূর্বঘোষিত প্রার্থীতালিকা থেকে তাদের প্রতিনিধি বুন্দেসটাগে পাঠাতে পারবে। প্রথম ভোট ও দ্বিতীয় ভোট পৃথকভাবে গোনা হয়। সাধারন সংখ্যাগরিষ্ঠতার নীতি অনুসারে প্রথম ভোট গোনা হয় এবং যিনি সর্বাধিক ভোট পান তাঁকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। তিনি নির্বাচনী কেন্দ্রের জনগণের প্রতিনিধি যাঁর কাছে ব্যক্তিগতভাবে জনগণ প্রয়োজনে অভাব-অভিযোগ জানাতে পারেন। দ্বিতীয় ভোটের মাধ্যমে জানা যায় সারা দেশজুড়ে কোন্ দল কত অনুপাতে জনগণের সমর্থন লাভ করেছে এবং এর মাধ্যমে প্রতিটি দলই জনসমর্থনের অনুপাতে বুন্দেসটাগে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। এইভাবে সংসদে সকল রাজনৈতিক মতের প্রতিফলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার কিছুকাল পরে 1953 সালে একটি নির্বাচনী সংস্কারের মাধ্যমে ''5%'' ধারা প্রবর্তিত হয়। এ নিয়মের অর্থ হল ঃ কোনো রাজনৈতিক দল বুন্দেসটাগে প্রতিনিধি পাঠাবার যোগ্য বলে একমাত্র তখনই বিবেচিত হবে যখন দলটি মোট প্রদত্ত দ্বিতীয় ভোটের "পাঁচ শতাংশ" লাভ করতে পারবে অথবা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে অন্তত তিনটি নির্বাচন কেন্দ্রে জিততে পারবে। অসংখ্য দায়িত্বজ্ঞানরহিত রাজনৈতিক দল যাতে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যই এই নিয়ম করা হয়েছে। হাইমার সংবিধানের সংসদীয় অভিজ্ঞতা থেকেই এই সাবধানতা গ্রহণ করা হয়েছে যাতে সরকারের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে নিশ্চয়তা লাভ করা যায়।

বর্তমানে (2002) ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে মোট নির্বাচনী কেন্দ্রের সংখ্যা 299, যেখান থেকে ওই সংখ্যক (299) প্রতিনিধি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে বুন্দেসটাগের সদস্য হয়। আরও 299 জন সদস্য আনুপাতিক ভোটের নীতি অনুযায়ী দ্বিতীয় ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন যাঁরা রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত প্রার্থী।

জার্মান সংসদের দ্বিতীয় কক্ষ বুন্দেসরাটের মাধ্যমে জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার প্রতিফলন দেখা যায়। রাজ্য (Land) সরকারগুলি তাদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদের দ্বিতীয় কক্ষে তাদের প্রতিনিধি মনোনীত করে। সাধারণত রাজ্য ক্যাবিনেটের প্রধান (Minister-President) এবং তাঁর কয়েকজন ক্যাবিনেট সহকর্মী বুন্দেসরাটের সদস্য নিযুক্ত হন। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের এই দ্বিতীয় কক্ষটিকে রাজ্য মন্ত্রীদের স্থায়ী সম্মেলন (Permanent conference) বলা যেতে পারে। সব ক'টি রাজ্য (Land) থেকে মোট 67 জন নিযুক্ত হন এবং তাঁরা নিযুক্ত হন রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে। এই হিসেবে বড়ো রাজ্য সর্বাধিক ছয়টি এবং ছোটো রাজ্য ন্যূনতম তিনটি সদস্যপদ পেতে পারে। রাজ্য প্রতিনিধিরা বুন্দেসরাটের অধিবেশনে সদস্য হিসেবে আলোচনা করেন, কিন্তু ভোট দেওয়ার সময় তাঁদের রাজ্যের পক্ষে রাজ্য সরকারের নির্দেশানুসারে "ব্লক ভোট" দিতে হয়।

১৪.৬ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের কার্যাবলি

সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদকে স্পষ্টভাবে যে যে বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি সেই সেই বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভোগ করে রাজ্য আইনসভা (Landing)। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ যে-সব বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অধিকারী সেগুলি হলঃ

(১) বৈদেশিক সম্পর্ক, দেশরক্ষা, অসামরিক জনগণকে রক্ষা করা

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় নাগরিকতা

(৩) পাসপোর্ট, এমিগ্রেশন, ইমিগ্রেশন এবং বন্দিবিনিময়

(৪) মুদ্রাব্যবস্থা, ওজন ও মাপ, সময়নির্ণয়

(৫) বৈদেশিক বাণিজ্যচুক্তি

(৬) আমদানি-রপ্তানি কর

(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় রেলপথ এবং বিমানযাত্রা

(৮) ডাকব্যবস্থা ও টেলিকমিউনিকেশন

(৯) শিল্প-সম্পত্তিসংক্রান্ত অধিকার

(১০) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সহযোগিতা—ফৌজদারি, পুলিশ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে

(১১) যুক্তরাষ্ট্রীয় উদ্দেশ্যে সংখ্যাতত্ত্ব।

অন্যান্য অনেক বিষয়ে আইন প্রণয়নের যুগ্ম (Concurrent) এক্তিয়ার আছে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ ও রাজ্য সরকারগুলির আইনসভার। এই ধরনের বিষয়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আর্থিক বিষয়, শ্রম আইন, কৃষি, পরিবেশ সংরক্ষণ, যানবাহন ইত্যাদি। বুন্দেসটাগের প্রধান কাজ হল আইন প্রণয়ন। এই কক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন ফেডারেল আইন প্রণীত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের। সরকারের আইন প্রণয়নের জন্য কার্যক্রম ও প্রস্তাব বুন্দেসটাগ খতিয়ে দেখে মূল্যায়ন করে এবং প্রয়োজনবোধ তা পরিবর্তনও করতে পারে।

বুন্দেসটাগের অন্য প্রধন কাজ হল ফেডারেল চান্সেলরকে নির্বাচিত করা। এই কক্ষ চান্সেলরকে তাঁর পদ থেকে সরিয়েও দিতে পারেন তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করে। সংবিধানের 67(b) ধারায় বলা হয়েছে ঃ ''The Bundestag can express its lack of confidence in the Federal Chancellor only by electing a sucessor with the majority of its members and by requesting the Federal President to dismiss the Federal Chancellor.'' অনাস্থা প্রস্তাবের এই বৈশিষ্ট্য আর কোনো দেশের সংবিধানে দেখা যায় না। বিকল্প চ্যান্সেলরের নাম ঘোষণা করে তাবেই বুন্দেসটাগ বর্তমান চ্যান্সেলরকে পদ থেকে অপসারিত করতে পারে। এই ধারার মাধ্যমে শাসনবিভাগীয় সম্ভাব্য অচলাবস্থা যাতে না দেখা দিতে পারে তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে জার্মান শাসনব্যবস্থায়।

বুন্দেসটাগের অধিবেশনে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয় তা জার্মানির নাগরিকদের কাছে দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য সংখ্যার অনুপাতে প্রতিটি রাজনৈতিক দলকেই সুযোগ দেওয়া হয়। যখন কোন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তখনই এই সভার বিতর্ক টেলিভিশনে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ফেডারেল সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিচার করা বুন্দেসটাগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সরকারের কাজকর্মের ওপর নজর রাখার সবচেয়ে ভালো পন্থা হল সভায় প্রশ্নোত্তরের সুযোগ। সভার যে-কোনো সদস্য লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে মন্ত্রীদের কাছ থেকে উত্তর চাইতে পারেন এবং যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই মন্ত্রীরা সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন। কোনো বড়ো নীতির প্রশ্ন থেকে বিশেষ কোনো সমস্যা, সব-কিছু বিষয়েই প্রশ্ন করা চলে। রীতিমাফিক প্রশ্ন ছাড়াও বিতর্কের মধ্যে থেকেও প্রশ্ন করা যায়।

বুন্দেসটাগের কমিটিব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। এই সব কমিটিতে সরকারের নীতি নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা হয় এবং তাছাড়া প্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রয়োজন হলে কমিটি নিজস্ব তদন্ত চালাতে পারে। সংসদে বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ এইসব সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সরকারের কাজের ওপর নজরদারি রাখে। সরকার পক্ষের সদস্যরাও প্রশ্নোত্তরের সুযোগ নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বুন্দেসরাট যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে আইন প্রণয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যদিও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বুন্দেসটাগের প্রাধান্য রয়েছে তবুও বুন্দেসরাটের ভূমিকা অগৌণ নয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগ সকল আইনের প্রস্তাব বুন্দেটাগে পাঠানোর আগে বুন্দেসরাটের সামনে উপস্থিত করেন যাতে কি আইন হতে যাচ্ছে সে সম্বন্ধে রাজ্যগুলি

জানতে পারে। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন করতে গেলে বুন্দেসরাটের অনুমোদন আবশ্যিক। একইভাবে যেসব ফেডা রেল আইন বলবৎ করার দায়িত্ব রাজ্যগুলির হাতে ন্যস্ত সেইসব বিষয়ে আইনের ক্ষেত্রেও বুন্দেসরাটের অনুমোদন আবশ্যিক। মোটামুটিভাবে দেখা যাচ্ছে বুন্দেসটাগ যতগুলি আইন অনুমোদন করে তার দুই-তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে বুন্দেসরাটের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। এই ধরনের অবস্থা বিশেষভাবে সৃষ্টি হয় যখন বুন্দেসরাটের নিয়ন্ত্রণ যে দলগুলির হাতে থাকে তাদের প্রতিপক্ষ বুন্দেসটাগ নিয়ন্ত্রণ করে।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বুন্দেসটাগে গৃহীত কোন আইনের প্রস্তাব বিবেচনা করার সময় বুন্দেসটাগ প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য উভয়সভার সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠনের দাবি জানাতে পারে। এ যুগ্ম কমিটিতে বিল নিয়ে আলোচনার সময় বুন্দেসরাটের সদগ্যগণ তাঁদের রাজ্যের নির্দেশের দ্বারা চালিত হতে বাধ্য থাকেন না। যদি এই যুগ্ম কমিটি বিলের কোন সংশোধনের কথা বলে তাহলে বুন্দেসটাগ বিলটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করলে দ্বিতীয়বার বিলটির ওপর ভোট নেওয়া হবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ব্রিটেনের কমন্স সভা বা ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লির তুলনায় জার্মান সংসদ বেশি ক্ষমতা ভোগ করে। বিশেষ করে বুন্দেসরাট আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যে ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারে এবং যে ভূমিকা পালন করে তার ফলে জার্মান সংসদ শাসনবিভাগের প্রস্তাবিত বিলের ওপর অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে বা তা সংশোধন করতে পারে। এই ভাবে জার্মান সংবিধানে শাসনবিভাগ ও সংসদের মধ্যে এমন সম্পর্কের ব্যবস্থা আছে যার ফলে সংসদ বহুল পরিমাণে শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে বা বাধা দিতে পারে। রাজনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা করাই এই ধরনের ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য যার ফলে গণতান্ত্রিক শাসন প্রক্রিয়ায় সুস্থ ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

১৪.৭ সারাংশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানিতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। নাৎসী-নিয়ন্ত্রণাধীন "তৃতীয় রাইখের" দুঃস্পপ্ন ঝোড়ে ফেলে গণতান্ত্রিক সংবিধান বা Basic Law গৃহীত ও প্রবর্তিত হয়েছে 1949 সালে।

জার্মান রাষ্ট্রের প্রধান হলেন ফেডারেল প্রেসিডেন্ট। তিনি একটি কনভেনশনের দ্বারা নির্বাচিত হন। শাসনব্যবস্থায় তাঁর স্থান খুবই মর্যাদাপূর্ণ, কিন্তু তাঁর হাতে প্রকৃত শাসনক্ষমতা খুবই কম।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের ক্ষমতাশালী কর্তা হলেন ফেডারেল চান্সেলর। তিনি সংসদের নিম্নকক্ষ বুন্দেসটাগের দ্বারা নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগকে পরিচালিত করার পূর্ণ দায়িত্ব চ্যান্সেলরের হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি তাঁর মন্ত্রীসভা গঠন করেন, কিন্তু মন্ত্রীরা মোটামুটি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ মন্ত্রক পরিচালনার সুযোগ পান। বরাবরই জার্মান মন্ত্রীসভা একাধিক দলের জোট মন্ত্রীসভা হিসেবে কাজ করেছে।

জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদের নিম্নকক্ষের নাম বুন্দেসটাগ (Bundestag)। এর সদস্যগণের অর্ধেক জনগণের ভোটে নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং অর্ধেক সদস্য রাজনৈতিক দলগুলির মনোনীত। দলগুলিকে

জনগণ ভোট দান এবং জনসমর্থনের অনুপাতে দলগুলি এই মনোনয়ন করে পূর্বঘোষিত দলীয় প্রার্থীদের মধ্য থেকে। সংসদের দ্বিতীয় কক্ষে বুন্দেরাট (Bundesrat) রাজ্য সরকারগুলি (Land Governments) প্রতিনিধিত্ব করে। রাজ্য শাসনবিভাগ রাজ্য মন্ত্রীসভার সদস্যদের বুন্দেসরাটের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করে। বিভিন্ন রাজ্য জনসংখ্যার অনুপাতে তিন থেকে ছয়জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। আইন প্রণয়ন করা ও শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করাই জার্মান সংসদের মূল কাজ।

১৪.৮ প্রশ্নাবলি

(১) জার্মানির ফেডারেল প্রেসিডেন্ট কিভাবে নির্বাচিত হন? (১৪.৩ এর প্রথম অনুচ্ছেদ)

(২) ফেডারেল প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা করুন। (১৪.৩ পড়ুন)

(৩) ফেডারেল চ্যান্সেলর কিভাবে নির্বাচিত হন? (১৪.৪ এর প্রথম অনুচ্ছেদ)

(৪) ফেডারেল চ্যান্সেলরের ক্ষমতা ও ভূমিকা আলোচনা করুন। (১৪.৪ পড়ুন)

(৫) চ্যান্সেলরের সঙ্গে মন্ত্রীসভার সম্পর্ক আলোচনা করুন। (১৪.৪ পড়ুন)

(৬) জার্মান বুন্দেসটাগের নির্বাচনপদ্ধতি সম্পর্কে টীকা লিখুন। (১৪.৫ এর প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)

(৭) জার্মান বুন্দেসরাট কাদের নিয়ে গঠিত? (১৪.৫ পড়ুন)

(৮) বুন্দেসটাগের ও বুন্দেসরাটের ক্ষমতাবলি আলোচনা করুন। (১৪.৬ পড়ুন)

১৪.৯ গ্রন্থপঞ্জী

1. Almond, Powel, Strom, Dalton (eds) Comparative Politics Today, 7th edition (2000).

2. The Basic Law for the Federal Republic of Germany (1949)

3. Peter Pulzer German Politics: 1945-1995 (1995)

একক ১৫ জার্মান বিচারব্যবস্থা ও সাংবিধানিক ন্যায়ালয়

গঠন

১৫.১ উদ্দেশ্য

১৫.২ প্রস্তাবনা

১৫.৩ জার্মান বিচারব্যবস্থা

১৫.৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ন্যায়ালয়

১৫.৫ গ্রন্থপঞ্জী

১৫.৬ প্রশ্নাবলি

১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে জার্মান বিচারব্যবস্থা ও সাংবিধানিক ন্যায়ালয় (Constitutional Court) সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এই এককটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন ঃ

- জার্মান বিচারব্যবস্থার গঠন।
- জার্মান বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।
- সাংবিধানিক ন্যায়ালয় গঠন।
- সাংবিধানিক ন্যায়ালয়ের কার্যাবলি ও গুরুত্ব।

১৫.২ প্রস্তাবনা

1945 সালের মে মাসে জার্মানিতে মিত্রশক্তির কাছে হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসী সরকারের পরাজয় হলে যে সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় তা হল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা। অধিকাংশ বিচারলয়ের বাড়িগুলি বোমাবর্ষণের ফলে ভেঙে যায় এবং আগুন ধরে যায়, ফলে প্রায় সব নথিপত্র ধ্বংস হয়ে যায়। সর্বোপরি নাৎসীদের আইন সম্বন্ধে অদ্ভুত ও উৎকট ধারণাগুলির হাত থেকে জার্মানিকে ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক শাসনের পথে নিয়ে আসা অন্যতম চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। হিটলারের প্রশাসনে তথাকথিত "আইনের" মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটানো হয়েছিল। সুতরাং যুদ্ধোত্তর জার্মানি যখন "গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা" (Democratic order) প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তখন তার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক অর্থে যথেষ্টভাবে রক্ষা করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। মিত্রশক্তির অধিকারে থাকা পশ্চিম জার্মানিতে দেওয়ানি আইন (Civil Law) এবং শাস্তিবিধানের

আইন (Penal Law) সম্বন্ধে একটি সাধারণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজ আরম্ভ হয়। নাৎসীদের ক্ষমতায় আসার আগে হাইমার প্রজাতন্ত্রের সময়কার আইনী অবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়, কেননা প্রথমে আইনী রাজত্বের (Regime of Law) একটা মোটামুটি কাঠামো প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু যুদ্ধোত্তর জার্মানির জন্য গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করতে বসে বোঝা যায় নতুন বিচারপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন আছে যাতে জার্মানিতে একটি সুস্থ ও সন্তোষজনক বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। আইনের শাসন (Rule of Law) ব্যতীত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কল্পনা করা যায় না। আর সেভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণাধীন পূর্ব জার্মানিতে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের আইনব্যবস্থা ও বিচারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় যার পশ্চিম জার্মানির উদারনীতিভিত্তিক বিচারব্যবস্থার কোনো মিল ছিল না।

১৫.৩ জার্মান বিচারব্যবস্থা

ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট, অন্যান্য ফেডারেল কোর্ট রাজ্য স্তরে ল্যান্ডে কোর্টগুলিকে নিয়ে জার্মান বিচারব্যবস্থার কাঠামো গঠিত হয়েছে। 1949 সালে Basic Law- এর অধীন জার্মান নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া হয় এবং সেই অধিকারগুলি যাতে কোনো রাষ্ট্রিয় কর্তৃপক্ষ অপহরণ করতে না পারে সেজন্য দুটি প্রধান ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, সংবিধানকে প্রয়োজনীয় আইনি রক্ষা দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ন্যায়ালয় (Federal Constitutional Court) প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং দ্বিতীয়ত, একটি সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যায়ালয় (Federal Court of Justice) তৈরি করা হয় যাতে সারা দেশে একই ধরনের বিচার-প্রশাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

জার্মানিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক বিচারব্যবস্থায় রোমান আইনের নীতি ও ঐতিহ্য অনুসরণ করা হয়েছে যা মূলত অ্যাংলো-আমেরিকান বিচারব্যবস্থার নীতি থেকে পৃথক। অ্যাংলো-আমেরিকান বিচারব্যবস্থার মূল নীতি হল সমাজের সাবেকি আইনের (Common Law) ঐতিহ্য অনুসরণ করা এবং কোনো ন্যায়ালয়ের পূর্ববর্তী আদেশের (Precedents) ওপর ভিত্তি করে বিশেষ ক্ষেত্রে বিচার সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেচনা-প্রসূত সুস্পষ্ট নীতি অনুসারী লিখিত (Code) বিচারপ্রক্রিয়ার মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করা। এই রীতি অনুসরণ করে জার্মানিতে যে বিচারব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে সেখানে ভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যায়ালয়(Federal Court) গড়ে তোলা হয়েছে এবং এই ফেডারেল কোর্টগুলি তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তর পর্যন্ত বিচারব্যবস্থা পরিচালনা করে।

প্রথমত রয়েছে সাধারণ দেওয়ানি (Civil) ও ফৌজদারি (Criminal) বিচারের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যায়ালয় (Federal Court of Justice)। এই ন্যায়ালয় কার্লসরুহে শহরে অবস্থিত। জার্মানিতে কোনো সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় (Supreme Court) প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। কারণ বিভিন্ন ক্ষেত্রের ফেডারেল কোর্টগুলির মতামতের মধ্যে দারুণ কোনো মতভেদ দেখা দেয়নি।

ফেডারেল কোর্ট অব্ জাস্টিসের অধীনে রাজ্য (Land) স্তরে জেলা স্তরে এবং স্থানীয় স্তরে দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত কাজ করে। সাধারণ বিচার প্রশাসনের এইটি হল মূল প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ন্যায়ালয়। বার্লিন শহরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ন্যায়ালয় (Federal Administrative Court), রাজ্য স্তরের উচ্চ প্রশাসনিক ন্যায়ালয় (Higher Administrative Court) এবং

স্থানীয় স্তরে প্রশাসনিক ন্যায়ালয় (Adminsitrative Court)। কর (Tax) ও অন্যান্য আর্থিক সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য মির্ভানিক শহরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে Federal Fiscal Court এবং স্থানীয় স্তরে Fiscal Court রয়েছে। সামাজিক সমস্যাদি সংক্রান্ত বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য কাসেল শহরে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রীয় সামাজিক ন্যায়ালয় (Federal Social Court) রাজ্য স্তরে উচ্চতর সামাজিক ন্যায়ালয় (Higher Social Court) এবং স্থানীয় স্তরে সামাজিক ন্যায়ালয় (Social Court) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রম বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রয়েছে পৃথক স্তরে আদালত। কাসেল শহরে অবস্থিত সর্বোচ্চ স্তরে যুক্তরাষ্ট্রীয় শ্রম ন্যায়ালয় (Federal Labour Court); রাজ্য স্তরে উচ্চতর শ্রম ন্যায়ালয় (Higher Labour Court) এবং স্থানীয় স্তরে শ্রম ন্যায়ালয় (Labour Court) রয়েছে।

সংবিধানের 95(1) সংখ্যক ধারা অনুযায়ী এই সকল যুক্তরাষ্ট্রীয় ন্যায়ালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিচার কাঠামোর প্রতি ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের নিয়োগ করার জন্য সংবিধানের 95(2) সংখ্যক ধারায় বলা আছে যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেডারেল আইনমন্ত্রী এবং রাজ্যমন্ত্রী ও সমসংখ্যক Bundestag-এর নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি যৌথভাবে এই বিচারপতিদের নিয়োগ করেন।

শিল্পক্ষেত্রে সম্পত্তি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় শিল্প ন্যায়ালয় (Federal Insustrial Court) এবং সামরিক বাহিনীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সামরিক ফৌজদারী ন্যায়ালয় (Federal Military Criminal Court) গঠনের ব্যবস্থাও সংবিধান আছে।

জার্মানিতে সব স্তরের বিচারপতিদের স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার ক্ষমতা সংবিধানের 97 সংখ্যক ধারায় স্বীকৃত হয়েছে। আইনস্বীকৃত কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে বিচারপতিদের পদচ্যুত করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরের বিচারকদের আইনি মর্যাদা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা প্রয়োজনীয় আইনপ্রণয়ন করে। একই উদ্দেশ্যে রাজ্য(Land) স্তরের বিচারকদের জন্য বিশেষ আইন রাজ্য আইনসভা প্রণয়ন করে। Bundestag 1961 সালে Judges Act প্রণয়ন করে বিধায়কদের আইন মর্যাদা নির্ধারণ ও সুরক্ষিত করেছে। এই আইন বলে কোনো স্তরের কোনো বিচারক কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর সংশ্রব রাখতে পারেন না। সংবিধানের 102 সংখ্যক ধারায় জার্মানিতে মৃত্যুদন্ডের (Capital Punishment) অবসান হয়েছে।

১৫.৪ যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ন্যায়ালয় (Federal Constitutional Court)

জার্মান বিচারব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ভাস্বর একটি ন্যায়ালয় যার নাম যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ন্যায়ালয় (Federal Constitutional Court)। সংবিধানে 94 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী এই ন্যায়ালয়ের বিচারকগণ সংখ্যায় 16 জন। এঁদের মধ্যে অর্ধেকসংখ্যক বিচারককে Bundestag এবং অপর অর্ধেকসংখ্যক বিচারককে Bundestrat নির্বাচিত করে। নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতার জন্য এঁরা সংসদের কোনো কক্ষের সদস্য বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবিভাগের কোনো সদস্য বা কোনো রাজ্যের আইনসভা বা শাসনবিভাগের সদস্য হতে পারেন না।

সংবিধানের 93 সংখ্যক ধারায় এই ন্যায়ালয়ের এক্তিয়ার ও ক্ষমতা বর্ণনা করা হয়েছে। ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট যে-সব ক্ষমতার অধিকারী তার উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(১) সংবিধানের Basic Law ব্যাখ্যা করা। যদি কখনো সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রীয় কোনো বিভাগের বা সংবিধানের অধীনস্থ কোনো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনো বিবাদ হয় তাহলে সংবিধানের ব্যাখ্যা করা।

(২) যদি কখনো যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন ও রাজ্য আইনের মধ্যে সংঘর্ষ বা অসঙ্গতি দেখা দেয়, অথবা সংবিধানের সঙ্গে এই ধরনের কোনো আইনের অসঙ্গতি দেখা দেয় বা সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে ফেডারেল সরকারের বা রাজ্য সরকারের বা Bundestag-এর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুরোধে ন্যায়ালয়ের নিজস্ব সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

(৩) যদি কখনো যুক্তরাষ্ট্রের এবং রাজ্যগুলির অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোনো মতবিরোধ দেখা দেয়, বিশেষ করে রাজ্য কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের বলবৎ করার ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দেওয়া।

(৪) যদি কোনো রাষ্ট্রীয় আইন (Public Law) নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়, অথবা যুক্তরাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় অথবা একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয় অথবা কোনো রাজ্যের মধ্যে সাংবিধানিক মতভেদ দেখা দেয়, তাহলে তার নিষ্পত্তি করা।

(৫) যদি কোনো নাগরিক অভিযোগ করে যে, সংবিধানে প্রদত্ত তাঁর মৌলিক অধিকার কোনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ অসাংবিধানিকভাবে লঙ্ঘন করেছে তাহলে সেই অভিযোগের নিষ্পত্তি করা।

(৬) যদি কোনো কমিউন বা কমিউনদের সংস্থা অভিযোগ করে যে কোনো আইন সংবিধানের 24 সংখ্যক ধারায় প্রদত্ত তাদের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লঙ্ঘিত করেছে, তাহলে সংবিধানের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা দিয়ে সেই অভিযোগের নিষ্পত্তি করা।

(৭) সংবিধানের (Basic Law) প্রদত্ত অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যাখ্যা দেওয়া। এছাড়া, ফেডারেল আইনের মাধ্যমে যখন যে বিষয়ে এই ন্যায়ালয়কে উদ্যোগী হতে ক্ষমতা দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়া এই সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের কর্তব্য।

গত অর্ধশতাব্দীকালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট বিভিন্ন বিষয়ে তার রায়ের মাধ্যমে জার্মান রাজনীতি ও জার্মান রাষ্ট্রের বিকাশের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জার্মানিতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে সাহায্য করছে না—এই যুক্তি দেখিয়ে কনস্টিটিউশনাল কোর্ট 1952 সালে নাৎসী আদর্শ প্রভাবিত সোশ্যালিস্ট রাইখ পার্টিকে এবং 1956 সালে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিকে বে-আইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে গণতান্ত্রিক জার্মানিতে এই দুই দলের কোনোভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা বা প্রকাশ্যে কাজ করা বন্ধ হয়। মহিলাদের গর্ভপাত করার অধিকার প্রসঙ্গে জার্মানিতে জনগণের মধ্যে যে বিতর্ক দেখা দেয় সেই প্রসঙ্গে 1974 সালে কোর্ট গর্ভপাত সংস্কার আইনকে সংবিধানবিরোধী বলে ঘোষণা করায় তা বাতিল হয়ে যায়। দুই জার্মানির ঐক্যসাধনের জন্য কোন সাংবিধানিক পন্থা গ্রহণ করা যুক্তিসম্মত সে-বিষয়েও এই কোর্ট পথনির্দেশ করে যে, সংবিধানের

23 সংখ্যক ধারা অনুযায়ী পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে যোগ দেয়। আর 1993 সালে এই কোর্ট ঐতিহাসিক রায় দেয় যে, বসনিয়ার ওপর যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে জার্মান বিমানবাহিনীকে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং 1994 সালে রায় দেয় যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্মতি থাকলে জার্মান সেনাবাহিনী যে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারে যদি Bundestag-এর প্রয়োজনীয় সমর্থন পাওয়া যায়।

১৫.৫ ❑ গ্রন্থপঞ্জী

1. *The Democratic State* (Germany Report IV), Government of Germany (1964)
2. The Basic Law for the Federal Republic of Germany.
3. Peter Pulzer, *German Politicies* (1995)
4. G. Almond and others, *Comparative Politics Today* (7th Edition), (2000).

১৫.৬ ❑ প্রশ্নাবলি

(১) জার্মান বিচার ব্যবস্থার গঠন ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন। (১৫.৩ পড়ুন)

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সাংবিধানিক ন্যায়ালয় গঠন, এক্তিয়ার ও ক্ষমতা আলোচনা করুন। (১৫.৪ পড়ুন)

একক ১৬ ❑ রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থগোষ্ঠী

গঠন :

১৬.১ উদ্দেশ্য

১৬.২ প্রস্তাবনা

১৬.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১৬.৪ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন এবং ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন

১৬.৫ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল

১৬.৬ গ্রিন পার্টি

১৬.৭ জার্মানি দলব্যবস্থার চরিত্র

১৬.৮ সারাংশ

১৬.৯ প্রশ্নাবলি

১৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির আলোচ্য বিষয় জার্মানের রাজনীতি, রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি। এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরর্বতী জার্মান রাজনীতির পরিচয়।
- জার্মানির দলীয় ব্যবস্থার চরিত্র।
- জার্মানির রাজনৈতিক দলগুলির পরিচয়।
- জার্মান রাজনীতিতে চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থগোষ্ঠীগুলির ভূমিকা।

১৬.২ প্রস্তাবনা

বর্তমান সংবিধানে (Basic Law) স্পষ্টভাবেই রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব ও ভূমিকা স্বীকার করা হয়েছে যা ভারতের সংবিধানে নেই। Basic Law-এর 21(1) সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে ঃ ''The political parties shall participate in the forming of the political will of the people''. অর্থাৎ যে জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা তৈরি হয়েছে তারা যাতে স্বাধীনভাবে তাদের রাজনীতিক ইচ্ছা সংগঠিত করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকাকে স্পষ্টভাবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে জার্মানিতে জনগণ স্বাধীনভাবে তাদের রাজনৈতিক দল গঠন করার অধিকার সংবিধান থেকেই পেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও 21 সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক দলগুলিকে তাদের আভ্যন্তরীণ সংগঠনে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করতে হবে এবং তাদের আয়ের উৎস জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করতে হবে।

সেই সঙ্গে সংবিধানের 21(2) সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে ঃ যে সকল দল তাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য এবং বাস্তব আচরণের মাধ্যমে দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষতি করবে বা জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্রকে ধ্বংস করার চেষ্টা করবে তাদের সংবিধানবিরোধী বলে মনে করা হবে এবং তাদের কোন সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হবে না। এই ধরনের রাজনৈতিক দলগুলির সাংবিধানিকতা সম্বন্ধে যথাযথ সিদ্ধান্ত ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্টের কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলির কাজকর্ম সম্বন্ধে অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় সংসদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার অধিকারী।

১৬.৩ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হিটলারের নেতৃত্বে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট পার্টি বা নাৎসী দল 1932-33 সালে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অপব্যবহার করেই ক্ষমতায় আসে এবং ক্ষমতায় এসেই একে একে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এই নাৎসী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যুদ্ধশেষে নাৎসীদের চূড়ান্ত পতন হলে মিত্রশক্তির তত্ত্বাবধানে অধিকৃত জার্মানির সার্বিক পুনর্গঠনের কাজ আরম্ভ হয়। মিত্রশক্তিগোষ্ঠী জার্মানিতে মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রথম যে কাজটি করে তা হল, নাৎসী প্রভাবমুক্ত এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী চারটি রাজনৈতিক দলকে রাজনৈতিক কাজকর্ম আরম্ভ করার জন্য অনুমতি দেওয়া। সংবিধান অনুযায়ী এই অনুমতি দেওয়া হয় একটি শর্তে যে, তারা জার্মানির সাংবিধানিক কাঠামো ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সমর্থন করবে। এই চারটি দল ছিল ঃ কমিউস্ট পার্টি অব্ জার্মানি, সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি অব্ জার্মানি, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন অব্ জার্মানি এবং লিবারেল ডেমোক্রাটিক পার্টি অব জার্মানি (যা পরবর্তীকালে ফ্রী ডেমোক্রাটিক পার্ট নামে পরিচিত হয়)। এর মধ্যে একমাত্র ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন দলটির পশ্চিম জার্মানির প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক উপস্থিতি ছিল এবং এই দলটি বাভারিয়ার ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন দলটির সঙ্গে একযোগে কাজ করত।

এই চারটি দলের মধ্যে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন-ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়নের (CDU-CSU) জোট প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে দেখা দেয়, এবং এই জোটের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখা যায় সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টিকে (SDP)। এই চারটি দলের বাইরে আরও দুটি দলকে কিছুকাল যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানির রাজনীতিতে সীমিতভাবে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। প্রথমটি জার্মান পাটি (DP) এবং দ্বিতীয়টি সর্ব-জার্মানি পার্টি যা প্রথম দিকে "বিতারিত এবং গণতান্ত্রিক অধিকারে বঞ্চিত মানুষের লীগ" (Bund der Heimatvertriebenen and Entrechteten—BHE) নামে ছিল। জার্মান পার্টির (DP) প্রধানত লোয়ার স্যাক্সনি রাজ্যে কিছুটা প্রভাব ছিল এবং 1961 সাল পর্যন্ত CDU-CSU-এর সঙ্গে জোটসঙ্গী হয়ে ফেডারেল সরকারে অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু 1963 সালের নির্বাচনে বুন্দেসটাগে এবং রাজ্য স্তরে মাত্র 2.7 শতাংশ ভোট পায় এবং ফলে সংসদীয় প্রতিনিধিত্ব

থেকে বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে BHE দলটি ছিল একটু নতুন ধরনের যা মূলত শরণার্থীদের দল হিসেবে কাজ করত, কিন্তু 1956 সালের পর থেকেই কোনো নির্বাচনে প্রয়োজনীয় পাঁচ শতাংশ ভোট না পাওয়ায় সংসদীয় রাজনীতিতে পৃথক দল হিসাবে স্বীকৃতি হারায়। আর কমিউনিস্ট পার্টি (KPD) মূলত বিশ্বব্যাপী কমিউনিজমের ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং সোভিয়েত অধিকৃত পূর্ব জার্মানির অগণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল। প্রথম দিকে কয়েকটি রাজ্যে মন্ত্রীপদ লাভ করলেও এই দলটি খোলাখুলিভাবে পশ্চিম জার্মানির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতা করতো এবং নাশকতামূলক কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত ছিল। সেই কারণে ফেডারেল কনস্টিটিউশনাল কোর্ট 17 আগস্ট 1956 তারিখে দলটিকে বে-আইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

1980-র দশকে পশ্চিম জার্মান রাজনীতিতে নতুন নতুন বিষয় (Issue) উঠে আসতে থাকে। মূলত পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে 1980-র দশকের প্রথমে একটি নতুন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। এই দলটি "গ্রিন পার্টি" (Green Party) নামে পরিচিত হয়।

অন্যদিকে সোভিয়েত-অধিকৃত পূর্ব জার্মানিতে যদিও বহুদলীয় ব্যবস্থা আছে বলে দাবি করা হত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেখানে একদলীয় ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। সেখানে সোশ্যালিস্ট ইউনিটি পার্টি (SED) নামের দলটিই রাজনৈতিক ক্ষমতা পুরোপুরি ভোগ করতো। এই দলটি প্রতি নির্বাচনে একটি প্রার্থীতালিকা দিত যার মধ্যে অন্যান্য কয়েকটি ছোটো দলেরও শ্রমিক, নারী ও যুবকদের কয়েকটি সামাজিক গোষ্ঠীর কয়েকজন প্রতিনিধির নাম রাখা হতো। প্রতি নির্বাচানের সময় এই তালিকা SED প্রস্তুত করতো। সুতরাং পূর্ব জার্মানিতে লিবারেল, ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট এবং অন্য কয়েকটি দলের নামমাত্র অস্তিত্ব থাকলেও সেগুলি মূলত SED-র উপর নির্ভরশীল সহযোগী ছোটো দল হিসেবেই কাজ করতো। যখন পূর্ব জার্মানিতে জার্মান ডেমোক্রাটিক প্রজাতন্ত্রের পতন হয় এবং দুই জার্মানি ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন SED তার পূর্ব-অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং "পার্টি অব্ ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিজম" (PDS) নামে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

পশ্চিম জার্মানির ও পূর্ব জার্মানির দলীয় ব্যবস্থা একীভূত হয় ঐক্যবদ্ধ জার্মানির বুন্দেসটাগের নির্বাচনে (ডিসেম্বর 1990)। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক জার্মানির দলীয় ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম জার্মানির দলীয় ব্যবস্থার পূর্ব জার্মানিতে সম্প্রসারণ। এখন জার্মানিতে প্রধান পাঁচটি রাজনৈতিক দল দেখা যায় ঃ

(১) সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টি

Social Democratic Party (SDP)

(২) ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন ও তার সহযোগী বাভারিয়া রাজ্যের ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন

Christian Democratic Union and Christian Social Union (CDU/CSU)

(৩) ফ্রি ডেমোক্রাটিক পার্টি

Free Democratic Party (FDP)

(৪) গ্রীন পার্টি এবং এদের সহযোগী 'নব্বইয়ের জোট'

The Greens and Alliance '90

(৫) পার্টি অব্ ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিজম

Party of Democratic Socialism (PDS)

জার্মান দলীয় ব্যবস্থায় একমাত্র বিশেষ ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক মাতদর্শের কারণে CSU-এর কাজকর্ম বাভারিয়া রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই দলটি সব সময় CDU-এর সহযোগী দল হিসেবে কাজ করে এবং নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার মাধ্যমে CDU বাভারিয়া রাজ্যে কোন কাজ করে না। আর PDS দলটি মূলত পূর্ব জার্মানির ভূতপূর্ব SED-এর নবসংস্করণ হওয়ায় এই দলটির প্রভাব পূর্ব জার্মানির রাজ্যগুলিতেই বেশি দেখা যায়, তবে PDS এখন পশ্চিম জার্মানির কোনো কোনো অংশেও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে, সামান্য এই ব্যতিক্রম ছাড়া জার্মানির দলীয় ব্যবস্থায় কোন আঞ্চলিকতা (regionalism) নেই। রাজনৈতিক দলগুলির নিজস্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক মতাদর্শ বা নীতি আছে এবং সেই অনুযায়ী তারা রাজনীতিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় রয়েছে।

এখন রাজনৈতিক দলগুলির কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন।

১৬.৪ ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন এবং ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন Christian Democratic Union (CDU) and Christian Social Union (CSU)

যুদ্ধোত্তর পশ্চিম জার্মানিতে জার্মান রাজনৈতিক দলের ঐতিহ্য ভেঙেই ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়নের (CDU) জন্ম। যুদ্ধের পরপরই ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট, ব্যবসায়ী ও ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা, রক্ষণশীল ও উদারনীতিক মানুষের মিশ্র গোষ্ঠী CDU গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই দলটির উদ্দেশ্য কোন সংকীর্ণ স্বার্থ অনুসরণ করা বা রক্ষা করা নয়। এর গঠনের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল জার্মান সমাজের একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন লাভ করে শাসন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা এবং শাসনক্ষমতা লাভ করা। এই উদ্দেশ্যে যে নীতি এই দলটি গ্রহণ করে তা ছিল ক্রিশ্চান ও মানবিক নীতির ভিত্তিতে যুদ্ধবিধ্বস্ত পশ্চিম জার্মানির পুনর্গঠন করা। এই নীতির মাধ্যমে সমাজের আপাতবিরোধী জনগোষ্ঠীকে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিল এ দলটি। দলের অবিদসম্বাদী নেতা কনরাড অ্যাডন্যুর চেয়েছিলেন এমন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করতে যা রক্ষণশীল মতাদর্শ গ্রহণ করে সমাজের সকল শ্রেণির মানুষের সমর্থনলাভে সমর্থ হবে অর্থাৎ CDU হবে "জনগণের দল" (Volkspartei)। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়কালের হাইমার প্রজাতন্ত্র বিভিন্ন মতাদর্শে বিভক্ত রাজনৈতিক দলগুলি মতাদর্শভিত্তিক সংকীর্ণতায় প্রভাবিত ছিল এবং সেজন্য নাৎসীদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়া যায়নি। অ্যাডেন্যুর এই সম্ভাবনা এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর এই রাজনীতিক কৌশল সাফল্যলাভ করেছিল।

১৬.৫ ❑ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল (Social Democratic Party (SDP)

জার্মানিতে সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল (SDP) প্রথম গঠিত হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীতে হাইমার প্রজাতন্ত্রে এই দল গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। দলটি প্রধানত সামাজিক গণতন্ত্রের (Social democracy) মতাদর্শে বিশ্বাসী। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে এই দল CDU নেতা আডেন্যুরের অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করে। প্রথম দিকে শ্রমিক শ্রেণির রাজনৈতিক দল হিসেবে মার্কসবাদ কেন্দ্রিক কার্যক্রম অনুসরণ করার ফলে দলটি খুব বেশি জনসমর্থন পায়নি। সুতরাং 1950-এর দশকে দলের ভেতর থেকেই বৃহত্তর জনসমর্থন লাভের জন্য দলের মতাদর্শের ও সংগঠনের সংস্কারের দাবি ওঠে। শেষ পর্যন্ত 1959 সালে SDP তার গোডেসবার্গ সম্মেলনে মার্কসবাদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসে এবং পুরোপুরিভাবে সামাজিক গণতন্ত্রের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এখন থেকে শ্রমিক ছাড়াও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির, স্বার্থরক্ষা করার কথা বলে। এইভাবে 1959 সালের পর থেকে SDP একটি বৃহত্তর জন সমর্থনকামী প্রগতিশীল দলের ভূমিকা পালন করতে থাকে এবং CDU বিরোধী প্রধান বিকল্প দলে রূপান্তরিত হয়। দলটি 1966 সালে প্রথম শাসনক্ষমতার শরিক হয় CDU-এর সঙ্গে মহাজোট (Grand Coalition) গঠন করে। শীঘ্রই দলীয় নেতৃত্ব রাষ্ট্রশাসনে তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে জনগণের বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। পরে 1969 সালে বুন্দেসটাগের নির্বাচনে ফ্রী ডেমোক্রটদের সঙ্গে জোট গড়ে SDP ক্ষমতায় আসে এবং তার নেতা ভিলি ব্রান্ডট্ ফেডারেল চান্সেলর নিযুক্ত হন। তারপর থেকে পররাষ্ট্রনীতিতে ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্য অর্জন করে SDP ক্রমশ তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে থাকে এবং একটি বামপন্থাঘেঁষা প্রগতিশীল দল হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

১৬.৬ ❑ গ্রিন পার্টি (The Greens)

পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জার্মানিতে 1970-71 সাল থেকেই পরিবেশ রক্ষা অন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। সাবেকি রাজনৈতিক দলগুলি এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়নি। সেজন্য জার্মানিতে পরিবেশ রক্ষা আন্দোলনের নেতারা নিজেদের নিজস্ব রাজনৈতিক দল গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে থাকেন। একই সঙ্গে তাঁরা এক "নতুন রাজনীতির" (New Politics) কার্যক্রম নিয়ে আসেন যার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির (Issues) মধ্যে ছিল আণবিক শক্তিচালিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন ব্যবস্থার বিরোধিতা করা, জার্মানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার নীতিকে বাধা দেওয়া, পরিবেশ রক্ষার পক্ষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মহিলাদের অধিকার দাবি করা এবং জার্মান সমাজের অধিকতর গণতন্ত্রীকরণ ইত্যাদি। প্রধান প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলি এইসব বিষয় নিয়ে রাজনীতি করতে আগ্রহী না থাকায় গ্রীন পার্টির পক্ষ থেকে তাদের ''Antiparty party'' বলে নিন্দা করা হয়।

1970-এর দশকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে 1980-র দশকের প্রথমেই এই মতের সমর্থকরা নিজেদের সংগঠনকে একটি রাজনৈতিক দলে উত্তীর্ণ করে। এই নতুন দলের নাম The Greens যারা 1983 সালের নির্বাচনে বুন্দেশটাগে প্রথম প্রতিনিধিত্ব পায়। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে এই প্রথম সম্পূর্ণ নতুন একটি রাজনৈতিক দলের জন্ম

হয়। গ্রিন পার্টি এক ধরনের "বিকল্প রাজনীতির" কথা প্রচার করে যার মূলে রয়েছে আণবিক শক্তি ব্যবহারের বিরোধিতা করা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা। CDU-CSU এবং SDP-র তুলনায় গ্রিন পার্টির আভ্যন্তরীণ সংগঠন অনেক বেশি ঢিলেঢালা ও অনেক কম আমলাতান্ত্রিক।

১৬.৭ জার্মান দলব্যবস্থার চরিত্র

দুই জার্মানির একীকরণের পরে জার্মান দলব্যবস্থার চরিত্র কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হচ্ছে। 1998 এবং 2002 সালের নির্বাচনের পরে দেখা যাচ্ছে যে, দলগুলির সাবেকি সামাজিক ভিত্তি ও নির্বাচনী সমর্থনের চেহারা পরিবর্তিত হচ্ছে। তাদের মধ্যে যে মতাদর্শগত পার্থক্য দেখা যায় তা সরাসরি সমাজে প্রতিফলিত হয় না। একই সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত ভোটদাতারা অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি মতাদর্শ অনুসারী দলগুলির পক্ষে ভোট দেয়। দুই জার্মানির সংযুক্তির ফলে দেশে কয়েক মিলিয়ন নতুন ভোটদাতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু তবুও সাধারণভাবে জার্মান দলব্যবস্থার কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যেতে পারে।

SDP সাধারণভাবে বেশি সমর্থন পায় সমাজের উদারনীতিক অংশ থেকে এবং সেই অনুসারে শ্রমিক শ্রেণির ভোট আগের তুলনায় কম পায়। প্রোটেস্ট্যান্টদের বেশির ভাগ SDP-কে ভোট দেয়। SDP-র প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায় জার্মানির উত্তর ও মধ্য অঞ্চলে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে। তুলনায় SDP জার্মানির পূর্বাঞ্চলে কম ভোট পায় যদিও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পূর্ব জার্মানির শিল্পাঞ্চলগুলিতে SDP-র শক্ত ঘাঁটি ছিল।

CDU-CSU গোষ্ঠী সমর্থন পায় গ্রামীণ অঞ্চলে ও ছোটো-মাঝারি শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির ও বয়স্ক মানুষের কাছ থেকে। আনুপাতিকভাবে ক্যাথলিকরা এই দলকে বেশি পছন্দ করে। জার্মানির পূর্বাঞ্চলে এই দলের সমর্থন নগণ্য।

১৬.৮ সারাংশ

জার্মান সংবিধানে স্পষ্টভাবে রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব এবং জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছে। যুদ্ধোত্তর জার্মানিতে প্রধান পাঁচটি রাজনৈতিক দল রয়েছে ;

(১) ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক ইউনিয়ন/ক্রিশ্চিয়ান সোশ্যাল ইউনিয়ন

(২) সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দল

(৩) ফ্রি ডেমোক্রাটিক দল

(৪) গ্রিন পার্টি

(৫) পার্টি অব্ ডেমোক্রাটিক সোশ্যালিজম

জার্মান দলব্যবস্থায় রাজনৈতিক আঞ্চলিকতা বেশি চোখে পড়ে না। এই দলব্যবস্থার যে চরিত্র সাম্প্রতিকালে দেখা যায় তাতে সাবেকি সামাজিক শ্রেণিভিত্তিক বিশ্লেষণ খুব বেশি সাহায্য করে না। জার্মান গণতন্ত্রে চাপসৃষ্টিকারী স্বার্থগোষ্ঠীর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প শ্রমিকদের, শিল্প মালিকদের, ছাত্রদের, মহিলাদের, বিভিন্ন জেলায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের নিজস্ব স্বার্থগোষ্ঠী সব সময়েই তাঁদের পক্ষে অনুকূল সিদ্ধান্তের জন্য সংসদ সদস্যদের, দলগুলির এবং মন্ত্রীদের ওপর গণতান্ত্রিক উপায়ে চাপ সৃষ্টি করে।

১৬.৯ প্রশ্নাবলি

(১) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী জার্মান রাজনীতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। (১৬.৩ পড়ুন)

(২) জার্মান গ্রিন পার্টির উদ্ভব, মতাদর্শ ও নির্বাচনী ক্ষমতা সম্বন্ধে টীকা লিখুন। (১৬.৬ পড়ুন)

(৩) জার্মানির প্রধান দুইটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করুন। (১৬.৪ পড়ুন)

১৬.১০ গ্রন্থপঞ্জী

1. G. Almond and others (eds.) *Comparative Politics Today* (2000).

2. Rhodes, Haywood and Wright (eds.) *Development in West European Politics* (1977)

3. Petr Pulzer, *German Politics* (1995)

4. Eva Kolinsky, *Parties, Opposition and Society in West Germany* (1984).

5. Stephen Padgett (ed.), *Parties and Party Systems in the New Germany* (1993).

6. Russell Dalton (ed.), *The New Germany Votes* : Unification and the Freation of a New *German Party System* (113).

7. Asok Mukhopadhyay, ‘‘Social Democracy in Germany Today : An Indian Perciptio’’. *Society and Change* (Calcutta). Vol. XI (2).

———————